পার্বত্য চুক্তি ও পাহাড়ে শান্তির সম্ভাবনা

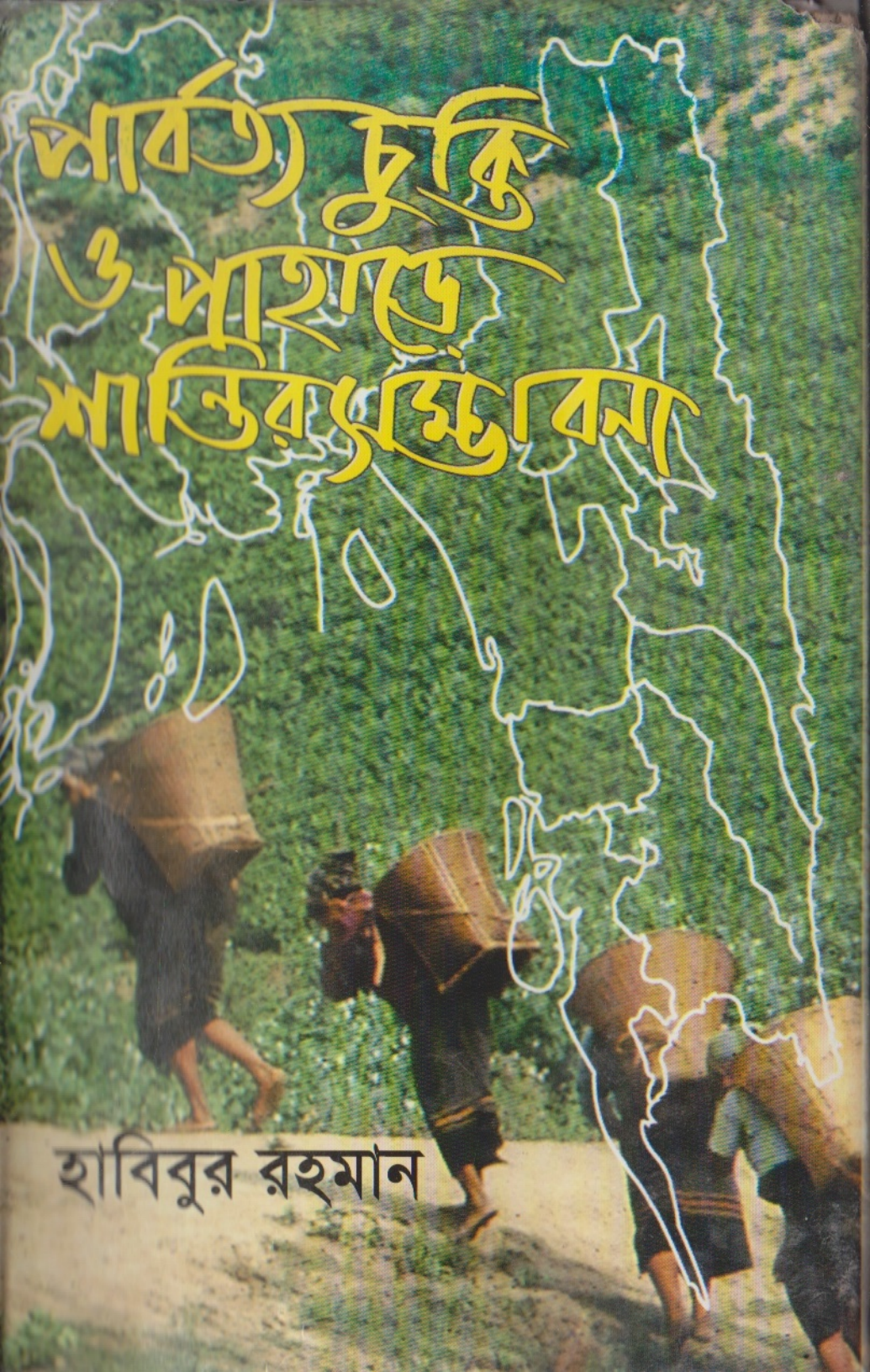

হাবিবুর রহমান

আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ

গত আড়াই দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক রক্ত ঝরেছে। কয়েক হাজার উপজাতি, অ-উপজাতি জনগণ নিহত হয়েছেন। প্রাণ হারিয়েছেন নিরাপত্তা বাহিনী বেশকিছু সংখ্যক সদস্য। প্রতিবেশী দেশের সাথে যেসব কারণে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা তার মধ্যে একটি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক তা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সকলেই চেয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরও শান্তির সুবাতাস পার্বত্যঅঞ্চলের সবুজ অরণ্যে আর বইলো না। যদিও সকলে তাই আশা করেছিল। সন্ত্রাসীরা বিশেষ মহলের উস্কানীতে আবার অশান্ত করে তুলেছে পার্বত্য জনপদ, তারা মেতে উঠেছে ষড়যন্ত্রের নীলনকশা প্রণয়নে। পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে অনিশ্চয়তার দোলাচল, অমিমাংসিত থাকছে স্থায়ী শান্তির আকাঙ্ক্ষা। 'পার্বত্য চুক্তি ও পাহাড়ে শান্তির সম্ভাবনা' গ্রন্থে দল নিরপেক্ষ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট, মাটি, মানুষ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সন্ত্রাস ও সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমসহ বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে। পার্বত্য জনপদের সামগ্রিক সমস্যা ও সম্ভাবনার তথ্যনিষ্ঠ প্রামাণ্য দলিলে ভরপুর এ গ্রন্থে প্রাণবন্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ISBN-984-8193-96-0

www.pathagar.com

পার্বত্য চুক্তি ও পাহাড়ে শান্তির সম্ভাবনা

হাবিবুর রহমান

Adorn
অ্যাডর্ন পাবলিকেশন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পার্বত্য চুক্তি ও পাহাড়ে শান্তির সম্ভাবনা ❖ হাবিবুর রহমান
প্রথম প্রকাশ ❖ একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৫
প্রকাশক ❖ সৈয়দ জাকির হোসাইন ❖ অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
২৯ সেগুন বাগিচা (পুরাতন ১৪১), ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৪৭৫৭৭, ৮৩১৩০১৯
চট্টগ্রাম অফিস : ৩৮, এন. এ. চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬১৬০১০
মুদ্রণ : সানজানা প্রিন্টার্স, ৭৬/এ নয়াপল্টন, ঢাকা - ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব ❖ লেখক
প্রচ্ছদ ❖ শোয়েব ফারুকীর ছবি অবলম্বনে জোহরা হোসাইন
মূল্য ❖ দুইশত ত্রিশ টাকা

PARBOYTTO CHUKTI O PAHARE SHANTIR SOMBHABONA
HABIBUR RAHMAN
Published in Ekushey Book Fair 2005
Published by Syed Zakir Hossain, Adorn Publication
29 Segun Bagicha (old 141), Dhaka-1000. Tel : 9347577, 8313019
e-mail : adorn@bol-online.com
Foreign Distributor : Media Mohol, 63b Green Drangon Yard, London E1 5NJ
Tel : (44) 20 7650 0000, Fax : (44) 20 7247 5020, e-mail: info@mediamohol.com
Copyright : Writer
Cover Design : Johora Hussain
Price : Tk. 230 US$ 10

ISBN-984-8193-96-0
Ap-99-2005

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের জন্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও বাস্তবতা ১১
সংবিধানের আলোকে পার্বত্য চুক্তি ২১
পার্বত্য চট্টগ্রাম – সন্ত্রাস কবলিত অশান্ত জনপদ ৩৫
স্থানীয় উপজাতি দলগুলোর সংঘাত ৪৩
পার্বত্য জনপদ রক্তাক্ত কেন ৫৮
মহালছড়ি ঘটনার নেপথ্যে কাহিনী ৬৯
দলীয় সংঘাতে জর্জরিত পার্বত্যাঞ্চল ৮৪
জে এস এস এর ছায়া প্রশাসন ৯৬
আঞ্চলিক রাজনীতি অচল ও অকার্যকর ৯৯
জনগণই নির্বাচন করবে তাদের নেতা ১০২
মানবাধিকার সংস্থার উদ্দেশ্যমূলক কর্মকাণ্ড ১১১
বিদেশী সংস্থা/ব্যক্তিবর্গের বৈষম্যমূলক ও আপত্তিকর কর্মকাণ্ড ১১৫
পাহাড়ী বাঙ্গালী সম্প্রীতি উন্নয়নের পূর্বশর্ত ১১৮
পার্বত্যবাসীদের নেতৃত্ব সংকট ১২৫
পার্বত্য অধিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ সমন্বিত আন্দোলন প্রয়োজন ১৩৩
সাম্প্রতিক সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান ১৪০
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভবিষ্যত শান্তি সম্ভাবনা ১৪৬
পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাসী দলগুলো সীমা লংঘন করছে ১৫১
পার্বত্য চট্টগ্রামে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং মানবতার কল্যাণে নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা ১৫৪
বিপন্ন পার্বত্য বনাঞ্চল ১৬০

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি ১৬৮

সন্তু লারমার সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাতকার ১৮১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন ১৯০

পার্বত্য গণপরিষদের স্মারকলিপি ১৯৬

পার্বত্য চট্টগ্রামে দেশদ্রোহী সন্ত্রাস, মানবাধিকার ও সমঅধিকার লংঘনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকের প্রবন্ধ ২০২

সন্ত্রাসীদের চাঁদা আদায়ের রশিদ/চিঠি ২১৮

সন্ত্রাসীদের দ্বারা হত্যা/অপহরণের বিবরণ ২২৩

সন্ত্রাসীদের কাছ হতে উদ্ধারকৃত অস্ত্র/গোলাবারুদ/সরঞ্জামাদির বিবরণ (পার্বত্য চুক্তির পর) ২২৫

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জন করেছে স্বাধীনতা। আজ দেশে বইছে গণতন্ত্রের সুবাতাস ও চর্চা হচ্ছে অবাধ রাজনীতির। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষের মৌলিক অধিকার ও বিভিন্ন মত প্রকাশের স্বাধীনতা। অনেক প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতাকে বিপন্ন করার ষড়যন্ত্র সে সূচনা লগ্ন থেকেই। ষড়যন্ত্রকারীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বসে আছে, সময় সুযোগ বুঝে বারবার তারা মেতে উঠে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে ষড়যন্ত্রের খেলায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর ধারণা করা হয়েছিল যে শান্তির সুবাতাস বইবে পার্বত্যাঞ্চলে, কিন্তু অত্র এলাকার জনগণ তথা দেশবাসীকে হতাশ হতে হয়েছে চরমভাবে। কারণ, বিশেষ একটি স্বার্থান্বেষী মহল পার্বত্য চট্টগ্রামকে আবার অশান্ত ও উত্তপ্ত করে তুলেছে। দেশ যখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নয়নের সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সে সময়ে পার্বত্যাঞ্চলে কয়েকটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল সহিংসতা ও হানাহানির মাধ্যমে জনগণের জীবনকে করে তুলেছে নিরাপত্তাহীন ও অশান্ত।

আমি একজন সরকারি চাকুরিজীবি। নিজের দায়িত্ব পালনে একাধিকবার আমাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সময়কালের জন্য অবস্থান করতে হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের ফারুয়া, বান্দরবান, বিলাইছড়ি, কাপ্তাই, রাজস্থলী, বাঙ্গালহালিয়া, বরকল, ছোটহরিনা, মারিশ্যা, মাইনীমুখ, পানছড়ি, বাঘাইছড়ি, দীঘিনালা, মহালছড়িসহ আরো অনেক জায়গায়। মেলামেশা ও অনেক আলোচনা হয়েছে বিভিন্নস্তরের জনগণের সাথে। অনেক কাছ হতে দেখেছি পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি, সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের হোতাদের, পার্বত্য জনগণ আসলে কি চায়, আসলেও কি পার্বত্য জনগণের সর্বসম্মত কোন নেতা আছে? কেন তারা তাদের মনের মাঝে চাপা কথাগুলো বলতে

www.pathagar.com

পারছেনা। জেএসএস ও ইউপিডিএফ এর প্রকৃত স্বরূপ কি, নিরীহ পার্বত্য অধিবাসীদের মাঝে কারা কোন স্বার্থে বিভেদ ও বিভ্রান্তির চেষ্টা করছে। দেশের এই অংশকে যারা বিচ্ছেদ করার দুঃসাহস দেখায় তারা কে, তাদের মদদ ও আশ্রয়দাতা দেশের ভিতরে ও বাইরে কারা। বিদেশী সাহায্য সংস্থা ও দেশের ভিতরে থেকে যারা দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করে তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য মায়া কান্নার আসল উদ্দেশ্য কি, সরকারি কর্মচারি হিসেবে নিজের মতামত খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা দুষ্কর তাই নিজের মাঝে ঝড় তোলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বিরাজমান পরিস্থিতির শিকর সন্ধানে যখন যাই। অনেকের অনুরোধ এবং অনেকটা নিজের বিবেকের তাড়নায় এই বইটি প্রকাশের উদ্দ্যেগ নিলাম।

এই বইয়ের প্রায় অনেকগুলো প্রবন্ধই বিভিন্ন সময়ে দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক পূর্বকোণ, দৈনিক আজকালের খবর, দৈনিক গিরিদর্পণ, মাসিক এশিয়া ডাইজেষ্টসহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যে সকল গবেষক-লেখকের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ আমাকে সহায়তা করেছে তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমার সহকর্মী যারা তাদের নিজস্ব সময় ব্যয় করে পুরো বইটি কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রুফ রিডিং-এ সহায়তা করেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার জন্য আমার প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার অভাব ছিলনা - যদিও সীমাবদ্ধতা ছিল অনেক। আমার এই বই পাঠ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্ধে যদি নীতি নির্ধারকরা সঠিকভাবে অবগত হন, সন্ত্রাসী বিপথগামী পার্বত্য এলাকার দলগুলো যদি তাদের ভুল বুঝতে পারে, পার্বত্য এলাকার সকল জনগণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দল ও মত নির্বিশেষে যদি এক হয়ে নিজেদের নেতা নির্বাচন করে একটি সমন্বিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সংবিধানের আলোকে দাবি আদায় ও শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে অত্র অঞ্চলে উন্নয়নের দ্বার সকলের জন্য খুলে দেয় তাহলে মনে করবো আমার এ শ্রম স্বার্থক হয়েছে।

আল্লাহ্ হাফেজ।

হাবিবুর রহমান

ঢাকা

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও বাস্তবতা

হাজারো সমস্যাক্লিষ্ট বাংলাদেশে একটি সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। দরিদ্র এই দেশটির পক্ষে তাই কখনোই বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনে উন্নত দেশগুলোর মতো পদক্ষেপ নেয়া খুব একটা সহজ কাজ নয়। এদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিচালিত কাউন্টার ইন্সারজেন্সি অপারেশনের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, কখনোই কেবলমাত্র সামরিক তৎপরতা চালিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করা সম্ভব নয়। তাই সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশ সেই শুরু থেকেই তথাকথিত শান্তিবাহিনী সমস্যা সমাধানের জন্য সামরিক তৎপরতার পাশাপাশি বেশকিছু আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এসব সু-সমন্বিত ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত না নেয়া হলে আজ হয়তো সমস্যাটি আরো ব্যাপক ও ভয়ংকর হতে পারতো। ০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সন তারিখে পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের সমঝোতা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যা শান্তিচুক্তি নামে সাধারণভাবে পরিচিত। তবে চুক্তিটির শিরোনামে শান্তি সংজ্ঞা নয়, নিম্নোক্ত পরিচয়ই ব্যক্ত হয়েছে, যথাঃ 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি।' সুতরাং মুলতঃ এটির নাম শান্তি চুক্তি নয় তবে এই চুক্তির উদ্দেশ্য যে শান্তি প্রতিষ্ঠা তাতে কোন সন্দেহ নেই। চুক্তিটি সংসদীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত না হওয়ায়, এর খুটিনাটি ফাঁক ফোকর অজ্ঞাত থেকে গেছে। আসলে জাতীয় কমিটির সাংগঠনিক দায়িত্ব ছিলো-প্রতিপক্ষের মতামত গ্রহণ, সরকারি মতামত প্রদান এবং উভয় পক্ষের অভিপ্রায়ের সঙ্গতি বিধান। এই সঙ্গতি বিধানের শেষ পর্যায় হলো ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি মীমাংসার সুপারিশ প্রদান। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পুর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহায়তায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

চুক্তির উপরোক্ত বর্ণনায় এটা পরিস্কার যে, সরকার প্রত্যক্ষভাবে চুক্তির কোন পক্ষ নন। দ্বিতীয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য জনগণের পক্ষে

www.pathagar.com

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ নয়। পার্বত্য জনসংহতি সমিতিকে পার্বত্য জনগণের একমাত্র মুখপাত্র রূপে গ্রহনের বিষয়টি ব্যাপকভাবে বিতর্কিত। কার্যতঃ এটি সার্বজনিনভাবে পালনীয় চুক্তি নয়। গঠিত জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য জনসংহতি সমিতি নামক একটি সংগঠনের চুক্তি। এটি সরকারি ও পার্বত্য জনগণের পক্ষে সম্পাদিত চুক্তি বলা প্রতারণা। পার্বত্য জনগণ নয়, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও তার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতি সম্পাদিত চুক্তির একটি পক্ষ। স্থানীয় ভিন্ন মতাবলম্বী উপজাতি ও বাঙ্গালীরা এর বাধ্যবাধকতার সাথে আবদ্ধ নেই। দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এটা স্বীকার্য যে চুক্তিটি তাৎক্ষণিক ভাবে যথেষ্ট সুফল দান করেছে। আর সে হলো তথাকথিত বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর একটি বিরাট অংশ অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছে। ভারতের শরণার্থী শিবির ছেড়ে দেশত্যাগী উপজাতিরা ফিরে এসেছে এবং নিত্যদিনের নিরাপত্তাহীনতা পরিমাণে কমেছে। এখানে চুক্তির মধ্যে তিনটি সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য আছে যথা ঃ

ক। পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল।

খ। এই অঞ্চল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যা সংরক্ষণ প্রয়োজনীয়।

গ। এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন সাধন আবশ্যক।

(ক)-তে বর্ণিত সিদ্ধান্তটি বিতর্কিত। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল মানে উপজাতি বসবাস সমৃদ্ধ অঞ্চল, যেখানে বন পাহাড়, হ্রদ ও শিল্পাঞ্চল সহ সর্বত্র উপজাতীয় বসতি আছে। উপজাতি অধ্যুষিত মানে অউপজাতিদের অবস্থান ও বসবাসকে অস্বীকার করা হলে বক্তব্যটি যথার্থ নয়। অবশিষ্ট সিদ্ধান্ত দুটি যথার্থ। ইতিহাস ও স্থানীয় উপজাতি ঐতিহ্য আলোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশ তাদের কারো আদিম পিতৃভূমি নয়। খাঁটি অর্থে তাদের 'আদিম' বলাও যায় না। সুতরাং তাত্ত্বিক অর্থে এরা উপজাতি আদিবাসী ও পাহাড়ী নয়। তবে ব্যবহারিক অর্থে, তারা বাংলাদেশী জাতি বা বৃহৎ বাঙ্গালী জাতিসত্তার বিপরীতে ক্ষুদ্র অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠী।

সারাদেশে বাঙ্গালী জনসংখ্যা ১২ কোটির অধিক তাদের বিপরীতে অবাঙ্গালীরা সংখ্যায় অতি নগন্য এই পার্বত্য অঞ্চলেও বাঙ্গালীদের সংখ্যা ৫ লক্ষাধিক। তারা একক প্রধান স্থানীয় জনগোষ্ঠী নয়। উপজাতি পরিচয়ের ভিত্তিতে তাদের বিপরীতে বাঙ্গালীরা অউপজাতির সজ্ঞাভূক্ত। এই সংজ্ঞায়নও ভুল। পার্বত্য শাসন বিধির যে ইমিগ্রেশন বা অভিবাসনের কথা বলা হয়েছে, তাতে কেবল বিদেশী অনুপ্রেবেশকেই ইমিগ্রেশন বা বহিরাগমন বলা হয়। ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন হলো সরকার ব্যবহৃত পরিভাষিক শব্দ। এটি বিদেশী বহিরাগমন সংক্রান্ত পরিভাষা। এই শাব্দিক অর্থে নয় সুতরাং সরকারি আইনের ভাষায় ব্যবহৃত ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন, যা পার্বত্য শাসন বিধির ৫২ নং ধারায় ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ স্বদেশী বহিরাগমন নয়, বিদেশী বহিরাগমন। পার্বত্য শাসন বিধিতে ঘুর্ণাক্ষরেও সুনির্দিষ্টভাবে স্বদেশী বাঙ্গালীরা,

www.pathagar.com

এতদাঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ জনগোষ্ঠী বলে কোথাও উল্লেখিত নেই। এই আইনে বহিরাগত বিদেশীদের কেউ অবৈধ অভিবাসী, আর কেউ অনুমতিপ্রাপ্ত অধিবাসী। কিন্তু বাঙালীদের বসতি বিস্তারের বিষয়টি একটি অধিকার। এই নাগরিক অধিকার কারো অনুমতি সাপেক্ষে নয়। বঞ্চিত না হলেও, স্থানীয়ভাবে বাঙালীদের দুই প্রতিপক্ষ সমাজ। এই প্রতিপক্ষতাই পার্বত্য রাজনীতির জটিল গ্রন্থি। এখানে প্রধানতঃ সবাই দুই দলে বিভক্ত। এমতাবস্থায় উপজাতীয় ক্ষমতাসীনদের কাছে বাঙালীদের নিরপেক্ষ আচরণ ও সুবিচার লাভ সন্দেহজনক বিষয়। এ বিষয়গুলোর বিবেচনায় উপজাতীয় চীফেরা, নির্বাহী ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও, প্রতিপক্ষ বাঙালীদের স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার সনদ নিরপেক্ষভাবে দিবেন এবং তা আইনতঃ বৈধ হবে, এটা উদ্ভট আর অবাস ব ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা বাঙালীদের বিরুদ্ধে একটি ফাঁদ। উগ্র উপজাতীয় বিরোধীতাও এ কাজে বাধা। আগে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন দরকার। যাদের দায়িত্ব হবে প্রকৃত উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ীদের পরিচয় নির্ধারণ। অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা বলতে যিনি উপজাতীয় নহে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত বসবাস করেন তাকে বুঝাবো। এই দফা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট আইনটি বৈষম্যমূলক। ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও শ্রেণী নির্বিশেষে বাঙালীরা একটি সমষ্টি এবং তাদের সংখ্যা কোটি কোটি। তাদের বিপরীতে উপজাতিরা কোন একক জাতিসত্তা বিশিষ্ট লোকের সমষ্টি নয়। তদুপরি পার্বত্য উপজাতীয়রা সংখ্যায় দেশ ভিত্তিক বাঙালী জনসংখ্যার আধা শতাংশ মাত্র। স্থানীয়ভাবেও বাঙালীরা প্রায় সমান সংখ্যক। এমতাবস্থায় দেশের ৯৯% লোক সংখ্যা সম্বলিত বাঙালীদের বিপরীতে উপজাতীয়দের প্রকৃত পরিচয় হবে অবাঙালী। বাঙালীরা নামে অউপজাতি আখ্যায়িত হতে পারে না। উপজাতিদের স্থানীয় হওয়া নিঃশর্ত। কিন্তু বাঙালীদের তা শর্তাধীন। এটা বৈষম্য। বরং বাঙালীরা স্বদেশী, আর উপজাতিরা বিদেশী বংশোদ্ভূত। তাই বাঙালীদের নয় উপজাতিদের স্থানীয় হওয়া শর্তাধীন হওয়াই উচিত। নইলে উভয় সম্প্রদায়ই হবে নিঃশর্ত স্থানীয়। পার্বত্যবাসী পাহাড়ী বাঙালী যতদিন রাজনৈতিক চেতনায় পরস্পর থেকে ভিন্ন থাকবে, যতদিন পর্যন্ত তারা সাম্প্রদায়িকভাবে পরস্পরের বৈরী হয়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এখানে অশান্তি আর পশ্চাদপদতার অবসান হওয়া অনিশ্চিত। এখানকার পশ্চাদপদতা কাটাতে জাতীয় ভান্ডারে ভাগ বসাতে হবে। দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরের বিরোধ ও কাড়াকাড়িতে তার নাগাল পাওয়া যাবে না। উদার অসাম্প্রদায়িক ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পার্বত্য নেতৃত্বের পক্ষেই সম্ভব হবে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সম্প্রদায়কে এক রাজনৈতিক সূত্রে গ্রথিত করে উজ্জল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা। আর তখনই কেবল সুখ ও শান্তির আশা করা যাবে। বর্তমান সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী চিন্তা চেতনা পশ্চাদমূখী। এ থেকে রেহাই কাম্য। দরকার অসাম্প্রদায়িক ঐক্যবদ্ধ রাজনীতিক।

www.pathagar.com

জনসংহতি সমিতির আপত্তি হলোঃ সরকার চুক্তি বানচালের ষড়যন্ত্র করছেন বলেই তাদের ধারণা। জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ পদ্ধতি, সাংগঠনিকভাবে নতুন ও জটিল। আপাততঃ তার বাস্তবায়ন ধীরগতিক হবেই। এটা অনিচ্ছাকৃত। এর মধ্যে ষড়যন্ত্র আবিস্কার অবাঞ্ছিত। ধৈর্য্য ও পারস্পরিক আস্থা অক্ষুন্ন রাখা ছাড়া এই পদ্ধতি গড়ে উঠবে না। এও ভাবতে হবে যে, পদ্ধতিটির মূলে জাতীয় বিরোধিতা ও প্রচুর আইনগত গলদ আছে, যা কাটানো আবশ্যক ও সময় স্বাপেক্ষ। ভুলের খেসারত টানা ক্ষতিকর। বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে ভুল স্বীকারের হীনমন্যতা পরিত্যাগ করাই সঙ্গত। কিন্তু জনসংহতি সমিতি ভাংবে তবু মচকাবেনা, এরূপ একরোখা মনোভাব পরিচালিত হচ্ছে বলেই মনে হয়। আমরা এটা বুঝতে অপারগ যে, কেন দীর্ঘদিনেও নিজেদের ক্ষমতার শূন্য ভিত্তি সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দ ওয়াকেবহাল হতে পারলেন না। এখানে একথা বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, এই বিদ্রোহ পর্যুদস্ত অঞ্চলে সাধারণ পুলিশ, আনসার ও আইন শৃংখলা রক্ষায় নিযুক্ত বাহিনী নিরাপত্তা বিধানে কি যথেষ্ট? এখানে চুক্তির পক্ষ বিপক্ষ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী উপজাতীয় সংগঠন পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট ও মারমুখী। তারা সশস্ত্রভাবে পরস্পরের মোকাবেলায় লিপ্ত। বিদেশী বিদ্রোহী ও সন্ত্রাসবাদী কিছু সংগঠন ও এতদ্বঞ্চলে সক্রিয় আছে। তাই সঠিকভাবে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে হলে, এখানে সর্বত্র সেনাবাহিনীর উপস্থিতি বজায় রাখা জরুরি এবং তার কোন মেয়াদও বেঁধে দেয়া যায় না। স্বাভাবিক অবস্থা ও আইন শৃংখলা সুষ্ঠুভাবে ফিরে আসার পরই মাত্র, সেনা ক্যাম্প সমূহ প্রত্যাহারের কথা বিবেচ্য হতে পারে। চুক্তির এই দফাটি সেনা ক্যাম্প বজায় রাখাকেই সমর্থন করে। তাছাড়া জনসংহতি সমিতি ও তাদের পারিবারিক সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা যাবে না। দফা নং ঘ/১৪ তে বলা আছে যে, নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলা বারুদ জমা দিবেন, সরকার তার প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করবেন। যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে, সরকার ঐ সব মামলা প্রত্যাহার করে নিবেন। এটি একটি বিরাট উদারতা। খুন, জখম, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, চাঁদাবাজি, মুক্তিপণ, রাহাজানি, সন্ত্রাস, গণহত্যা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতাযুক্ত চূড়ান্ত অপরাধমূলক অসংখ্য মামলার ফলে সাধারণ ক্ষমার আওতায় মাফ হয়ে যাবে? বলা যায় বিদ্রোহী অস্ত্রবাজ তথাকথিত শান্তিবাহিনী সদস্যরা এখনো পরিপূর্ণ প্রত্যাবর্তিত ও বিলুপ্ত হয়নি এবং তাদের একাংশ আত্মগোপন করে আছে। ইউপিডিএফ হলো তাদেরই দলছুট লোক। সুতরাং জনসংহতি সমিতি ও তার অস্ত্রবাজদের পরিপূর্ণভাবে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন এখনো অসম্পূর্ণ আছে। সন্দেহ মতে জনসংহতি সমিতির প্রধানের কিছু শিষ্য গোপন সন্ত্রাসী আস্তানা থেকে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা বিদ্রোহী শান্তিবাহিনী সদস্যদের পরিচালনা করছেন। তদুপরি এখানকার দৈনন্দিন খবর হলোঃ চুক্তি পক্ষের ও বিপক্ষের দুই উপজাতীয় বাহিনী, সশস্ত্রভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে হানাহানিতে লিপ্ত। এছাড়া চাঁদাবাজি

www.pathagar.com

মুক্তিপণ আদায়, জিম্মিকরণ, বাজারহাট, বাড়িঘর পোড়ানো, রাহাজানি ও লুটপাট তো লেগেই আছে।

সীমান্তে ও ভিতরে বিদেশী বিদ্রোহীদের আনাগোনাও বিদ্যমান। এমতাবস্থায় সেনাবাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রত্যাহার বা স্থায়ী নিবাসে তুলে আনার বর্ণিত পরিবেশই নেই। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের থাকা চুক্তির দ্বারা সমর্থিত। বরং আগে জনসংহতি সমিতিকে আন্তরিকতা ও সততার পরিচয় দিয়ে চুক্তি মত, নিজ সশস্ত্র সদস্যদের পরিপূর্ণভাবে সমর্পিত করতে হবে এবং তারাই এটা নিশ্চিত করবেন যে, আর কোন শান্তিবাহিনী সদস্য কোথাও লুক্কায়িত নেই, এবং যারা অস্ত্রবাজিতে লিপ্ত তারা সংগঠন বহির্ভূত ভিন্ন লোক। চুক্তি অনুযায়ী ওদের নির্মূল করতে জনসংহতি সমিতি নিজে সহযোগী থেকে সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনীগুলোকে সহযোগিতা করতে হবে। এই নির্মূল অভিযান সমাপ্ত হওয়ার পরই, সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। ঐ সময়সীমা এখনো উপস্থিত হয়নি। সুতরাং সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের সময়সীমা নির্ধারণ এখনো সুদূর পরাহত। চুক্তিটাই তাদের থাকার পক্ষে যুক্তি। এতদসত্ত্বেও অনেক নিরাপত্তাবাহিনী সদস্য ও ক্যাম্প প্রত্যাহারসহ অন্যান্য পদক্ষেপগুলো সরকারের অতি উৎসাহ সদিচ্ছামুলক কাজ। চুক্তি অনুযায়ী যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তৎকালীন সরকার পক্ষ যে কোন মূল্যে পার্বত্য জনসংহতি সমিতিকে চুক্তির প্রতি প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাদের কৌশল ছিলো দাবি দাওয়া সর্বাধিক পরিমাণে মেনে নিয়ে দ্বিতীয় পক্ষের সামনে একটি ধাঁধার সৃষ্টি করা, এবং এরই ফাঁকে এমন সব আইনি জটিলতার ফাঁক ফোকর রেখে দেয়া, যাতে ভবিষ্যতে চুক্তিটি আপনাতেই বাতিল বা অকেজো হয়ে যায়। সে পরিস্থিতিতে কেউ কাউকে দোষারোপও করতে পারবে না। এরই ফাকতালে অস্ত্রসহ বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করবে। শরণার্থীরাও ভারত থেকে ফিরে আসবে। তাতে সরকারের জয় জয়কার পড়ে যাবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন প্রশাসনিক অঞ্চল নয় এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বাংলাদেশের সংবিধান সম্মতও নয়। এ ধারণার ভিত্তিতে যদিও তাদের দাবি ছিলোঃ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন ও আঞ্চলিক পরিষদ ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়ে নেয়া। ফাঁক ফোকরের খুটিনাটি বাদ রেখে যা পাওয়া যায়, তাতেই চুক্তি সই করা আবশ্যক। ত্রুটিগুলো হবে ভবিষ্যতে আন্দোলনের সূত্র। এই চুক্তি পরাজয় নয়, অগ্রগতি। পরিপূর্ণ অর্জন পর্যন্ত আন্দোলন প্রলম্বিত হবে। জনসংহতি সমিতির সান্তনার বিষয় হলোঃ তারা দাবি দাওয়ার পক্ষে অনেক আশাতীত অগ্রগতি সাধন করেছে। টিকে থাকার নিশ্চয়তা না থাকলেও, মন্ত্রনণালয়, আঞ্চলিক পরিষদ, টাস্কফোর্স, চার পরিষদ চেয়ারম্যান পদ ও মন্ত্রীপদ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ ও

www.pathagar.com

নিয়োগ ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে অগ্রাধিকারকেও তাদের আন্দোলনেরই ফসল বলা যায়। ভবিষ্যতে এই সাফল্যগুলোর কাটছাট অসম্ভব না হলেও, চুক্তিভুক্ত অনেক কিছুই টিকে থাকবে, এ নিশ্চয়তা অবশ্যই দেয়া যায়। এই সাফল্যের কিছুটা অবশ্যই কালজয়ী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এও সত্য যে এতদঞ্চলে বাঙালী আধিপত্যের গোড়াপত্তন হয়ে গেছে এবং তাদের সাথে আপোষ করে উপজাতিদের সুখ সুবিধা ভোগ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বাঙালীদের অপসারণ করার দাবিটি কখনও কোনভাবে বাস্তবায়িত হবার নয়-বাস্তবসম্মত নয়। এটা হবে বেশি বাড়াবাড়ি। কাজেই বৃহত্তর পার্বত্যবাসী জণগোষ্ঠী হিসেবে পাহাড়ী-বাঙ্গালী একসাথে বসবাস করতে হবে।

ধর্মান্ধতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদের যুগ শেষ। একক ধর্ম, বর্ণ, সমাজ, সম্প্রদায় ও শ্রেণীগোষ্ঠীভুক্ত লোক অধ্যুষিত দেশ ও জাতি গঠনের চিন্তা অবাস্তব। সহাবস্থানে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন দেশ ও জাতি হয়ে থাকা ও গড়ে ওঠার চিন্তা চেতনাই সঠিক। প্রত্যেক অন্যায় অবিচারকে মানবিক ও আইনী দৃষ্টিকোনের বিচারে দেখে তার সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানিতে তিক্ততাই বাড়ে, সাফল্য নেই। সংশোধিত পথে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের অগ্রপদক্ষেপ কাম্য। সাধারণ বাঙ্গালীরা তাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। সাম্প্রদায়িক একপেশে নীতি ও রাজনীতিটাই ঐক্যের পথে বাধা। পার্বত্যাঞ্চলের আঞ্চলিক ও স্থানীয় রাজনীতিকে বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতিতে অঙ্গিভূত করা না গেলে, বিচ্ছিন্নতার সন্দেহ, অবিশ্বাস দূরীভূত হবে না। সন্দেহ, অবিশ্বাস জাতিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে বিভক্ত করে রেখেছে। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের অভিযোগ আর অসন্তোষের মাত্রা কমানো দরকার। অলিখিত চুক্তি বলে বাঙালী প্রত্যাহার, সেনা ক্যাম্প সীমিতকরণ, ভোটার তালিকা সংশোধন, প্রথাগত ভূমি মালিকানা, জেলা প্রশাসকদের নির্বাহী ক্ষমতার প্রতি প্রাধাণ্য দান, বাঙ্গালীদের দখল ও অধিকার থেকে জমিজমা মুক্তকরণ, চাকুরি ইত্যাদি সুযোগ সুবিধার প্রশ্নে উপজাতীয় অগ্রাধিকার ইত্যাদি দাবি অবাঞ্ছিত। এগুলো ঐক্য ও সাফল্যের পথে বাধা।

পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি, শৃংখলা, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষায় সেনাবাহিনীর ব্যাপক সমাবেশ থাকা অপরিহার্য। এখনো স্থানীয় সাম্প্রদায়িক সম্পর্কটি উত্তপ্ত। এখনো একদল শান্তি চুক্তি বিরোধী উপজাতীয় নব্য বিদ্রোহী মারমুখী। বহির্দেশীয় অনেক সশস্ত্র বিদ্রোহী বাহিনী সীমান্তের পাহাড়ের জঙ্গলে গোপনে চলাচল ও উৎপাতে লিপ্ত। জনসংহতি সমিতি ও ইউপিডিএফভুক্ত সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অস্ত্র মুক্ত স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরিয়ে আনতে হবে। পুলিশ, বিডিআর, আনসার ইত্যাদি শান্তিরক্ষী বাহিনীগুলোর শক্তি ও সামর্থ্য বিপদ মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট নয়। দুর্গম অঞ্চলকে জেলা সদর থেকে তৎক্ষণাত নিয়ন্ত্রণ করাও অসম্ভব। সুতরাং শান্তি নিরাপত্তা ও

www.pathagar.com

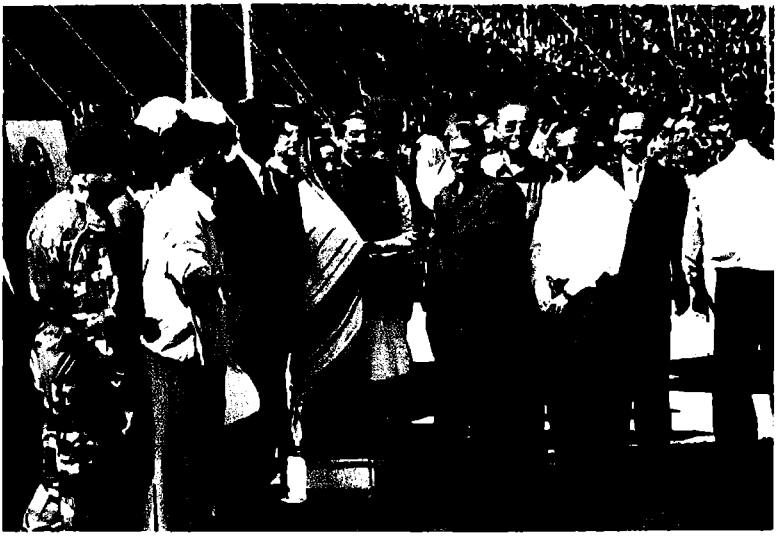

পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে সেদিন 'জেএসএস' কি
সত্যিই তাদের সকল অস্ত্র জমা দিয়েছিল?

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রতিরক্ষার স্বার্থে সর্বত্র সেনাবাহিনী নিয়োজিত থাকা জরুরি। পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে কোন দলেরই রাজনীতি স্বচ্ছ বলে মনে হচ্ছে না। সবারই লক্ষ্য মনে হয় সাময়িক ফায়দা লোটা। তা না হলে পার্বত্য সংকটের সঠিক ঐতিহাসিক মূল তালাশ করা হতো এবং তারই ভিত্তিতে জাতীয় সংকট মুক্তির পথ ও নীতি নির্ধারণ অগ্রাধিকার পেতো। বলা যায় একমাত্র পার্বত্য জনসংহতি সমিতি ছাড়া কোন জাতীয় রাজনৈতিক দলই, সাংগঠনিকভাবে সিদ্ধান্তকৃত কোন পার্বত্য নীতিতে আবদ্ধ নেই। ক্ষমতামুক্ত আসর মুহূর্তেই নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়। কিন্তু অনুরুপ রাজনৈতিক অবসরে পার্বত্য ইস্যুসহ জাতীয় সমস্যা সংকটের ব্যাপারে দলীয় সুরাহামুলক কোন নীতি ও সিদ্ধান্তই গৃহীত হচ্ছেনা। তাই ক্ষমতাসীন হলে দৈনন্দিন কর্মব্যস্থতার ভিতর কেবল অন্ধভাবে সমাধান হাতড়ানোই সার হয়, অথবা আমলাদের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। তাই তো সঠিক ব্যবস্থা গৃহীত হয় না, এবং সংকট মুক্তিও ঘটেনা। তবু সঠিক আর বেঠিক হোক, নিজ নিজ কর্মক্রিয়ার পক্ষে বাহবা পেতে সবাই উদগ্রীব থাকেন। গৃহযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হলে, বর্তমানে তার শীর্ষ স্থানীয় মর্যাদা লাভ কখনো সম্ভব হতো না। ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর, তার বিভিন্ন ভাষী জাতি সত্তাদের একত্রিত করে রাষ্ট্র গঠনে ব্যর্থ হলে, তা এখনো অনুন্নত জেলে বন্দর হয়েই থাকতো। বৃহৎ জনগোষ্ঠী বাঙ্গালীদের সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী ও উপজাতি সমূহ মিলে বৈচিত্রময় বাংলাদেশী জাতি শক্তি এক বিশাল সম্পদ। এই জনশক্তিকে উন্নত মেধায় পরিণত করা গেলে, উন্নত ভবিষ্যৎ অবশ্যম্ভাবী। তাই অত্যাবশ্যক হলো মেধা উন্নয়নের রাজনীতি। মেধাই জন্ম দিবে সম্পদের এবং মেধাই বয়ে আনবে উন্নয়নের কৌশল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ধারা, উপধারাগুলো পাঠ করে আমি অনেকটা সন্দিহান হয়ে পড়েছি। কেন যেন মনে হচ্ছে এ চুক্তি কোন দিন বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না এবং শান্তি আনতে সক্ষম হবে না। বরঞ্চ অশান্তি সৃষ্টি করবে বেশি। অথচ এ চুক্তি সম্পাদন হবার পর অনেক পেটুয়া বুদ্ধিজীবি এর স্বপক্ষে অনবরত সাফাই গাইলেন বিভিন্ন উপায়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট নিয়ে অনেকেই কথা বলে বা বলার প্রয়াস পায়। কিন্তু মূল সমস্যা সম্পর্কে তাদের অনেকেই আসলে কিছুই জানে না। সরকারেরও একই সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যা নিয়ে সরকার প্রধানকে বিষদভাবে অবহিত করার মত জ্ঞান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রয়োজন। আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসুক এবং পার্বত্য অধিবাসীরা তাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করার সুযোগ পাক। কিন্তু সম্পাদিত এ চুক্তির মাধ্যমে যে শান্তি আসবে সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই চুক্তি আরো বেশি অশান্তির আগুন ছড়িয়ে দেবে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে নয়-সারাদেশে। অনেকে মনে করেন যে, কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করে এই চুক্তি সম্পাদিত করা হয়নি। এতে জাতীয় স্বার্থের, সংবিধানের ও দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতি সুবিচার করা হয়নি।

www.pathagar.com

এ চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই ভারতের স্বার্থের কথা উল্লেখ করেছেন। এটা অবশ্য ঠিক যে, ভারত আমাদের পার্শ্বে সবসময় একটি মূর্তিমান প্রবল উপস্থিতি। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সে সবসময় চেষ্টা করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অধিবাসীদের নেতারা বুঝতে পারছেন তাঁদের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সীমানার মাঝেই বসবাস করতে হবে এবং বাংলাদেশীদের সুঃখ দুঃখের শরীক হতে হবে। এটা খুবই আশার কথা। নুতন উপলব্ধির আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা তাদের অধিকারগুলো অর্জন করতে সক্ষম হন এবং এই দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী করার কাজে তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকুক এটাই সকলের কাম্য। একটা ব্যাপার তাদের বুঝতে হবে যেখানে চুক্তি করা হয়, চুক্তি ভঙ্গ করার বা সংশোধনেরও একটি অবকাশ থেকে যায়। কাজেই কোন পক্ষই নিজ অবস্থানে দৃঢ় না থেকে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে বাস্তবতার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

www.pathagar.com

সংবিধানের আলোকে পার্বত্য চুক্তি

বিগত ১৯৯৭ ইং সালের ২রা ডিসেম্বর রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত, অসম, সংবিধান ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। তদানিন্তন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও সরকার প্রধান শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে এদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মতামতকে উপেক্ষা করে মাত্র ১০ মিনিটের ব্যবধানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তদানিন্তন সরকারি দলের চীপ হুইপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির আহবায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি এবং শান্তি বাহিনীর প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা। এ চুক্তি প্রথমতঃ বাংলা ভাষায় লিখিত এবং ১৫ পৃষ্ঠায় কম্পিউটার মুদ্রিত ছিল। এ চুক্তিটি ৪টি খন্ডে বিভক্ত যেমন ঃ

১। সাধারণ।
২। পার্বত্য জেলা পরিষদ (পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ)।
৩। পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ এবং
৪। পূনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী।

এ চুক্তির 'ক' খন্ডে ৪টি ধারা, 'খ' খন্ডে ৩৫টি ধারা, 'গ' খন্ডে ১৪টি ধারা এবং 'ঘ' খন্ডে ১৯টি ধারা রয়েছে। চারখন্ডে সর্বমোট ৭২টি ধারা এবং ধারাগুলোর আওতায় আরো বহু সংখ্যক উপধারা রয়েছে। পার্বত্য চুক্তির সম্যক ধারাসমূহ বিশ্লেষণ করলে এক বিশাল গবেষণা কর্মে পরিণত হবে। তাই নিম্নে মূল বিষয়গুলো সীমিত পরিসরে বিশ্লেষণ করা হলো ঃ

প্রামান্য বিশ্লেষণ-১

চুক্তির (ক) সাধারন খন্ডের ১ নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল' হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতীয়দের পাশাপাশি অর্ধেকের চেয়েও বেশি অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বসবাস। এ ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে বস্তুতঃপক্ষে অস্বীকার করা হয়েছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলাদেশকে একক এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এতে আঞ্চলিকতা এবং অঞ্চল ভিত্তিক তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার কোন স্থান নেই। কথিত পার্বত্য চুক্তি বাংলাদেশের এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। ১৯০০ সালের পার্বত্য

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম শাসন বিধিতে (Chittagong Hill Tracts Regulation) এবং পরবর্তীতে ১৯২০ ও ১৯২৫ সালে সংশোধনমূলে উক্ত বিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে Excluded Area বা শাসন বহির্ভূত এলাকা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু ১৯৮৯ সালে তদানিন্তন এরশাদ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি (Hill Tracts Regulation – 1900) রদ ও রহিত করেন। যা, বাংলাদেশ গেজেট, বৃহস্পতিবার, মার্চ ২, ১৯৮৯ এ প্রকাশিত হয়। এটি ১৯৮৯ সালের ১৬ নং আইন হিসেবেও পরিচিত। এ আইনের ফলে বাংলাদেশ শাসন বহির্ভূত এলাকা অর্থাৎ Excluded Area বা উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল বলে আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।

১৯৮৯ ইং সালে তদানিন্তন এরশাদ সরকার সন্তু লারমাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধের প্রতিশ্রুতিতে সীমিত স্বায়ত্বশাসনের আদলে পার্বত্য জেলাসমূহে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন এবং এতদসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করেন। পরিষদ আইন সমূহ যথাক্রমে ঃ

১। পার্বত্য রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ আইন।
২। পার্বত্য বান্দরবান জেলা পরিষদ আইন এবং
৩। পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ আইন।

এই আইনগুলো ১৯৮৯ সালের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন দ্বারা গঠিত। উক্ত আইন সমূহে পার্বত্য চট্টগ্রামকে যদিও উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল এবং বিশেষ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তথাপিও এটি বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতি প্রজাতন্ত্রের পরিচিতি জাতি সত্ত্বা ও নাগরিকত্বের সংজ্ঞা এবং সাংবিধানিকভাবে 'রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সমান' এ ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যেমন :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে প্রজাতন্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশ 'একক রাষ্ট্র', রাষ্ট্রভাষা বাংলা (অনুচ্ছেদ-৩)। সংবিধানের ৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল নাগরিকগণ বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হবেন। সংবিধানের ৭(১) এবং ৭(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিককে জনগণ বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতি কিংবা অ-উপজাতি হিসেবে কাউকে চিহ্নিত করার সুযোগ রাখা হয়নি। বাংলাদেশের সংবিধানে পৃথক কোন জাতিসত্ত্বারও স্বীকৃতি নেই। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৬, ও ৪২ নং অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের সমতা, সমান অধিকার ও সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করার কথা বলা হয়েছে।

সংবিধানের ২৮(৪) এবং ২৯(৩) এর 'ক' অংশের ব্যাখ্যা শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সম্প্রদায় এবং জনসংহতি সমিতির নিয়ন্ত্রণকারীদের জন্য নয়। বরং বাংলাভাষী জনগণ এবং পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার জন্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসকারী বাংলাভাষী জনগণ এবং ক্ষুদ্র জাতি যেমন

www.pathagar.com

বোম, রাখাইন, পাংখো, খুমী-প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকজন প্রকৃত পক্ষেই অনগ্রসর। শিক্ষা-দীক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্যে তারা অবহেলিত। সংবিধানের ২৮(৪) এবং ২৯(৩) অনুচ্ছেদের রক্ষাকবচ হিসেবে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের জন্য যদি কোন কার্যক্রম নেয়া হয় তবে এরাই সাংবিধানিকভাবে উক্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার হকদার। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর ছদ্মাবরণে শুধুমাত্র চাকমা সম্প্রদায় এই সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার হকদার নয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৭(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরুপে, এ সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন'। আবার পার্বত্য চুক্তির মুখবন্ধে বলা হয় বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় এ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সুতরাং পার্বত্য চুক্তির সংবিধানবিরোধী ধারা সমূহ মুখবন্ধের ভাষ্য অনুযায়ী সর্বদাই এবং সর্বাদালতে বাতিলযোগ্য।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-২

পার্বত্য চুক্তির (ক) সাধারণ খন্ডের ২ নং ধারা অনুযায়ী এ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আইন, বিধি প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা সংযোজন ও বিয়োজনের কথা উল্লেখ আছে। বস্তুতপক্ষে এ চুক্তিতে স্বীকার করা হয়েছে যে, যদি চুক্তি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সংবিধানও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় এতে তাও করা হবে। চুক্তির মূখবন্ধের ভাষ্য অনুযায়ী এ বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। চুক্তি প্রণেতারা জানেন, এ চুক্তির কোন কোন অংশের বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রচলিত আইন কিংবা সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু তারা এ বিষয়টি চুক্তিতে গোপন রেখেছেন। চুক্তি প্রণেতারা এও জানেন, এ চুক্তি প্রচলিত আইনের পরিপন্থী।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-৩

পার্বত্য চুক্তির ২য় খন্ডের অর্থাৎ 'খ' (পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ) এর ১, ৩, ও ৪ ধারা অনুযায়ী সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত বাংলাদেশের 'জনগণ' কে অ-উপজাতি ও উপজাতি দ্বিধাবিভক্ত করা হয়েছে। যেখানে দরকার ছিল জাতীয় ঐক্য সংহতি সেক্ষেত্রে চুক্তিতে দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করা হয়।

চুক্তির দ্বিতীয় বা 'খ' খন্ডের ৩ নং ধারায় অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞায় বলা হয়, অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা বলতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত বসবাস করেন তাকে বুঝাবে। চুক্তির এ ধারায় অ-উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দার বিষয়ে শুধু জায়গা জমি নয় জায়গা জমির বৈধতার ক্ষেত্রেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। একজন অ-উপজাতি পার্বত্য জেলায় দীর্ঘদিন যাবত বসবাস করছেন, সরকারের কাছে জমি বন্দোবস্তের আবেদন করেছেন কিন্তু সার্বিক

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিকতা শেষে এখন পর্যন্ত কবুলিয়ত প্রাপ্ত হয়নি, তার বৈধ জমি নেই সে হিসেবে উক্ত অ-উপজাতীয় ব্যক্তি স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন না। তাছাড়া কোন ব্যক্তি জায়গা সম্পত্তি বিষয়ে মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হয়েছেন, আদালত কর্তৃক তার অনুকূলে সত্ব-সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত সে বৈধভাবে সম্পত্তির মালিক হতে পারবেন না। এক্ষেত্রে চুক্তির উল্লেখিত ধারা অনুসারে উক্ত ব্যক্তি অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য নয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কুটকৌশলে পার্বত্য জেলাসমূহে একযুগেরও অধিককাল যাবত ভূমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া বন্ধ আছে।

পার্বত্য জেলা সমূহের জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রেও অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দার সনদ পত্র প্রয়োজন হয়। আবার অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার জন্য বৈধ জায়গা সম্পত্তির প্রয়োজন। পার্বত্য জেলা পরিষদ ও চুক্তির এ দ্বৈত ও পরস্পর বিরোধী আইনের ফলে পার্বত্য অ-উপজাতীয় জনগণের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার পথে।

পার্বত্য জেলা সমূহে বিরাজমান আইনে একজন উপজাতীয় ব্যক্তি দেশের যেকোন জায়গায় ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করার অধিকার থাকলেও একজন অ-উপজাতীয় ব্যক্তির পক্ষে পার্বত্য জেলায় ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করার অধিকার নেই। চুক্তির 'খ' অংশের ৪(খ) ধারা মতে, জেলা পরিষদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন অ-উপজাতীয় প্রার্থী অ-উপজাতীয় কিনা তা স্থির করবেন উপজাতীয় হেডম্যান, ইউ পি চেয়ারম্যান/পৌরস-ভা চেয়ারম্যান এর প্রদত্ত সনদপত্রের উপর ভিত্তি করে উপজাতীয় সার্কেল চীফ। অন্যথায় একজন বাংলাভাষী অ-উপজাতীয় পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে একজন অ-উপজাতীয় বাংলাভাষী প্রার্থীর যোগ্যতাকে উপজাতীয়দের দয়ার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-৪

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খন্ডের ৯ নং ধারা অনুযায়ী ভোটার তালিকাভূক্তির নতুন যোগ্যতা নির্ধারণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী অ-উপজাতীয়দের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ ধারার সাথে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ১৭ ধারা একত্রে পাঠ করলে দেখা যায়, একজন ব্যক্তি পার্বত্য এলাকায় ভোটার হবেন যদি তিনি:

১। বাংলাদেশের নাগরিক।
২। বয়স অন্যূন আঠার বছর।
৩। কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানষিকভাবে অসুস্থ ঘোষিত না হন এবং
৪। পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

www.pathagar.com

কিন্তু বাংলাদেশ সংবিধানে (১২২ নং অনুচ্ছেদ) এবং নির্বাচন সংক্রান্ত আইনে ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দার কথা বলা নেই। সেখানে অপরাপর শর্তসহ বলা হয়েছে 'যদি তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী হন' চুক্তির এ ধারায় স্থায়ী বাসিন্দা শর্ত জুড়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে যাতে করে অ-উপজাতীয় একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী নির্বাচন সমূহে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারে। কারণ:

স্থায়ী বাসিন্দা হতে হলে প্রথমতঃ তাকে বৈধ জায়গা সম্পত্তির মালিক হতে হবে। সুতরাং পার্বত্য অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে বসবাসকারী অ-উপজাতীয় ব্যক্তি যারা পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চুক্তির বিধিনিষেধ আরোপ এবং বিভিন্ন কুটকৌশলে বৈধ জায়গা সম্পত্তির মালিক হতে পারেন নি তারা ভোটার হতে পারবেন না। যে সকল ব্যক্তি ভাড়ায় থাকেন, চাকুরিসূত্রে পার্বত্য জেলায় আগমন করেছেন তারাও ভোটাধিকার হতে বঞ্চিত হবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে একজন উপজাতীয় ব্যক্তি সমতল জেলায় চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা অন্যভাবে বসবাস করার জন্য (বৈধ জায়গা সম্পত্তি না থাকা সত্ত্বেও) ভোট দিতে পারবেন, পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী অনেক অ-উপজাতীয় ব্যক্তি তা পারবেন না। (স্থায়ী বাসিন্দার বিষয়টি পূর্বে আলোচিত হয়েছে)। এটি পার্বত্য জেলায় বসবাসকারী অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-৫

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খন্ডের ২৬ নং ধারামূলে ১৯৮৯ সালে জেলা পরিষদ আইনের (স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন) ৬৪ ধারার ব্যাপক সংশোধন আনা হয়েছে। এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ, এখতিয়ার, ইচ্ছে একেবারে লোপ পেয়েছে। ১৯৮৯ সালের জেলা পরিষদ আইন পার্বত্য জেলাসমূহে ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতাকে একেবারে সংকুচিত করে দেয়। উক্ত আইনের ৬৪ ধারায় বলা হয়েছে:

ভূমি হস্তান্তরে বাধানিষেধ: 'আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি) পার্বত্য জেলার এলাকাধীন কোন জায়গা জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না এবং অনুরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোন জায়গা উক্ত জেলার বাসিন্দা নহে এরূপ ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাবেনা। তবে শর্ত থাকবে, সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা, সরকার বা জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে হস্তান্তরিত বা বন্দোবস্তকৃত জায়গা জমি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রয়োজন হতে পারে এরূপ কোন জায়গা জমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।'

www.pathagar.com

কিন্তু পার্বত্য চুক্তির ২৬ নং ধারায় ব্যাপক সংশোধনপূর্বক বলা হয়েছে, "আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্ত যোগ্য কোন খাস জমিসহ কোন জায়গা জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যাতীরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।" (তবে পূর্ববর্ণিত শর্ত ঠিক রাখা হয়)

ভূমির মালিক রাষ্ট্র, প্রতিটি জেলার প্রশাসকগণ রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে খাস সম্পত্তির মালিক। তিনি কতিপয় শর্তাধীনে খাস সম্পত্তি বন্দোবস্ত প্রদান করে থাকেন। আর কোন ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনে সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় করবেন এটাই নিয়ম। কিন্তু পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে- প্রথমতঃ বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়তঃ জেলার বাসিন্দা নহে এমন ব্যক্তির কাছে ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পরিষদের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা ছিল। কিন্তু জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যাপারে জেলা পরিষদের অনুমোদন বাধ্যকর করা হয়নি। কিন্তু পার্বত্য চুক্তির 'খ' খন্ডের ২৬ নং ধারায় জেলার অস্থায়ী কিংবা স্থায়ী বাসিন্দা উভয়েই সম্পত্তি বন্দোবস্ত প্রাপ্তি, ইজারা প্রদানসহ সমুদয় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পরিষদের অনুমোদন বাধ্যকর করা হয়।

এতে করে একজন নাগরিকের অপরাপর জেলার ন্যায় পার্বত্য জেলা সমূহে সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় তথা হস্তান্তরে স্বেচ্ছা প্রণোদিত অধিকারকে ক্ষুন্ন করা হয় যা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি। একইভাবে ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে জেলা প্রশাসকগনের ক্ষমতা এবং অধিকারও ক্ষুন্ন করা হয়। এতে করে ভূমি বন্দোবস্ত, ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত সমূদয় বিষয় উপজাতীয় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের দয়ার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যার উপর রাষ্ট্রের বা সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রসঙ্গতঃ প্রামাণ্য বিশ্লেষণ ৩, ৪ ও ৫ নং এর সার্বিক মূল্যায়নে দেখা যায়, অ-উপজাতীয়রা ভোটার হতে হলে জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে, স্থায়ী বাসিন্দা হতে হলে বৈধ জায়গা সম্পত্তির মালিক হতে হবে। আর অ-উপজাতীয়রা যাতে করে বৈধ জায়গা সম্পত্তির মালিক হতে না পারে এর জন্য সকল পথ বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

প্রামান্য বিশ্লেষণ-৬

১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৮ ধারামতে এতদাঞ্চলের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে। ৬৮ ধারার ১ উপধারায় বলা হয়েছে, 'এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপণ দ্বারা বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।' কিন্তু পার্বত্য চুক্তির 'খ' খন্ডের ২৯ ধারায় জেলা পরিষদ আইনের ৬৮(১) ধারা সংশোধন পূর্বক বলা হয়েছেঃ 'এই আইনের (জেলা পরিষদ আইন) উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা

www.pathagar.com

পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পূনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করার বিশেষ অধিকার থাকবে'। জেলা পরিষদ আইন এবং পার্বত্য চুক্তির উল্লিখিত ধারাদ্বয় বিশ্লেষণ করলে এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে একক কোন সিদ্ধান্ত নেয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-৭

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খন্ডের ৯(খ) ধারা অনুযায়ী পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদ সমূহের কাজের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। এ ধারা পর্যালোচনা মতে, ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ন্যাস্ত থাকলে এটি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের প্যারালাল আরও একটি পৃথক প্রশাসন যা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-৮

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খন্ডের ৯(গ) ধারা অনুযায়ী তিন পার্বত্য জেলার সাধারন প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। তাহলে এ তিন জেলার ডি সি, এসপি ও উন্নয়নের অন্যান্য বিভাগের আওতা, ক্ষমতা, কাজ কি হবে? আসলে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে আঞ্চলিক পরিষদ। প্রশাসনের যে যেখানে আছে সবাই হবে এর একান্ত অনুগত ভৃত্য।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-৯

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খন্ডের ৯(চ) ধারা অনুযায়ী ভারী শিল্পে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা বাংলাদেশের জাতীয় সরকারের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদের হাতে দেয়া হয়েছে।

প্রামান্য বিশ্লেষন-১০

১৯৮৯ সালের জলা পরিষদ আইন এবং ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তি একত্রে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রত্যেকটিতে আসন বরাদ্দ এক উপজাতীয় চেয়ারম্যান, বাইশজন উপজাতীয় সদস্যসহ মোট ২৩ জন উপজাতীয় আর বাঙ্গালী তথা অ-উপজাতীয় ১০ জন। চেয়ারম্যান তাও উপজাতীয়দের। বিষয়টি আরো আশ্চর্যজনক একজন অ-উপজাতীয় ব্যক্তি চেয়ারম্যান পদে ভোট দিতে পারবে তবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেনা অথচ পার্বত্য জেলা সমূহে ৫০% এর অধিক অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বসবাস হলেও জনসংখ্যার অনুপাতে অ-উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে আসন বরাদ্দের সুযোগ রাখা হয়নি।

www.pathagar.com

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-১১

পার্বত্য চুক্তির 'গ' অংশের ২ ও ৩ ধারায় আঞ্চলিক পরিষদের গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ২ ধারায় বলা হয়েছে, 'পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন। যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন'। ৩ ধারায় বলা হয়েছে চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে (ইতিমধ্যে অন্তবর্তীকালীন পরিষদ গঠিত হয়েছে) এবং পরিষদের $^{৩}/_{২}$ অংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হতে নির্বাচিত হবে। সে হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে চেয়ারম্যান সহ ১৫ জন উপজাতীয় সদস্য এবং ৭জন অ-উপজাতীয় সদস্যের পদ রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ (উপজাতি) পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটদানের অধিকারও থাকবে। সার্বিক হিসেবে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে উপজাতীয় ১৮টি পদের বিপরীতে অ-উপজাতীয় পদ মাত্র ৭টি। সুতরাং ভোটাভুটিতে সিদ্ধান্ত কোনদিকে যেতে পারে তা অবশ্যই ভাবনার বিষয়।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-১২

পার্বত্য চুক্তি 'ঘ' খন্ডের ১৭(ক) ধারায় বলা হয়েছে "সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, দীঘিলানা ও রুমা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম-প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেয়া হবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হইবে"।

পার্বত্য চুক্তির এ ধারা পর্যালোচনায় দেখা যায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কোথায় থাকবে কি থাকবে না, সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী বিডিআর, কোথায় থাকবে কি থাকবে না ইত্যাদি স্পর্শকাতর বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা এই চুক্তি অনুযায়ী বিসর্জন দেয়া হয়েছে। চুক্তির প্রায় সাত বছর পরও সন্তু লারমা গং পার্বত্য চট্টগ্রামে শর্ত অনুযায়ী শান্তি উপহার দিতে পারেনি। প্রতিনিয়ত পার্বত্য চট্টগ্রামে খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, চাঁদাবাজি অব্যাহতভাবে চলছে। দফায় দফায় উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে সেনাবাহিনী যুদ্ধের ভারী অস্ত্র-সস্ত্র উদ্ধার করছে। অধিকন্তু জনসংহতি সমিতি এবং এর অঙ্গসংগঠন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন এর পাশাপাশি সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউপিডিএফ নামে আরও একটি পৃথক সশস্ত্র সংগঠনের জন্ম হয়েছে। দু'গ্রুপের সশস্ত্র ক্যাডারদের মধ্যে প্রতিনিয়ত পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংস ঘটনা লেগেই আছে। সন্তু লারমা এবং তার অনুসারীরা প্রতিমুহূর্তেই

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেও সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা ছাড়া পার্বত্যাঞ্চলে তারা স্বাভাবিকভাবে এক মুহূর্তও চলাচল করতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও নিরাপত্তার পাশাপাশি সেনাবাহিনী দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, চিকিৎসা সেবা, শিক্ষা, পানীয় জলের সু-ব্যবস্থাসহ প্রাত্যহিক কাজে উপজাতীয়দের সাহায্য সহযোগিতা এবং বে-সামরিক প্রশাসনকে আইন শৃংখলা সহায়তা দিয়ে আসছে। সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বৃত্তি, চাকুরির সুবিধা, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ ইত্যাদি নিয়েও উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ প্রতিনিয়ত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে আসছে। বস্তুতপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী রটনার শিকার। দূর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে স্ত্রী, পুত্র পরিজন বিহীন অবস্থায় ম্যালেরিয়াসহ অনেক দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে স্বাধীনতা উত্তরকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু সেনাসদস্য অকালে প্রাণ হারিয়েছে। এছাড়াও উপজাতীয় তথা জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের মিথ্যা অভিযোগে পার্বত্য অঞ্চলে কর্মরত বহু সেনাসদস্য ও মেধাবী সেনা কর্মকর্তাকে অকালে চাকুরি থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার দৃঢ় প্রত্যয়ে পার্বত্য জেলায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শতশত বীর সেনানী উপজাতীয় গেরিলাদের হাতে শাহাদাত বরণ করলেও পার্বত্য চুক্তিতে সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে খাটো করে দেখানো হয়েছে। বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো সেনাবাহিনী ও সেনা ক্যাম্প স্থাপনের পরিবর্তে পার্বত্য চুক্তিতে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করার অঙ্গিকার করা হয়েছে। পার্বত্য চুক্তির এ দফায় অবস্থার প্রেক্ষিতে সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষায় দেশের সব জায়গায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছে। পার্বত্যাঞ্চলে ব্যাপকভাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন না থাকলে দেশের এক দশমাংশ এলাকা বহুপূর্বেই হাত ছাড়া হয়ে যেত।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-১৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসারে খাজনা আদায় এবং ছোটখাট বিরোধ নিষ্পত্তি কল্পে প্রতিটি মৌজায় একজন হেডম্যান এবং প্রতিটি পাড়ায় একজন কারবারী নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পার্বত্য জেলা সমূহের সকল হেডম্যান এবং কারবারী উপজাতীয় শ্রেণীভূক্ত। পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহের সকল চেয়ারম্যান এবং সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যগণ, তিন জন সার্কেল চীফ, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যগণ, টাস্কফোর্স বিষয়ক চেয়ারম্যান এবং এর সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যগণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং এর সংখ্যাগরিষ্ট উপদেষ্টাগণ চুক্তির বিধিমতে উপজাতীয়দের মধ্য হতে নির্বাচিত বা মনোনীত। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর চেয়ারম্যানের পদটিও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপজাতীয়দের মধ্য হতে নিয়োগের জন্য চুক্তিতে বিধান রাখা হয়। এতে স্পষ্টতঃ বুঝাই যায় পার্বত্য অঞ্চলে অ-উপজাতীয়দের কোন স্থান নেই।

www.pathagar.com

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-১৪

পার্বত্য জেলা পরিষদ মূলতঃ একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এ পর্যন্ত সরকার এ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৪টি বিভাগ হস্তান্তর করেছে। বিভাগগুলোর মধ্যে কৃষি, সমাজসেবা, মৎস, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জেলা পরিষদ, উন্নয়নের পাশাপাশি অধঃস্তন কর্মকতা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, বদলি-নিয়োগ (গেজেটেড ব্যতীত) ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন করে থাকেন।

পার্বত্য চুক্তির 'গ' অংশের ৯(ক) ধারায় বলা হয়েছে আঞ্চলিক পরিষদ জেলা পরিষদ সমূহের সার্বিক কাজের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করবেন। জেলা পরিষদের কাজে কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, পার্বত্য চুক্তির 'গ' খন্ডের ৯(খ) ধারা মতে, আঞ্চলিক পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করবে, ৯(খ) ধারামতে স্থানীয় প্রশাসন আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করবে এবং এ চুক্তির একই খন্ডের ১০ ধারামতে বলা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আঞ্চলিক পরিষদের সাধারন ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে।

আবার চুক্তির 'খ' খন্ডের (৩৪ খ) ধারায় বলা হয়েছে, পার্বত্য জেলা পরিষদ পুলিশ (স্থানীয়) এর কার্যাদি তত্ত্বাবধান করবে। (জেলা পরিষদের কার্যাদি তত্ত্বাবধান করবে আঞ্চলিক পরিষদ)। বিশ্লেষণে, পুলিশসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রশাসনের নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে একজন উপজাতীয় চেয়ারম্যানের অধীন একটি পৃথক সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক রাষ্ট্র বলা যায়।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-১৫

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খন্ডের ২৫(খ) ধারায় বলা হয়েছে, আপাতত বলবৎ অন্যকোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকার জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সহিত আলোচনা ও উহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাবেনা। 'ভূমির মালিক রাষ্ট্র' ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি প্রশাসনের দায়িত্ব সরকারের। পার্বত্য চুক্তির এ ধারায় রাষ্ট্রের ও সরকারের ক্ষমতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-১৬

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩২ নং ধারার মাধ্যমে জেলা পরিষদ আইনের ৭৯ নং ধারার ব্যাপক সংশোধনী আনা হয়। পার্বত্য চুক্তির ৩২ নং ধারায় বলা হয়, "পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন

www.pathagar.com

পরিষদের (জেলা পরিষদ) বিবেচনায় এবং জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে, পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারন ব্যক্ত করিয়া আইনটি সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে'। জাতীয় সংসদ দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান। পার্বত্য চুক্তির এ ধারার মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদের ক্ষমতাকে সংকুচিত কিংবা সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-১৭

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩ নং ধারায় অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দাদের সংজ্ঞা দেয়া হলেও চুক্তির কোথাও উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। স্থায়ী বাসিন্দা কিংবা ভোটার হওয়ার যোগ্যতার ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের বৈধ জায়গা সম্পত্তির মালিক হওয়ার পূর্বশর্তও নেই। সে হিসেবে পর্যবেক্ষকদের মতে, বিভিন্ন নির্বাচনী সময়কালে কিংবা সম্ভ্র গং দের সূদুর প্রসারী স্বপ্নের জুম্মল্যান্ড বাস্তবায়নে পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্য, মিজোরাম, অরুণাচল এবং মিয়ানমার থেকে স্বেচ্ছায় কিংবা বিতাড়িত উপজাতীয়দের জড়ো করার একটি ক্ষেত্র সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশের বিপুল সংখ্যক উপজাতীয় লোক পার্বত্য অঞ্চলের নিরাপদ আশ্রয়ে এসেছে বলে জানা যায়।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-১৮

পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ৮ ধারায় রাবার চাষ ও অন্যান্য জমি বরাদ্দের বিষয়ে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। এ ধারায় বলা হয়, 'যে সকল অ-উপজাতীয় ও অস্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লানটেশনের জন্য জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ (১০) বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সার্বিক ব্যবহার করেন নাই সে সকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে'। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নে উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয়দের মধ্যে রাবার বাগান কিংবা বিবিধ ফলজ ও বনজ বাগান প্লানটেশনের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী কিছু কিছু জমি বরাদ্দ দিয়েছিল। সৃষ্ট শান্তি বাহিনীর অত্যাচার নিপীড়ন, হত্যা, খুন, জ্বালাও পোড়াও সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রমের কারনে সরকারের নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিপুল সংখ্যক অ-উপজাতীয় পরিবার গুচ্ছগ্রামে আশ্রয় নেয়, ফলতঃ কোন কোন পরিবারের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া জমিতে তারা যথাসময়ে বাগান সৃজন করলেও সঠিক পরিচর্যা বা তত্ত্বাবধান করতে পারেনি। এ কারণে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত সম্পত্তি অনেকাংশে পতিত অবস্থায় থাকে। অপর দিকে শরণার্থী হিসেবে ভারত গমন করার কারনেও উপজাতীয়দের অনূকুলে বরাদ্দকৃত জমিও পরিত্যাক্ত হয়। পার্বত্য চুক্তির এ ধারায় শুধুমাত্র অ-উপজাতীয়দের জমির বরাদ্দ বাতিল করার কথা উল্লেখ

www.pathagar.com

থাকলেও উপজাতীয়দের ব্যাপারে এ ধরনের কোন পদক্ষেপ নেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-১৯

পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ১৯ ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে রূপরেখা দেয়া হয়। উক্ত মন্ত্রণালয়ে ১ মন্ত্রী ও ১০ জন উপজাতীয় উপদেষ্টার বিপরীতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্য হতে মাত্র ৩ জন অ-উপজাতীয় উপদেষ্টার পদ রাখা হয়েছে। এছাড়াও তিন পার্বত্য জেলার ৩ জন সংসদ সদস্য উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত, তবে এ সব সংসদ সদস্যগন অ-উপজাতীয় তা অধিকাংশ সময় আশা করা যায় না। এভাবে, চুক্তির উল্লেখিত ধারামূলে এ অঞ্চলের বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণকে হিস্যা অনুযায়ী তাদের প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-২০

পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ১০ ধারায় কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে উপজাতীয়দের সুযোগ সুবিধার কথা উদ্ধৃত হয়। চুক্তির এ ধারা অনুসারে, সরকারি চাকুরি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং বিদেশে গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তির ব্যাপারে উপজাতীয়দের কোটা সংরক্ষনের ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু পার্বত্য জেলা সমূহের অ-উপজাতীয়দের জন্য চাকুরি ক্ষেত্রে কোটা একেবারে বরাদ্দ নেই। পক্ষান্তরে, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে অ-উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের কোটা উপজাতীয়দের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। গবেষণা এবং বিদেশে উচ্চ শিক্ষার্থে বৃত্তি প্রাপ্তির কোটা অ-উপজাতীয়দের জন্য নেই বললেই চলে। পার্বত্য অঞ্চলে অ-উপজাতীয় জনগন শিক্ষা-দীক্ষা চাকুরিতে উপজাতীয়দের তুলনায় অনগ্রসর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনগ্রসর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য সরকার কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহনের ক্ষেত্রে অ-উপজাতীয় নারী, শিশু ও নাগরিকরাই সর্বাগ্রে বিবেচনায় আনা জরুরি।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-২১

পার্বত্য চুক্তির 'গ' খন্ডের ৬ ধারায় বলা হয়েছে, 'পরিষদের (আঞ্চলিক পরিষদ) মেয়াদ হবে ৫ বৎসর। পরিষদ বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনূকুলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।'

www.pathagar.com

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩৫ টি ধারা এবং বহু সংখ্যক উপধারা মোতাবেক তিনটি পার্বত্য জেলার অনুরূপ যাবতীয় এখতিয়ার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুযোগ পেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদও বাজেট বিধি প্রণয়ন থেকে শুরু করে কর্মচারী নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত একছত্র অধিকার পাবে। চুড়ান্ত স্বাধীনতা পাবে। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিণত হবে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা বিশিষ্ট ভূ-খন্ড। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হবে কনফেডারেল কাঠামোর কেন্দ্র এবং অঙ্গরাষ্ট্র তিনটি হবে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান। পার্বত্য চুক্তির দ্বারা বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের একক, সার্বভৌম, স্বাধীন চরিত্র এভাবে ধুলিষ্যাৎ হয়েছে। রাষ্ট্রের এককত্ব ও সার্বভৌমত্ব চুড়ান্তভাবে ধ্বংস হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের হয়তো একদিন দিনের আলোতে দেখতে হবে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচুর্যময়, বনজ ও খনিজ সম্পদে ভরপুর একদশমাংশ এলাকা হাতছাড়া হয়ে গেছে।

প্রামাণ্য বিশ্লেষণ-২২

২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তি সংবিধান বিরোধী বলে প্রমাণিত। এ অবৈধ চুক্তির দায় দায়িত্ব কখনও বাংলাদেশ, প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্র ও জনগণের উপর আসতে পারে না। কমিটির কাজের শর্তের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কমিটির কোন ক্ষমতাই ছিলনা চুক্তি করার এবং তা স্বাক্ষরের সাথে সাথে বলবৎ হয়ে গেছে বলে চুক্তিতে লিখিতভাবে ঘোষণা দেয়ার। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে স্বাক্ষর দাতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক জনগণের কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী অ-উপজাতীয় জনগণ কোনক্রমেই সন্তু লারমাকে তাদের প্রতিনিধি মনে করেনা। সন্তু লারমা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয়দের ক্ষুদ্রাংশের সশস্ত্র গ্রুপের নেতা। একজন সশস্ত্র গ্রুপের নেতার সাথে যদি চুক্তি করতে হয় তবে সরকারকে মুকিম গাজী, কালা জাহাংগীর, সুইডেন আসলাম সহ অধুনা মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত এরশাদ শিকদারের সাথেও সন্ত্রাসবিরোধী চুক্তি করা উচিৎ ছিল।

সংবিধানের ৭(১), ১৪৫(১) ও ১৪৫(২) অনুচ্ছেদ মোতাবেক, সম্পাদিত ও প্রাদেশিক নয় বিধায় পার্বত্য চুক্তিটি সংবিধান বিরোধী ও অবৈধ। আবার বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগের (নির্বাহী বিভাগ) ২য় পরিচ্ছদের (প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রসভা), ৫৫(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্বে "এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে"। সে হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি কিংবা এই কমিটির আহ্বায়ক জাতীয় সংসদের তদানিন্তন চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার মালিক নয়। এক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর চুক্তিতে সই করা অসাংবিধানিক ও অবৈধ।

www.pathagar.com

পরিশেষে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সাংবিধানিক এলাকার মধ্যে অবস্থিত একদশমাংশ এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। এতদাঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতীয় অধিবাসীরা এ ভূ-খন্ডের আদিবাসী নয়। তারা পার্শ্ববর্তী এবং বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তারা ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি অনুসারে সরকারকে কোনোরূপ ট্যাক্স প্রদান করে না, দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই। অথচ তারা রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে সর্বদাই রাষ্ট্র এবং দেশের মূল ভূ-খন্ডের অধিবাসী অ-উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ কোটি কোটি টাকা উন্নয়নের অর্থ অ-উপজাতীয় কিংবা সমতল জেলার অধিবাসীরা সরবরাহ করে অথচ পার্বত্যাঞ্চলে তারা অবাঞ্চিত।

উপজাতীয় জনগোষ্ঠী সুদূর অতীত থেকে এ পর্যন্ত কখনই বাংলাদেশ নামক (সাবেক পূর্ব পাকিস্থান) এ ভূ-খন্ডের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। বৃটিশ বিতাড়নের সময় তারা ভারতের সঙ্গে থাকার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিল আর ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় তারা পাকিস্তানের সাথে একত্রিভূত থাকার জন্য সম্ভব সব কিছু করেছে। ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে উপজাতীয়দের ন্যুনতম ভূমিকা নেই। অধিকন্তু রাজা ত্রিদিব রায়ের নেতৃত্বে এক বিশাল উপজাতীয় গোষ্ঠী সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। তাই আজকের পার্বত্যবাসীর দাবি উন্নয়নের পাশাপাশি জনগণের হারানো অধিকার ফিরে পেতে হবে। অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য পার্বত্য জনগন সবধরনের ত্যাগ স্বীকারে রাজী আছে। আর এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদিচ্ছা এবং সমধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পাশাপাশি তীব্র আইনি লড়াই।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম-সন্ত্রাস কবলিত অশান্ত জনপদ

দীর্ঘ দিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি বিরাজ করছিল। সমগ্র দেশ থেকে এই অঞ্চলটি বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস পেয়েছিলো জেএসএস এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। এই অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার শান্তি আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসি জেএসএস) নেতা সন্তু লারমার মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় শান্তি আলোচনা কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে গত ০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হয়। সকলের আশা ছিল এই চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির সুবাতাস বইবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা ভেবেছিলো তাদের স্বাভাবিক ও নিরাপদ জীবন যাত্রার সুযোগ থাকবে। সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছা এবং তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সদস্যদের আগ্রহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর জনমনে স্বস্তি নেমে এসেছিল। পার্বত্যবাসী উপজাতি এবং অউপজাতি সকল সম্প্রদায়ের জনগণ এ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং মোটামুটিভাবে এর সুফল ভোগ করছিল। অত্র এলাকায় বসবাসরত বাঙ্গালীদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার যে শঙ্কা ছিলো তা দূরীভূত হয়েছিল, বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো সকল ধরনের সাম্প্রাদায়িক কলহ ও ক্লেশ, কমে এসেছিলো বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান দুরত্ব ও অমিল। অত্র এলাকায় কর্মরত নিরাপত্তা বাহিনী, পুলিশ প্রশাসন ও বিভিন্ন দেশী বিদেশী মানবাধিকার সংগঠনকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলো সর্বস্তরের জনগণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর অত্র অঞ্চলে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছিল। পার্বত্যাঞ্চলের সাধারণ জনগোষ্ঠী তথা দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল এই ভেবে যে, হয়তোবা পাহাড়ে স্থায়ীভাবে শান্তি ফিরে আসবে। প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসবে অত্র অঞ্চলে সকল জাতিসত্ত্বার অধিবাসীদের মাঝে এ ছিলো পার্বত্য জনগনের একান্ত প্রত্যাশা।

কিন্তু কোন এক অদৃশ্য অপশক্তির ইশারায় ও উস্কানিতে ইদানিং প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এবং সহিংস ঘটনায় আবার উত্তপ্ত ও অশান্ত হয়ে উঠেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম, আর হুমকির আশংকার সম্মুখীন হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠি মুলত যুবকশ্রেণী কতিপয় অসাধু এবং শান্তি ও উন্নয়ন বিরোধী শক্তির অদৃশ্য মদদে পুষ্ট হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং সরকার পক্ষের প্রকাশ্য বিরোধীতা শুরু করে। এই চুক্তি বিরোধী দলটি ইউনাইটেড পিপলস

www.pathagar.com

ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে যারা মূলত জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) হতে দলছুট। এছাড়াও "হিল উইমেন ফেডারেশন" এবং "পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ" নামে আরো দুটি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সংগঠনও বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। এছাড়া জেএসএস-এরও সশস্ত্র দল আত্মরক্ষার নামে একই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এই সব সশস্ত্র গ্রুপ গুলোর সহিংস এবং পরস্পর বিরোধী অবস্থানের ফলে এখন পার্বত্যাঞ্চলে প্রতিনিয়তই ঘটে যাচ্ছে খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ দাবি, চাঁদা আদায়, ছিনতাই, অবৈধ কাঠ ও বাঁশ পাচার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তথা মুখোমুখি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মতো অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছিত ঘটনা। পার্বত্য এলাকার অতি পুরনো দল জেএসএস ও অনিয়মতান্ত্রিক/সহিংসতার রাজনীতি শুরু করেছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনেকাংশেই হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে এবং যথাযথ পরিবেশের অভাবে বাস্ত বায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র সন্ত্রাস শুরু হলো যেভাবে

আজ হতে ৩০ বছর পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন পিসিজেএসএস স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা শুরু করে, সে সময় পার্বত্যাঞ্চলের সাধারণ জনগণের মধ্যে "সশস্ত্র বিদ্রোহ" কথাটার খুব একটা প্রচলন ছিলো না। তখন এসব বিষয় শুধুমাত্র দেশের সচেতন রাজনীতিবিদদের মধ্যে আলোচ্য বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ ছিলো। পাহাড়ীদেরকে সংঘবদ্ধ করা, সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের কর্মকান্ডে তৎকালীন পিসিজেএসএস নেতৃত্ব প্রদাণ করে। এই সংস্থা পরবর্তীতে কতিপয় উপজাতি নেতা ও কর্মীর সমর্থনে আরোও প্রসার লাভ করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্যবাসী উপজাতিদের নিরাপত্তারক্ষা ও স্বায়ত্বশাসন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ এলাকা ঘোষণার দাবিতে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু কোন সরকারই তাদের এই অসাংবিধানিক ও অবৈধ দাবি গ্রহণ না করায় ১৯৭৩ সালের ০৭ জানুয়ারি পিসি জেএসএস এর নেতৃত্বে সশস্ত্র দল "শান্তিবাহিনী" গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের ০২ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র ক্যাডাররা সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের বিরোধীতা প্রদর্শণ পুর্বক বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এদের এসব কর্মকান্ডে খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ, লুণ্ঠন, চাঁদাবাজি ইত্যাদির মতো হীন কার্যক্রম অর্ন্তভূক্ত ছিলো যার কবল হতে পার্বত্যবাসী উপজাতি/অউপজাতি নিরীহ নারী ও শিশুরাও রেহাই পেতো না। অনেক রক্ত ঝরেছে পার্বত্য এলাকায়। নিহত হয়েছে অনেক নিরীহ উপজাতি, বাঙালী জনগণ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। প্রতিবেশী এক রাষ্ট্রের হাতের পুতুল হয়ে তারা খেলছে

www.pathagar.com

নিজেদের মাতৃভূমিতে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করে সন্তু লারমা সকল পার্বত্য অধিবাসীর পক্ষ হতে, এখন আবার জুম্ম জাতির আন্দোলন বা অধিকারের কথা বলে নতুন সুর তুলে বিদেশী সাহায্য সংস্থা গুলোর করুণা লাভের প্রয়াস পাচ্ছেন। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা না করে তিনি বিভিন্ন ভাবে দেশ ও স্বাধীনতার ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করেই চলেছেন।

সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দমনে অভিযান পরিচালনা

পাহাড়ী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ কল্পে তৎকালীন সরকার ১৯৭৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুলিশবাহিনী প্রেরণ করে। পরবর্তীতে একই সরকার ১৯৭৪ সালে পার্বত্য এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনী প্রেরণ করে। ঘটনার বিবর্তনে পার্বত্য এলাকায় তথাকথিত শান্তিবাহিনীর দৌরাত্ম আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার পরবর্তীতে সেনাবহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপির সমন্বয়ে আরোও অধিক সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য অত্র এলাকায় মোতায়েন করে। এই নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান কাজ ছিলো সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের সকল অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার শান্তিপুর্ণ আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি

১। **আইন- শৃংখলা পরিস্থিতি।** শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও অত্র এলাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সশস্ত্র দল তাদের অবৈধ অস্ত্রের মহড়া দিয়েছে। বর্তমানে তা চরম আকার ধারণ করেছে যার প্রেক্ষিতে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। অত্র এলাকায় নিয়োজিত সেনাসদস্যগণ এ সব অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার তথা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড রোধকল্পে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় ও পুলিশ প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট হতে যথেষ্ট আন্তরিক সহায়তা করা হচ্ছে না। এতে করে সর্বাংগীন আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ বিঘ্নিত হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে অবাঞ্চিত ও রক্তক্ষয়ী ঘটনাবলী। এসব সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মধ্যে নিম্নবর্ণিত গুলো উল্লেখযোগ্য :

ক। সশস্ত্র উপজাতি দলগুলো এবং পার্বত্যচুক্তি বিরোধী ক্যাডারগণ কর্তৃক পরিচালিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ও অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা।

খ। চাঁদাবাজি।

গ। অপহরণ ও ছিনতাই।

ঘ। সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা।

ঙ। রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি।

চ। শান্তি ও সম্প্রীতির অবনতি করা।

www.pathagar.com

২। **রাজনৈতিক পরিস্থিতি।** পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরে ৩/৪ বছর যাবত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিমন্ডল বেশ শান্ত ছিলো। কিন্তু ইদানিং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বেশ কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদী ও অসাধু নেতাকর্মী রাজনৈতিক সুবিধা আদায় ও এলাকায় প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য চুক্তির বিপক্ষে বিভিন্ন অবৈধ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনাকারী স্থানীয় সশস্ত্র দলগুলোকে অদৃশ্যভাবে মদদ ও ইন্ধন যোগাচ্ছে। জেএসএস, ইউপিডিএফ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমুহের নেতা কর্মীরা ক্রমাগতভাবে জন সমাবেশ, মিটিং মিছিল, সহিংসতা এবং পারস্পারিক হানাহানি চালিয়ে যাচ্ছে। জেএসএস ও ইউপিডিএফ রাজনৈতিক কারনে এলাকায় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের সমর্থন পুষ্ট অন্যান্য অংগ সংগঠনকে সংগে নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা পরিচালনা করছে। এরফলে প্রায়শই ঘটে যাচ্ছে হত্যা, চাঁদাবাজি, অবৈধ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য চোরাচালানসহ বিভি-ন্ন ধরনের রাষ্ট্র বিরোধী অনৈতিক কার্যকলাপ। এর ফলে দিন দিন স্থানীয় জনমনে শংকা ও নিরাপত্তাহীনতা দানা বাধছে। প্রতিনিয়ত ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও উন্নয়নের ধারা। অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আঞ্চলিক রাজনীতি করতে গিয়ে পাহাড়ের রাজনীতিক দল গুলো সহিংসতার আশ্রয় নিচ্ছে। পার্বত্যচুক্তি বাস্তবায়নের সম্ভাবনা ক্রমশঃ প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে কারন সঠিক পরিবেশ সৃষ্টি না হলে তা তো সম্ভব হবে না। পার্বত্য অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দলমত বর্ণ ধর্ম জাতি নির্বিশেষে এক হয়ে নিঃস্বার্থভাবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

৩। **বাঙালী জনগোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থা।** পার্বত্য চট্টগ্রামচুক্তির পর বেশ কিছু দিন যাবত পাহাড়ী-বাঙালীদের মধ্যে পারস্পারিক সম্প্রীতি বজায় ছিল যা মূলতঃ যুগ যুগ ধরেই এ অঞ্চলে ছিল ঐতিহ্যগতভাবে। কিন্তু পার্বত্যচুক্তির বিরোধী গোষ্ঠী কখনোই পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাঙালীদের বৈধ পূনর্বাসনকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি যার প্রেক্ষিতে তারা বিভিন্ন সময়ে অত্র এলাকায় বসবাসকারী বাঙালীদেরকে নানাভাবে নিপীড়ন করেছে, পুড়িয়ে ও গুলি করে নির্বিচারে পাখির মতো হত্যা করেছে। ফলে তখন থেকেই জাতিগত সম্প্রীতি বিপন্ন হওয়ার মাধ্যমে পাহাড়ী ও বাঙালীদের মধ্যে একটি দুরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে সংগঠিতও হয়েছে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এর মধ্যে গত ২৬ আগষ্ট ২০০৩ তারিখে মহালছড়িতে পাহাড়ী ও বাঙালীদের মধ্যে ঘটে যাওয়া রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ উল্লেখযোগ্য। এসবকে আবার দুঃখজনকভাবে উস্কানী দিচ্ছে দেশের স্বার্থন্বেষী কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা/দল। অথচ স্বার্থন্বেষী মহলের

www.pathagar.com

কোন উস্কানী যদি না থাকে পাহাড়ী বাঙালী পার্বত্য অধিবাসীদের মাঝে সম্প্রীতি গড়ে উঠা স্বাভাবিক এবং তা গড়ে উঠবে কোন সন্দেহ নেই।

যে সকল কারণে পার্বত্য এলাকায় সহিংসতার সুত্রপাত হচ্ছে ।

১। **শান্তিচুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে সশস্ত্র দল সমূহের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ।** পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ও তৎকালীন সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৯৭ সালের ০২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু তখন থেকেই পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এবং হিল উইমেন ফেডারেশনের মতো চুক্তি বিরোধী দলগুলো এটি সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। তারা জে এস এস নেতা সন্তু লারমাকে বিশ্বাসঘাতক ও সরকারের দোসর বলে অভিযুক্ত করে এলাকায় অপহরণ, ছিনতাই, চাঁদা আদায় ইত্যাদির মতো সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। পরবর্তীতে, প্রসিত বিকাস খীসার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ নামক দলটি আত্মপ্রকাশ করায় পার্বত্যচুক্তি বিরোধী চক্রের আন্দোলন আরো জোরদার হয়। ইউপিডিএফ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালায় এবং এতে বেশ সফলতা অর্জন করে স্থানীয় আধিপত্য বিস্তার এবং এলাকায় নিজেদের একক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী অংগ সংগঠন গুলো প্রায়শই জেএসএসের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়। জেএসএসও সন্ত্রাস ও প্রতিহিংসার রাজনীতিতে স্বক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। এর ফলশ্রুতিতে হত্যা, অপহরণ, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, বন্দুকযুদ্ধ ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ও দুর্ঘটনা ইদানিং হতাশাব্যাঞ্জকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা পার্বত্য চুক্তি তথা অত্র এলাকার শান্তিকামী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে করে তুলেছে দুর্বিসহ।

২। **অউপজাতিদের পুনর্বাসন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।** বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সত্তর থেকে আশির দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমিহীন গরিব বাঙালীদেরকে পুনর্বাসনের উদ্দ্যেগ নেয়া হয়। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত সরকারি উদ্যোগে প্রায় ৬০,০০০ বাঙালী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে অউপজাতি জনগোষ্ঠীর এই অনুপ্রবেশ উপজাতি রাজনৈতিক দলটি সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি এবং সরকারের এই সিদ্ধান্ত তারা যে কোন ভাবে প্রতিহত করতে সর্বাত্মক আহবান জানায় ও প্রচেষ্টা করে। এ সমস্ত কারণে পার্বত্যচুক্তির প্রথম থেকেই পাহাড়ী এবং বাঙালী সাধারণ জনগণের মধ্যে একটি দুরত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানীতে বেশ কয়েকটি সম্প্রদায়িক জাতিগত তথা পাহাড়ী- বাংগালী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়।

www.pathagar.com

এ সব সংঘর্ষের মধ্যে গত ২৬ আগষ্ট ২০০৩ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়িতে স্থানীয় পাহাড়ী ও বাঙালীদের মধ্যে ঘটে যাওয়া দুঃখজনক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের কথা উল্লেখযোগ্য। এর ফলশ্রুতিতে উভয় পক্ষের হতাহত হয় বেশ কিছু লোক এবং আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয় বহু ঘরবাড়ি। ইউপিডিএফ এবং জেএসএস উভয় দলই সশস্ত্র ক্যাডার এবং কর্মী লালন করছে। আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষনের লক্ষ্যে তাদের উস্কানীতেই এসব ঘটনা ঘটছে বলে অনেকে মনে করে। পার্বত্যচুক্তির মাধ্যমে অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেয়ার পরও এসব দলগুলো অস্ত্র পায় কোথায়? এসব পাহাড়ী উপদলসমূহ দেশদ্রোহী একটি স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানী ও প্রচ্ছন্ন সাহায্যে অত্র পার্বত্য এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে সরকারের উপর অহেতুক চাপ সৃষ্টি করতে চায়। পাহাড়ী ও বাঙালীদের মাঝে বিরাজমান সম্প্রীতি নষ্ট করে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায়। নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহারের দাবি তুলে এ এলাকার নিরাপত্তা ও শান্তিকে আরো বিনষ্ট করতে চায়। জেএসএস ও ইউপিডিএফ এর একটি বিষয় ভালো করে বুঝা উচিত আঞ্চলিক রাজনীতির মাধ্যমে দুনিয়ার কোথাও কোন দাবি আদায় করা যায়নি। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ও জনগণের মাঝে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার জন্যে সকলের উচিত জাতীয় মুলধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা এবং নিয়মতান্ত্রিক ভাবে রাজনীতি চর্চার মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতিতে দাবি আদায়ের প্রচেষ্টা চালানো।

৩। **বাঙালীদেরকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ।** বাঙালীদেরকে ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণকে জেএসএস নেতৃবৃন্দ সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। এর প্রেক্ষিতে জেএসএস ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি যা পরবর্তীতে একটি প্রধান বিষয় হিসেবে প্রচার লাভ করে। অথচ বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের নিজস্ব দেশে ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা থাকা উচিত। ভোট প্রদানের অধিকার একজন বৈধ নাগরিকের সাংবিধানিক নাগরিক অধিকার। অনেকে মন্তব্য করছে নিজেদের দুর্বল জনসমর্থণের কথা বিবেচনা করেই জেএসএস নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।

৪। **বনজ দ্রব্যের অবৈধ পাচার এবং চাঁদা আদায়কারীদের তৎপরতা।** পার্বত্য চট্টগ্রামের কাঠ ও বাঁশ অত্যন্ত উন্নতমানের। এই কাঠ আনা নেয়ার ব্যাপারে বন মন্ত্রনালয়ের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। কিন্তু পার্বত্যাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা সমাধান, জুম চাষের মাধ্যমে বন উজাড়, কাঠের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধি, কিছু সংখ্যক অসাধু কাঠ ব্যবসায়ী ও স্থানীয়

www.pathagar.com

অধিবাসীদের যোগসাজসে প্রায়শই অনেক কাঠ ও বাঁশ অবৈধভাবে পাচার হচ্ছে। আর এর সাথে বৃদ্ধি পাচেছ চাঁদা আদায়কারীদের দৌরাত্ম্য। জনগণের হয়েছে মুশকিল- এখন দিতে হচ্ছে দুটি দলকে চাঁদা। কারণ, চাঁদা আদায়কারীরা বিভিন্ন আসবাবপত্রের দোকান এবং অবৈধ কাঠের চালান হতে বেশ বড় অংকের চাঁদা আদায় করে। ইদানিং চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা আইন শৃংখলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটিয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে।

১। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান অবস্থার সর্বাঙ্গীন প্রেক্ষাপট বিবেচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মহল কর্তৃক নিম্নের বিষয় সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে :

ক। বর্তমান সরকার পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিবদমান দলগুলোকে একই রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও মতাদর্শে নিয়ে আসার জরুরি পন্থা গ্রহণ করতে পারে। সহিংসতার আশ্রয় গ্রহণকারী দল গুলোর বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

খ। সন্ত্রাসী সশস্ত্র দলসমুহের কর্মকান্ড সম্পর্কে সঠিক এবং সময় মতো গোয়েন্দা খবরাখবর সংগ্রহের মাধ্যমে সরকারের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য এই এলাকায় নিয়োজিত গোয়েন্দা সংস্থা গুলোকে আরোও তৎপর ও শক্তিশালী গোয়েন্দা নেট ওয়ার্ক স্থাপন করতে হবে।

গ। বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পুলিশ বাহিনীর আরো সদস্য প্রেরণের মাধ্যমে চোরাচালানী, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অপহরণ ইত্যাদি অনেকাংশে রোধ করা যেতে পারে।

চুক্তিমানেই চুক্তি ভঙ্গের সুযোগ। পার্বত্যচুক্তি মানেই স্থায়ী শান্তি নয়, বরং শান্তির পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ। কেবলমাত্র চুক্তিকে আঁকড়ে থেকে শান্তির সন্ধান করা হবে অদূরদর্শিতা। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত বিবদমান দলের অভিজ্ঞতা হতে জানা যায় স্পর্শকাতর ও অতীত বিবাদের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর চুক্তি যে কোন উত্তেজনা, পরিবর্তন ও বাস্তবতায় থমকে দাঁড়াতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চুক্তি স্বাক্ষর ও ভঙ্গের বহু ইতিহাস খোঁজ নিলে জানা যাবে। কোন চুক্তি বা পরিকল্পনা যেহেতু সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে এবং সর্বমহলের আস্থা অর্জন করতে পারে না-সেহেতু লক্ষ্য রাখতে হবে ত্রুটি ও অসঙ্গতিগুলো ক্রমান্বয়ে দূরীভূত করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তৎপর হওয়া। আর এ জন্য চুক্তিই একমাত্র পদ্ধতি হতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করার জন্য সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘুর মাঝে

www.pathagar.com

সকল দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যের অবসান প্রয়োজন। প্রয়োজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদিবাসী সম্প্রদায়ের সামগ্রিক বিকাশ এবং মূল জাতীয় স্রোতধারার সঙ্গে তাদের কার্যকরী ও অর্থবহ সংযোগ। এভাবেই শত স্রোতের মিলিত উদ্দামে জাতির মূল স্রোত গতিশীল, পুষ্ট ও বিজয়ী হবে; সম্ভব হবে কাংখিত সাফল্যের স্বর্ণালী সৈকতে পৌঁছানো।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ বাঙালী। জনসংখ্যার ১০% হয়তো উপজাতি হবে। তবু তাদের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকার আছে। জাতীয় পরিচয়ে আমরা কেউ বাঙালী, কেউ চাকমা, গারো, মার্মা, মুরং, ত্রিপুরা ইত্যাদি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও ভৌগলিক পরিচয়ে আমাদের সকলের পরিচয় বাংলাদেশী। এই বাংলাদেশী রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ স্থায়ী করার স্বার্থে শান্তিচুক্তি অপরিহার্য ছিল। তাই শুধু নিছক ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে বাস্তব সম্মত শান্তিচুক্তির বিরোধিতা না করে দেশ, জাতি ও শান্তির স্বার্থে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নে দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা করা উচিৎ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশী-বিদেশী চক্রান্তের ফলে একটি বারুদের স্তুপ হয়ে আছে। একটি স্ফূলিঙ্গ থেকে সেখানে বিরাট অগ্নিকান্ড ঘটে যেতে পারে। দেশের শত্রু স্বাধীনতাবিরোধীদের তাই কামনা। এদের সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করতে হবে। শান্তি-প্রক্রিয়াবিরোধী চক্র দেশে আগুন লাগাতে ব্যস্ত। গত কয়েকদিনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনা তাই প্রমাণ করে। এদের আছে অঢেল অর্থ প্রতিপত্তি, অস্ত্র, রশদ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডার। এদের রুখতে হবে। বাংলার জনগণকে সাথে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো উন্নয়ন আর প্রগতির ধারায় শামিল করতে হবে। নোংরা ও অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

www.pathagar.com

স্থানীয় উপজাতি দলগুলোর সংঘাত

"ইদানিং ব্যবসায় খুবই মন্দাভাব যাচ্ছে" হতাশা বিজড়িত এই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেলো খাগড়াছড়ির একটি হোটেলের জনৈক মালিকের কাছ থেকে। তার এই অভিব্যক্তির প্রতিফলন ঘটলো পরবর্তী কথাবার্তার মধ্যদিয়ে "এর জন্য মূলত দায়ী হচ্ছে পার্বত্যাঞ্চলের নাজুক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি।" পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতির বিচারে তিনি বলেন "অপহরণকারী এবং সন্ত্রাসীরা পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যাপী আস্তানা গেরেছে। তাদের ভয়ে দেশী-বিদেশী পর্যটকেরা এখানে আসতে ভয় পাচ্ছে। আমরা কালেভদ্রে গুটিকয়েক অতিথি পেয়ে থাকি। ক্রমশঃ এ সমস্যা প্রকট আকার ধারন করেছে।"

পার্বত্য জনপদ দিনে দিনে অশান্ত হয়ে উঠেছে।পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরবর্তী বর্তমান সময়ে চুক্তির পক্ষ এবং বিপক্ষ সশস্ত্র দলগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক এবং মারমুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অত্র এলাকার শান্তিপ্রিয় জনগণ এজন্য মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) এবং ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টকে (ইউপিডিএফ) দায়ী করছে। সাধারণ জনগণ এই দুটি পরস্পর বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী সশস্ত্র দলের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ফলে সর্বদা ভয়ে তটস্থ থাকে। অশান্ত এ জনপদে জন নিরাপত্তাহীনতা চরম পর্যায়ে পৌছেছে।

বহুকাংখিত পার্বত্য চুক্তি পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। বরং চুক্তির বিপক্ষে এই অভিযোগ আসছে যে, জেএসএস এর নেতা কর্মীরা পার্বত্য চুক্তির নাম ভাংগিয়ে নিজেরাই এই চুক্তির সকল ধরনের সরকারি ও বেসরকারি সুবিধা ভোগ করছে, কিন্তু যাদের জন্য এই চুক্তি সেই সাধারণ জনগণের অধিকাংশই এখনও সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত। জেএসএস নেতা সন্তু লারমাকে পাকা দালানে বাস করে পতাকা উড়িয়ে সরকারি গাড়ি হাকাতে দেখা যায়, কিন্তু তিনিই আবার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের সমালোচনা করেন। এ ধরণের দু মুখো নীতির কারণে জনগনণ তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছে। জনতা ভয় পাচ্ছে এই ভেবে যে, এ ধরনের অনৈতিক কর্মকান্ডে পার্বত্য চট্টগ্রামে আরেক রক্তস্নাত কালো অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে।

পিসিজেএসএস ও ইউপিডিএফ দ্বন্দ্ব

আওয়ামী সরকার এবং জেএসএস এর মধ্যে ০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর কিছুদিন ব্যাপী পার্বত্য এলাকার পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত ছিলো।

www.pathagar.com

কিন্তু পরবর্তীতে তিনজন বিদেশী অপহরণের ঘটনায় সার্বিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়। ২০০৩ সালের মাঝামাঝিতে পুরো অঞ্চলের পরিস্থিতি আবারো উত্তপ্ত ও অশান্ত হয়ে ওঠে। এর ফলশ্রুতিতে বিগত ছয় বছরে জেএসএস এবং ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সংঘর্ষে ৩০০ জনেরও অধিক পাহাড়ী/বাঙালী লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে। খতিয়ানের হিসেবে গত চারমাসে তিনটি পার্বত্য জেলায় ৪০ জনের প্রাণহানি, ৫০ জন লোক অপহৃত এবং ৩০ বার পরস্পর গুলি বিনিময়ের মতো ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় জনগণের ভাষ্য অনুযায়ী, জেএসএস এবং ইউপিডিএফ এর পরস্পর বিরোধী মুখোমুখি অবস্থানই এর জন্য মূলত দায়ী। অনেকে আবার এর দায়ভার পুরোটাই শুধুমাত্র জেএসএস এর উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। কারণ হিসেবে বলতে গেলে, জেএসএস নাকি পার্বত্য চুক্তির বেড়াজালের অন্তরালে চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা, অস্ত্র ও মাদকব্যবসা এবং অন্যান্য অপরাধ সংগঠিত করছে। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিবদমান বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসী চক্রগুলো স্থানীয় বনবিভাগ, ঠিকাদার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমনকি সাধারণ জনগণের কাছ থেকে ভয়ভীতি প্রদর্শণ এবং বলপূর্বক বছরে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে থাকে। চুক্তির পূর্বে তথাকথিত শান্তি বাহিনীও চাঁদা আদায় করেছে। কিন্তু তারা এ কাজ সমাধা করতে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করতো। কিন্তু বর্তমানে আরো অরাজক অবস্থা চলছে। বিভিন্ন সশস্ত্র দলগুলো সাধারণ জনগণের কাছ হতে নির্বিচারে চাঁদা আদায় করছে। ক্ষেত্র বিশেষে চাঁদা প্রদানে অপারগতা প্রদর্শণ করলে অপহরণ ও হত্যার মতো ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। আদায়কৃত এসব চাঁদার টাকা বহুলাংশেই ব্যবহৃত হয় অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয় এবং সন্ত্রাসী দলগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের কাজে।

পার্বত্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় খুব কম সংখ্যক সশস্ত্র বিদ্রোহী তথাকথিত শান্তি বাহিনীর সদস্যই তাদের অস্ত্র সস্ত্র জমা দিয়েছে। এখনোও বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ সন্ত্রাসীদের কাছে মজুদ রয়েছে। জেএসএস বলেছে যে, তারা পার্বত্যাঞ্চলে সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্য একটি সন্ত্রাস বিরোধী কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু অধিকাংশের মতে, এই কমিটি আর কিছুই না, এরা জেএসএস এরই ছত্র ছায়ায় লালিত একটি সংঘবদ্ধ সশস্ত্র দুষ্ট চক্র। জনতা এই চক্রকে জেএসএস এর সশস্ত্র গ্রুপ তথাকথিত শান্তিবাহিনীর নতুন সংস্করণ বলে মনে করছেন।

সাংবাদিক, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজকর্মী তথা সর্বস্তরের জনগণের অভিব্যক্তির ভিত্তিতে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, জেএসএস তাদের কর্মীদেরকে সশস্ত্র প্রশিক্ষনের মাধ্যমে পুনরায় সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত এলাকায় বাঘাইছড়ি রাবার বাগান, রাঙামাটি এবং বরকলের গহীণ অরণ্যে এসব প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড পরিচলিত হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে ২০০ জন জেএসএস কর্মী এ

www.pathagar.com

ধরনের অস্ত্র প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে এবং আরোও ২৫০ জনের একটি দল হরিণা নামক জায়গায় সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে। এসব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জেএসএস কর্মীরা "ব্ল্যাক ডগ" হিসেবে পরিচিত।

সন্ত্রাস বিরোধী কমিটি এবং "ব্ল্যাক ডগ" সদস্যরাই বর্তমানে বড় সন্ত্রাসী এবং চাঁদাবাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের চাঁদা আদায়ের কবল থেকে কেউ রেহাই পাচ্ছে না, এমনকি সাংবাদিকরাও না। মূলতঃ বাঙালীরাই এর প্রধান শিকারে পরিণত হয়েছে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) নামে পরিচিত একটি ছাত্র সংগঠন ও তাদের নেতা ও কর্মীদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামে এমনকি শহরেও জোর করে চাঁদা আদায় করছে। ইউপিডিএফ ও এধরনের চাঁদাবাজি এবং অবৈধ অস্ত্রবাজির সাথে জড়িত রয়েছে। তাদেরও রয়েছে 'ড্রাগন' 'কোবরা' ইত্যাদি নামের সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল।

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের তৎকালীন নেতা প্রসীত খীসা চুক্তির বিরোধীতা প্রদর্শন পূর্বক ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) নামক একটি নতুন দল গঠন করে। পরবর্তীতে ইউপিডিএফ সন্তু লারমাকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যায়িত করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে। কিন্তু এটি তাদেরকে খুব একটা জনপ্রিয়তা দিতে পারেনি। এটি সহজে প্রতীয়মান হয়েছে গত দলীয় নির্বাচন হতে। ইউপিডিএফ উক্ত নির্বাচনে খাগড়াছড়িতে ৩৫ হাজার এবং রাঙামাটিতে ১৫ হাজার ভোট পায়।

ইউপিডিএফ দাবি করছে যে, তারা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। জাতীয়তাবাদ নাকি তাদের আদর্শ। প্রকৃতপক্ষে জেএসএস ও ইউপিডিএফ দু'টি দলই বাম রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছেযে, ইউপিডিএফ মূলতঃ জনগণের কাছ থেকে বলপূর্বক আদায়কৃত চাঁদার টাকা দ্বারা তাদের দলের ব্যয়ভার বহন করে থাকে। তারা ঠিকাদার এবং ব্যবসায়ীদের নিকট হতে জোরপূর্বক ভয়ভীতির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত চাঁদা আদায় করছে। এটাও ধারণা করা যাচ্ছে যে, ইউপিডিএফ বিদেশীদেরকে অপহরণের সাথে জড়িত ছিলো।

পার্বত্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ইউপিডিএফ এর আক্রমনের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সন্তু লারমাসহ জেএসএস এবং প্রধান নেতৃবৃন্দকে তাদের গতিবিধির পরিসীমা জেলা শহরে এবং থানা সদরের ভিতরে সীমাবদ্ধ করতে হয়েছে। তারা অনেক সময় রাতে নিজ বাড়িতে ঘুমায় না প্রতিপক্ষের আক্রমণের ভয়ে। খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবানের উপজাতি জনগণের অভিযোগ হচ্ছে যে, জেএসএস নেতৃবৃন্দ এখন আর তাদের খুব বেশি খোঁজ খবর নিচ্ছেন না। তাদের বিশ্বাস, লারমা তাদের সাথে

www.pathagar.com

বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সকল ধরনের হানাহানি বর্জন করে পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিলো। কিন্তু সকল আশা, আকাঙ্খা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। পার্বত্যবাসী জনগণ সন্তু লারমার অবৈধ ভাবে গড়ে ওঠা বিলাস বহুল জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে, চুক্তির পর তিনি নাকি কোটিপতিতে পরিনত হয়েছে। এই সকল অসন্তোষই পাহাড়ীদেরকে সন্তু লারমার দিক থেকে বিমুখ করেছে এবং পার্বত্য অঞ্চলে ইউপিডিএফ এর জনপ্রিয়তাকে দিনে দিনে বৃদ্ধি করছে। ইউপিডিএফ কর্মীরা তৃর্ণমূল পর্যায় পর্যন্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। ফলশ্রুতিতে জেলাসদর এবং থানা সদরে জেএসএস এর বেশ জনপ্রিয়তা থাকলেও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে জনগণ অধিকাংশই ইউপিডিএফ এর সমর্থন করে থাকে। এ কারণেই জেএসএস মরিয়া হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য ইউপিডিএফ'কে আঘাত করে চলছে আর নিরাপত্তাহীনতায় দিনযাপন করছে নিরীহ জনগন।

ইউপিডিএফ ধীরে ধীরে তাদের প্রসার ঘটাচ্ছে। সম্প্রতি পরিচালিত এক জরিপে জানা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে জেএসএস এর জনপ্রিয়তা শতকরা ৬০ ভাগ এবং ইউপিডিএফ এর শতকরা ৪০ ভাগ। খাগড়াছড়িতেই ইউপিডিএফ এর সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা রয়েছে। অবশ্য তাদেরও তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক কর্মকান্ডের অভাব ও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। নেতৃত্বের সংকট ও সমন্বিত কার্যক্রমের অভাবই হচ্ছে তাদের বর্তমান প্রধান সমস্যা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা ও থানায় জনসংখ্যা ও আধিপত্য ওয়ারী জেএসএস এবং ইউপিডিএফ এর খতিয়ান নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ক্রমিক নং	এলাকা/স্থান	পিসিজেএসএস	ইউপিডিএফ
১।	রাঙামাটি (সদর)	১০০%	০%
২।	বাঘাইছড়ি	৯০%	১০%
৩।	লংগদু	১০০%	০%
৪।	বড়কল	৫০%	৫০%
৫।	নানিয়ারচর	১০%	৯০%
৬।	কাউখালী	০%	১০০%
৭।	জুরাছড়ি	১০০%	০%
৮।	কাপ্তাই	৫০%	বাঙ্গালী অধ্যুষিত
৯।	রাজস্থলী	০%	০%
১০।	বিলাইছড়ি	১০০%	০%
১১।	খাগড়াছড়ি সদর	৫০%	৫০%

www.pathagar.com

১২।	পানছড়ি	৫০%	৫০%
১৩।	দীঘিনালা	২০%	৮০%
১৪।	মাটিরাংগা	৫০%	৫০%
১৫।	রামগড়	৩০%	৭০%
১৬।	মানিকছড়ি	৫০%	৫০%
১৭।	মহালছড়ি	২০%	৮০%
১৮।	লক্ষ্মীছড়ি	০%	১০০%
১৯।	বান্দরবান (সদর)	*	০%
২০।	রোয়াংছড়ি	৯০%	১০%
২১।	রুমা	**	**
২২।	লামা	*	০%
২৩।	থানচি	**	**
২৪।	আলীকদম	*	০%
২৫।	নাইক্ষ্যংছড়ি	০% (বাঙ্গালী অধ্যুষিত)	০% (বাঙ্গালীঅধ্যুষিত)

* চিহ্নিত স্থানে জেএসএস এর কিছুটা সক্রিয়তা রয়েছে। কিন্তু ইউপিডিএফ এর কোন সক্রিয়তা নেই।

** চিহ্নিত স্থানে জেএসএস বা ইউপিডিএফ কারো কোন প্রভাব নেই। উভয়েই এ সমস্ত এলাকায় চাঁদাবাজি করে থাকে। এগুলো বাঙালী প্রভাবিত এলাকা।

ইউ পি ডি এফ এর কর্মকান্ড

রাঙামাটি মূলতঃ জেএসএস এর একটি শক্ত ঘাটি। যার কারণে সেখানে ইউপিডিএফ তাদের কার্যালয় স্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। ইউপিডিএফ এর জেলা কার্যালয় শহর থেকে প্রায় নয় মাইল দুরে কুতুকছড়ি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। কার্যালয়ের দোতলা দালানের উপর দুটি পতাকা উড়তে দেখা যায়। একটি জাতীয় পতাকা এবং অন্যটি দলীয় পতাকা।

জানা যায় যে, ইউপিডিএফ এর দলীয় প্রায় সকল কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ঢাকাতে অবস্থান করছেন এবং তারা ওখান হতেই সকল ধরণের যোগাযোগ বজায় রাখছেন। দলীয় সকল ধরনের নির্দেশাবলী ঢাকা থেকেই পাঠানো হয়। জেএসএস এর বিরোধীতার কারণে তাদের পক্ষে শহরে কার্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছেনা। এমনকি গ্রামেও তাদের উপর হামলা হচ্ছে। জেএসএস কর্মীদের দ্বারা তাদের কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের ভয়ে তারা অফিসে কোন জরুরি কাগজপত্র রাখছে না বলে জানা যায়।

www.pathagar.com

একজন ইউপিডিএফ নেতা বললেন, "ইউপিডিএফ" গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু গণতান্ত্রিক উপায়ে দাবি আদায় না হলে, আমরা বিকল্প পন্থা অবলম্বন করতে কুণ্ঠাবোধ করবো না। তিনি সন্তু লারমার প্রতি ঘৃণা ও তিক্ততা প্রকাশ করলেন এভাবে "সাধারণ মানুষ তাকে পছন্দ করে না। সে চুক্তির নামে জনগণকে ঠকিয়েছে। জেএসএস এর সন্ত্রাসীরা অপহরণ, চাঁদাবাজি, হত্যা ও সন্ত্রাসের সাথে জড়িত। তারা ইউপিডিএফ কর্মীদেরকে যখন যেখানে পাচ্ছে সেখানেই অত্যাচার ও নির্বিচারে খুন করছে।" দাবি দাওয়ার ক্ষেত্রে তারা জেএসএস এর থেকে খুব একটা ভিন্নতর মনোভাব পোষণ করে না। ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছে।

জেএসএস কর্মীদের আক্রমনের ভয়ে ইউপিডিএফ কর্মীরা খুব কমই মুক্তভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। এমনকি ভয়ে রাতের বেলা বাড়িতে থাকতে পারে না। তাদের সকল সময় শংকিত ও লুক্কায়িত অবস্থায় থাকতে হয়। কিন্তু সরেজমিনে অনুধাবনের ক্ষেত্রে প্রেক্ষাপট ভিন্নতর মনে হলো।

মোটামুটি কাছাকাছি দাবি দাওয়া সম্পন্ন এই দুটি দল একত্রীভূত হয়ে গেলেও দলীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। তিনি সরাসরি জবাব দিলেন, "যে কোন লোকই যদি নৈতিক দাবি আদায়ে অটল থাকে, তবে সে নেতা হতে পারে। সন্তু লারমা পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। সে একটা বিশ্বাসঘাতক। তিনি নেতা হয়েও সকল প্রশ্নের বাইরে। সে সকল পার্বত্যবাসীদের জিম্মি করে নিজের ফায়দা হাছিল করছে। সে তো পার্বত্যাঞ্চলের জনগণের একমাত্র নেতা বা মূখ্যপাত্র নয়।"

এখন বিবেচ্য বিষয় হলো যে, বাঙালীদের সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা কি? জনৈক নেতা এ ব্যাপারে তার মতামত ব্যক্ত করলেন এভাবে "এদেশ সকলের। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় বংশোদ্ভূত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এবং বাঙালী উভয়েরই সমঅধিকার রয়েছে। আমরা সহাবস্থানে বিশ্বাসী। বাঙালীদের প্রতি ইউপিডিএফ এর কোন ক্ষোভ নেই।"

জেএসএস ও ইউপিডিএফ এর মাঝে মূল পার্থক্য

জেএসএস এবং ইউপিডিএফ উভয়েই মোটামুটি একই প্রকারের বেশ দাবি দাওয়া সরকারের কাছে উত্থাপন করেছে। এ সবের মধ্যে রয়েছে উপজাতীয় ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা, সেনাক্যাম্প সমূহ অপসারণ, ৫% শিক্ষাকোটা প্রণয়ন, জুম্ম শরণার্থীদের পূনর্বাসন, অপারেশন উত্তরণের আওতাধীন সকল অস্থায়ী সেনাক্যাম্প সমূহ অপসারণ এবং বনায়নের নামে পাহাড়ী জনসাধারণকে হেস্ত নেস্ত না করা।

www.pathagar.com

যেসব ক্ষেত্রে এই দুটি দলের দাবির ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায় তা হলো জেএসএস পার্বত্য চুক্তির সঠিক বাস্তবায়ন চায়। কিন্তু ইউপিডিএফ চায় চুক্তির সাংবিধানিক সমাধান। যাতে করে যে কোন সরকারই ক্ষমতায় আসুক এর সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব। যখন জেএসএস পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেছে, তখন ইউপিডিএফ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেছে। কাজেই জেএসএস এবং ইউপিডিএফ এর দাবি মূলত একই ধাচের। যদিও ইউপিডিএফ বাঙালীদের প্রতি লোকদেখানো সহানুভূতি দেখাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইউপিডিএফ এবং জেএসএস উভয়েই অত্র পার্বত্য জনপদ হতে পূনর্বাসিত বাঙালিদের অপসারণ চায়।

সমঝোতা স্থাপনের প্রচেষ্টা

ইতিপূর্বে জেএসএস এবং ইউপিডিএফ এর মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় এই ওয়াদা পালনে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়েছেন। যদি এই দুটি দলের মধ্যে নীতিগত ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হতো তবে পার্বত্যাঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হতো। এটা শুনা যাচ্ছে যে, মানবেন্দ্র লারমার নিকটাত্মীয়রা ত্রিপুরাতে বসে সেই দুটি দলের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করছে। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে, প্রয়াত এম এন লারমার স্ত্রী পংকজীনি চাকমা ত্রিপুরার একটি মানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমে অত্র এলাকার উপজাতীয় জনগণের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালাচ্ছে।

অপর একটি সূত্রমতে একটি বড় ক্ষমতাশালী দলই বর্তমানে চাচ্ছে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসুক। কারণ তারা মনে করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি বজায় রাখতে পারলে তা তাদের লুকায়িত স্বপ্ন বাস্তবায়নে সাহায্য করবে। যতদিন পর্যন্ত এ পার্বত্য জনপদে অশান্তির বিষবাষ্প উদগীরণ করা যাবে, ততদিন এই এলাকায় অবৈধ মাদক এবং অস্ত্র ব্যবসা জমজমাট থাকবে। ক্ষেত্র বিশেষে জাতীয় এবং বৈদেশিক স্বার্থও এর পিছে জড়িত। তবে এই দল দুটির কর্মী পর্যায়ের অনেকেই সমঝোতা স্থাপন ও মিলে যাবার পক্ষে মত প্রকাশ করে। কিন্তু নেতারা নিজেদের স্বার্থের ও ক্ষমতার কথা চিন্তা করে দু'দল একসাথে হবার ব্যাপারে মোটেও আগ্রহী নয়।

পার্বত্যাঞ্চলে মোট ২৮৩ কি: মি: এলাকাব্যাপী মায়ানমার, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার সাথে অরক্ষিত সীমানা রয়েছে। এই এলাকাটি অস্ত্র এবং মাদক ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন মহল পাহাড়ে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত জিইয়ে রাখার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালাচ্ছে।

জেএসএস এর বর্তমান অবস্থান

পার্বত্যচুক্তির বদৌলতে, জেএসএস এর নেতৃবৃন্দ পার্বত্য জেলা পরিষদ, পৌরসভা,

www.pathagar.com

আঞ্চলিক পরিষদসহ বিভিন্ন স্থানে তাদের আসন গেরে বসেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ হতে নির্ধারিত জনপ্রতিনিধি জনৈক সাংসদকে অপসারণ করে তারা ওখানেও আসন গাড়তে চায়। তাদের গাড়ি-বাড়ি, বেতন ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সকল কিছুই রয়েছে। কিন্তু তারপরও সন্তু লারমা বর্তমানে লাগাতার হরতাল, অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে পরিস্থিতিকে অরোও নাজুক ও অশান্ত করছে। আসলে বাস্তবিক পক্ষে জেএসএস যে কি চায়, তাই বুঝা যাচ্ছে না। ওরা একেক সময় একেক দল ও মতের সাথে হাত মিলাতে চায় ও তাদের উস্কানীতে নাচছে।

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার শংকা হচ্ছে যে, পাহাড়ে পুনরায় বিদেশী অপহরণের ঘটনা ঘটতে পারে। সূত্র মতে, জেএসএস বর্তমানে অধিকহারে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের লোকজনকে সাজেক ও বরকলে এবং ভারতের মিজোরামের খবংয়ে গোপনে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় "চাকমা রাজ্য" প্রতিষ্ঠার তোড়জোড়ের কথাও শুনা যাচ্ছে।

পাহাড়ে বসবাসকারী অধিকাংশের ধারণা অদুর ভবিষ্যতে জেএসএস এবং ইউপিডিএফ একত্রিত হয়ে তাদের দাবি আদায়ে জোরদার কর্মসূচি হাতে নিবে। কিন্তু তখন আবার নেতৃত্ব নিয়ে সমস্যা হবে। কারণ, যুব সম্প্রদায়ের কাছে সন্তু লারমা এবং সমসাময়িক নেতৃবৃন্দের গ্রহনযোগ্যতা অতি নগন্য এবং নাই বললেই চলে। কাজেই তাদের একত্রিত হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীন।

চাকমা রাজার প্রত্যাবর্তন

পার্বত্য জনপদে একটি গুজব শোনা যাচ্ছে যে, পুনরায় স্বায়ত্বশাসক চাকমা রাজা ত্রিদীপ রায়ের প্রত্যাবর্তন হতে পারে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময়, ত্রিদীপ রায় দেশ ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যান। তিনি সেখানে এই দীর্ঘ সময় পাকিস্তানে বসে থেকেও এদেশে তার পরিবার বর্গ ও চাকমা সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন। এখন বিবেচ্য বিষয় এতো বছর ব্যাপী চাকমা রাজা অত্র অঞ্চলে কি এমন প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন যে, তিনি ফিরে আসলে আগের মতো তাঁর পূর্বে ন্যায় গ্রহণযোগ্যতা থাকবে।

স্থানীয় জনগণ রাজা ত্রিদীপ রায়, তার ছেলে দেবাশীষ রায় এবং তার পরিবারবর্গকে যথেষ্ট সম্মান করে থাকে। কিন্তু কালের বিবর্তনে অনেক সময় গত হয়ে গেছে এবং এর বদৌলতে বর্তমানে যুব সমাজের একটি বিরাট অংশই রাজা ত্রিদীপ রায়কে চিনেনা। রাজা দেবাশীষ রায় যথেষ্ট শিক্ষিত এবং জনগণের সম্মানের পাত্র। তার ঐতিহ্যগত জনপ্রিয়তা ছাড়া পাহাড়ী রাজনৈতিক অঙ্গণে তার খুব একটা প্রভাব প্রতিপত্তি নেই। স্থানীয় অনেকে মন্তব্য করেন যে, রাজা ত্রিদীপ রায় এখনোও প্রবীন

www.pathagar.com

সমাজের কাছে বেশ জনপ্রিয় কিন্তু যুব সম্প্রদায়ে তার গ্রহণযোগ্যতা কম। তবে রাজা যদি পুনরায় ফিরে আসে, তবে তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে না।

রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা

জনৈক রাজনৈতিক নেতা বললেন, "জাতীয় পর্যায়ে, কোন নেতাই পার্বত্যবাসীর সমস্যা নিরসনের ব্যাপারে আন্তরিক নয়। এ ব্যাপারে তারা এক এবং অভিন্ন। মন্ত্রী এবং নেতারা এখানে আসেন, এলাকাবাসীর সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করেন। তারপর আবার চলেযান। মাত্র স্বল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে এসব সমস্যা সমাধান সম্ভব? তাঁর ভাষ্য মতে, আমরা অনেকে এলাকার শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অনেক আগে থেকে সংগ্রাম করছি। আমরা এলাকায় মসজিদ, মাদ্রাসা এবং বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে এলাকার জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করতে চাই। কারণ, এর মাধ্যমেই উপজাতিদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা বৈষম্য ও বিভেদ নিরসন করা সম্ভব।"

জনৈক সাংবাদিক পার্বত্য সমস্যা সম্পর্কে বললেন "সরকারকে আরো দৃঢ় হতে হবে। জেএসএস এবং ইউপিডিএফ এর অবৈধ অস্ত্রের মহড়াই বর্তমানে মূলতঃ পাহাড়ে অশান্তির সৃষ্টি করেছে। এসব অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের মাধ্যমেই শুধুমাত্র এই অশান্ত জনপদে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যদি সরকার আরো কঠিন সিদ্ধান্তগ্রহণে সম্ভব না হন, তবে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আওতার বাইরে চলে যাবে। সশস্ত্র ও দেশদ্রোহী সন্ত্রাসীদের মোটেই ছাড় দেয়া উচিত হবে না।"

তিনি পার্বত্য চুক্তির সমালোচনা করে বললেন "আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলো ঠিকই কিন্তু সন্তু লারমা ও তার কয়েকজন সহকর্মী ব্যতীত পাহাড়ের অন্যান্য জনগণ খুব একটা লাভবান হয়নি। এ চুক্তির ফলে জেএসএস এর নেতাকর্মীরা যথেষ্ট লাভবান হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য উপজাতি জনগণ ও বাঙ্গালীদেরকে ঠিকই বৈষম্য ও অবহেলা করা হয়েছে"।

অপর এক সাংবাদিক প্রশ্ন তুললেন "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মনি স্বপন দেওয়ান সরকারি দলের হলেও তিনি নিজেইতো সন্তু লারমার মতাবলম্বী, কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে, তিনি তার গুরুকে কখনোই অসন্তষ্ট করবেন না। যার প্রমাণ ইতোমধ্যেই বিভিন্ন কর্মকান্ডে প্রতিফলিত হয়েছে। জেএসএস দাবি করছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রীর স্থলে মন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে মনিস্বপন দেওয়ান এর নাম এসে যায়। এসমস্ত কারণেই তিনি কিছুটা সন্তু লারমার মতাবলম্বী"। তবে এ ব্যাপারে তথাকথিত শান্তিবাহিনীর একজন প্রাক্তন সদস্য মেজর জয়েস (মনিস্বপন) এর উপর কতটা আস্থা রাখবেন তা বিচার করার সময় এসেছে।

www.pathagar.com

দেশের মূলধারার প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াত ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনেকাংশই জেএসএস এবং ইউপিডিএফ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। স্থানীয় একজন রাজনৈতিক নেতার মতে জেএসএস নেতা সন্তু লারমার ব্যক্তি স্বার্থপরতার নজির জনগণের কাছে উম্মোচিত হয়ে গিয়েছে এবং তার জনপ্রিয়তা নিম্নগামী হতে শুরু হয়েছে। জনগণ বুঝতে পেরেছে যে, সন্তু লারমা তাদের জন্য কিছুই করেনি এবং করতে পারবেও না কারণ তার সেই দূরদর্শীতা, প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা নেই বলে সকলের ধারণা। সন্তুর নেতৃত্ব এখন প্রসীতের জনপ্রিয়তার মুখে চ্যালেঞ্জের সম্মূখীন। তাঁর আঞ্চলিক রাজনীতির হাঁকডাক জাতীয় পর্যায়ে পৌছবেনা। তিনি সহিংসতার রাজনীতি শুরু করেছেন।

আওয়ামী লীগ নেতা এবং প্রাক্তন মন্ত্রী দীপংকর তালুকদার বললেন, "শুধুমাত্র ওয়াদুদ ভূঁইয়ার অপসারণ এবং পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রী নিয়োগের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য দরকার পার্বত্যচুক্তির সঠিক বাস্তবায়ন"। চুক্তি স্বাক্ষরকারী দল আওয়ামী লীগের চুক্তির সঠিক বাস্তবায়নে অপারগতার ব্যাপারে দীপংকর তালুকদার বলেন "চুক্তি স্বাক্ষরের পর আমাদের হাতে মাত্র আড়াই বছর সময় ছিলো, আমরা এর বাস্তবায়নে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি"।

তিনি মনে করেন যে, পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেএসএস এবং ইউপিডি-এফকে একত্রীভূত করতে হবে। এই দুটি দল একত্রিত হলে পার্বত্যাঞ্চলের অশান্তি ও সন্ত্রাস বহুলাংশে লাঘব হবে। ইউএনডিপি'র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডেও অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে জেএসএস। দাপ্তরিকভাবে ইউএনডিপি পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত করার জন্য তৎপর থাকলেও জেএসএস এর ছয় দফা দাবি আদায়ের সংগ্রামে তাদের কর্মকান্ড অনেকাংশেই থমকে দাঁড়িয়েছে।

বিদেশী অর্থায়নের আওতাধীন উন্নয়নকর্মকান্ড গুলো গত ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৩জন বিদেশী অপহরণের পর অনেকাংশে থমকে দাঁড়িয়েছিল। তখন বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনডিপি যৌথভাবে অত্র এলাকার উন্নয়নে এক ঝুঁকি মূল্যায়ন জরিপ পরিচালনা করে। উক্ত জরিপে প্রতীয়মান হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ অঞ্চলেই উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা নিরাপদ। তখন জেএসএস এবং ইউপিডিএফ কে অত্র অঞ্চলের সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজি রোধের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত জেএসএস নেতা সন্তু লারমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। যার প্রেক্ষিতে জেএসএস গত ১৪ জুন ২০০৩ সালে এক ছয় দফা দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডকে স্থিমিত করে দেয়। এ দাবির দফাগুলো নিম্নরূপ:

১। সকল ইউএনডিপি কর্মকান্ডকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আওতায় নিতে হবে।

২। শুধুমাত্র উপজাতীয় এবং স্থায়ী বাঙ্গালী বাসিন্দারাই এই চুক্তির দ্বারা উপকৃত হবে।

www.pathagar.com

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কাউন্সিল ও জেলা পরিষদকে সকল ধরণের উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৪। প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে, উপজাতীয় এবং স্থায়ী বাঙালী বাসিন্দাদের অনুমোদন নিতে হবে।

৫। যৌথভাবে গড়ে ওঠা ব্যবস্থাপনা ইউনিট বিলুপ্ত করতে হবে।

৬। যৌথভাবে পরিচালিত ঝুঁকি পর্যালোচনা মিশন এর বিতর্কিত পয়েন্ট সমূহ বাদ দিতে হবে।

এসমস্ত দাবি উত্থাপনের পর জাতিসংঘ সদর দপ্তরের তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল অত্র এলাকা পরিদর্শনে আসেন। মজার ব্যাপার হলো, রাঙামাটিতে ইউএনডিপি'র প্রধান কার্যালয় রাজা দেবাশীষ রায়ের বোনের বাসভবনে অবস্থিত। তার আত্মীয় কুমার নন্দিতা রায় উক্ত দপ্তরে একটি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। ০৯ জানুয়ারি ২০০৪ হতে শুরু করে ০৪ দিন ব্যাপী উক্ত প্রতিনিধি দলের সফরটি মূলত সন্তু লারমার তৎপরতায়ই অনুষ্ঠিত হয়। তারা সন্তু লারমা কর্তৃক প্রদত্ত তালিকাভূক্ত জনগনের সাথে কেবল কথা বলেন। তারা তাদের সফরের প্রাথমিক পর্যায়ে অন্যান্য স্থানীয় রাজনীতিবিদ এবং বাঙ্গালী জনগণের সাথে কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন না।

স্থানীয় জনৈক রাজনৈতিক নেতা বলেন, "জাতিসংঘ প্রতিনিধি দল শুধুমাত্র সন্তু লারমার তালিকাভূক্তদের সাথে কথা বলেছে, কিন্তু আমরা তাদেরকে ডেকেছি এবং বুঝিয়ে দিয়েছি- কিভাবে জেএসএস এবং ইউপিডিএফ সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিও অপহরণ চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা বলেছি যে, বিদেশীদের অপহরণের সাথে এরা জড়িত ছিলো। তাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিলো পার্বত্যবাসী বাঙালীরা। আমরা তাদেরকে অনুরোধ করেছি যাতে উন্নয়ন কর্মকান্ড নিরপেক্ষ প্রশাসনের মাধ্যমে হয়।"

সফরের শেষে জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের প্রধান সারাহ এম টিমসন বলেন, "তারা ফিরে যাওয়ার পর এ বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করবেন। তিনি বললেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একদিনে সমাধান করা সম্ভব হবেনা এবং জনগণকে তাদের নিজেদের মধ্যে দাবি দাওয়ার ব্যাপারে সমঝোতার মাধ্যমে এর সমাধান করতে হবে"। প্রতিনিধি দল জানালেন, "অতি শীঘ্রই ইউ এনডিপি এর উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু হবে। পাহাড়ী বাঙালী আপামর জনসাধারণ ইউএনডিপি এর উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য উৎসূক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অত্র অঞ্চলের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের অংশ হিসেবে এই উন্নয়ন কাজে আনুমানিক খরচ হবে ২ মিলিয়ন হতে ৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।"

অসামঞ্জস্য

জনৈক স্থানীয় নেতা বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পার্বত্যবাসী বাঙালী জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, অত্র এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে ভূমি ও

www.pathagar.com

বাসস্থানের সুবিধা হতে বঞ্চিত করার মাধ্যমে নাগরিক অধিকার হতে বঞ্চিত করেছে। এটি পার্বত্যবাসী বাঙালীদেরকে কর্মসংস্থান ও অন্যান্য সুবিধা হতে বঞ্চিত করেছে। এই চুক্তি তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে। বাঙালীরা পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রনালয়, রিজিওনাল কাউন্সিল, জেলা পরিষদ, ল্যান্ড কমিশন, টাস্ক ফোর্স ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপরের দিকের পদগুলোতে অধিষ্ঠিত হতে পারছেন না।"

একজন সাংবাদিক বলেন, "উপজাতি জনগোষ্ঠীকে সরকারি বৃত্তি পরীক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, ফেলোশীপ, সরকারি বেসরকারি চাকুরি এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেয়া হয় ও বিশেষ কোটার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ পর্যন্ত ত্রিপুরা হতে ফিরে আসা ৭০০ জন শরণার্থীকে পুলিশ বাহিনীতে চাকুরি দেয়া হয়েছে। বিগত সময়ে যারা শান্তি বাহিনীর সদস্য হিসেবে অস্ত্র জমা দিয়েছে তাদেরকে বিভিন্ন এনজিও'তে চাকুরি দেয়া হয়েছে। কিন্তু পার্বত্যবাসী বাঙালীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং মেধা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে কোথাও কোন সুযোগ দেয়া হচ্ছে না।"

পার্বত্যবাসী বাঙালীদের ব্যাংক লোনের জন্য ধার্যকৃত সুদের হার উচ্চ। পার্বত্যবাসী বাঙালীদেরকে আয়কর প্রদান করতে হয় কিন্তু পাহাড়ীদের তা প্রদান করতে হয় না। ইদানিং কালে ইউএনডিপি এর ২ কোটি টাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় শুধুমাত্র পাহাড়ীদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, বাঙালীদেরকে নয়। এই বৈষম্যমূলক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ ও কর্মকান্ড পার্বত্যবাসী বাঙালী এমনকি চাকমা ব্যতীত অন্যান্য উপজাতিদের মাঝে উৎকণ্ঠা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিচার করে দেখা গেছে, যখনই কোন বিদেশী সংস্থা বা এনজিও পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রমে আসে, তখনই তাদের লক্ষ্য থাকে উপজাতীয় বিশেষ করে চাকমা সম্প্রদায়ের প্রতি। পার্বত্যবাসী বাঙালীদের প্রতি তাদের কোন সহানুভূতি কাজ করে না। তারা উপজাতিদের সাধারণ শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার্থে দেশের বাইরে প্রেরণ এবং বিশ্বব্যাপী উপজাতিদের পরিচিতির ব্যাপারে ব্যাপক তৎপরতা দেখিয়ে আসছে। তারা অতি সহজেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ করতে পারছে। দেশের ভিতরেও কতিপয় তথাকথিত বুদ্ধিজীবি চক্র, সাংবাদিক, এনজিও এবং বেসামরিক কর্মকর্তা তাদের এ কাজে ইন্ধন যোগাচ্ছে। পার্বত্যাঞ্চলের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড যাতে নিরপেক্ষতা, সামঞ্জস্যতা, বৈষম্যহীনতা বজায় থাকে সে ব্যাপারে বেসামরিক প্রশাসনকে তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করা উচিত।

অপরপক্ষে, বাঙালী জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বের মধ্যে কিছুটা শূন্যতা রয়েছে। তারা মূলতঃ আর্থিক স্বল্পতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে দলীয় নেতৃত্ব জোরদার করতে পারছে না। উন্নয়ন সংস্থাগুলো তাদেরকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর উপজাতিরা তাদের বিরোধিতা করে। কাজেই বাঙ্গালীরা মোটামুটি কোনঠাসা অবস্থায় আছে।

www.pathagar.com

সন্ত্রাসীদের কর্মকান্ডের দরুন উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে,
দুটি রাস্তার করুণ অবস্থা দেখা যাচ্ছে।

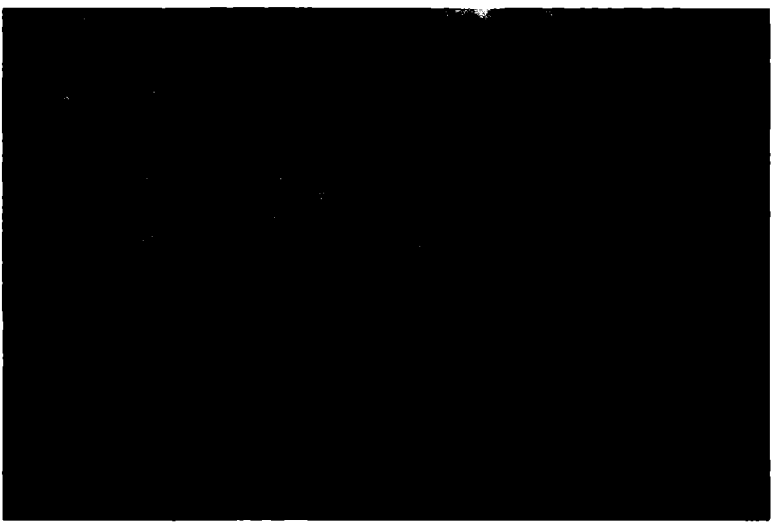

www.pathagar.com

উপজাতি সন্ত্রাসীদের পোড়ানো ঘর-বাড়ীর দৃশ্য।

www.pathagar.com

সন্তু লারমা এবং তার দল জেএসএস দাবি করছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর চেয়ারম্যান এম পি ওয়াদুদ ভূঁইয়ার মতো উচ্চপদ সমূহ হতে বাঙালীদেরকে অপসারণ করতে হবে। এই দাবি নিতান্তই অসাংবিধানিক ও অবৈধ এবং তা বেশি বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে যায়।

পার্বত্যবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে একতার অভাব

উপজাতি আপামর জনগণ তাদের যে কোন উন্নয়নের স্বার্থে মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ থাকে। কিন্তু বাঙালী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই একত্ববোধের অভাব দারুনভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কেন? এ প্রসঙ্গে জনৈক সাংবাদিক জানালেন যে, বাঙালীরা নিজেদেরকে নিম্নোক্তভাবে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে থাকে। যেমনঃ

১। সাধারণ বাঙালী জনগণ যারা অস্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করছে।

২। জন্মগতভাবে চট্টগ্রামের অধিবাসী বাঙালী যারা সেখানে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছে। বাস্তবিক পক্ষে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাঙালী জনগোষ্ঠীর শতকরা ৭০ ভাগই চট্টগ্রামের অধিবাসী।

৩। সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হতে আসা বাঙালীরা, যারা ব্যবসায়ীক স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলেছে।

৪। বাঙালী জনগোষ্ঠী যারা দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে সেখানে বাসস্থান গড়েছে।

৫। পূনর্বাসিত বাঙালী। এরা অন্যান্য বাঙালীদের সাথে খুব একটা মিশেনা এবং দারিদ্র পীড়িত। জেএসএস দাবি করেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ৪ লক্ষ পূনর্বাসিত বাঙালী বাস করছে, কিন্তু তা সত্য নয়। এদের মধ্যে অধিকাংশই এই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে এবং অনেকে দারিদ্রতা ও পীড়ায় মারা গেছে। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ১ লক্ষ পূনর্বাসিত বাঙালী বসবাস করছে অনেক সমস্যাক্লিষ্ট অবস্থায়।

এখানকার বাঙালীরা মূলতঃ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ব্যস্ত রয়েছে। তারা গোটা বাঙালী জনগোষ্ঠীর স্বার্থের ব্যাপারে উদাসীন। এ সমস্ত কারনে তারা অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের তুলনায় যে কোন ব্যাপারে পিছনে পড়ে রয়েছে। বাংলাদেশীদের নেতৃত্ব সমস্যা একটি বড় সমস্যা। তারা কখনোই ভালো নেতৃত্ব গড়ে তোলার মতো পরিবেশ পরিস্থিতি পায়না। এটাই পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের সর্বাঙ্গীণ এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা। ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে একজন নেতার নেতৃত্বে সমন্বিত আন্দোলন পরিচালনা করতে বারবার থমকে দাঁড়াচ্ছে।

www.pathagar.com

পার্বত্য জনপদ রক্তাক্ত কেন?

'পার্বত্য চট্টগ্রাম' নাম শুনলেই অনেকে আঁৎকে ওঠেন। অনেকের কৌতুহল বেড়ে যায়। আসলে পার্বত্য চট্টগ্রাম কি? ওখানকার সমস্যা কি ধরনের? জীবনাচরণ, বসতি, সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনীতি, সংস্কৃতি এসব নিয়ে আলোচনা হতে পারে। স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে আজ অবধি পার্বত্য চট্টগ্রামে হত্যা, খুন, নির্যাতন চলছে। নিরাপরাধ পার্বত্য নাগরিককে প্রাণ দিতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পার্বত্য উপজাতীয় সন্ত্রাসীদল গুলোর পক্ষ থেকেই এই হত্যাকান্ড চলছে। এখানকার মানুষের দীর্ঘকালের অবহেলা, বঞ্চনা, অধিকারের কথা তুলে বিদ্রোহী উপজাতীয়রা সশস্ত্র অন্দোলন শুরু করেছিল। এই সশস্ত্র বিদ্রোহীরা মানুষ হত্যাকে এক সময় তাদের রাজনীতির মূখ্য দিক হিসেবে ধরে নিয়েছিল।

এককালের সংগ্রামী আদর্শের দাবি তুলে সশস্ত্র আন্দোলনকারী জেএসএস-এর সশস্ত্র সংগঠন তথাকথিত শান্তিবাহিনী পার্বত্য জনপদ রক্তাক্ত করে তুলেছিল। বিদেশী মদদ পুষ্ট এই সন্ত্রাসীরা পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালীদের ওপর ক্ষুব্ধ। হত্যা করেছে অনেক বাঙালীদের। শুধু বাঙালীই নয় বর্তমানে চুক্তির পরও তারা এমনকি উপজাতীয়দেরও হত্যা করছে। যারা সন্ত্রাস বিরোধী শান্তিপ্রিয় তাদের ভাগ্যেও এই বুলেটের নির্মম আঘাত ছুটে আসে। নিরস্ত্র এই পার্বত্যবাসীরা আজ অসহায়, নিরুপায়। কেন এই সন্ত্রাস? এ বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করতে হলে প্রথমেই সংক্ষেপে পার্বত্য প্রেক্ষাপট তুলে ধরার প্রয়োজন আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য ভূমি। এখানে মূলত ১৩টি উপজাতি সম্প্রদায় চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তংচইঙ্গ্যা, ম্রো, বম, পাংখো, লুসাই, খেয়াং খুমী, চাক, এছাড়াও রিয়াং, উসুই এবং জাতি সত্বার নেপালী, অহমিয়া ও সাঁওতালীরা বসবাস করে। এক উপজাতির ভাষার সংগে অন্য উপজাতীর অমিল রয়েছে। ধর্মের দিক থেকে প্রায় উপজাতির পৃথক পৃথক স্বত্বা রয়েছে। এদের স্বতন্ত্র কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রয়েছে।

প্রেক্ষাপট

পার্বত্য চট্টগ্রাম গহীন বনাঞ্চলে ঘেরা মানব শুন্য চট্টগ্রামের অনাবাদী পাহাড়ী এলাকা ছিল। জীবিকার প্রয়োজনে এই অঞ্চলে ধীরে ধীরে মানব বসতি গড়ে ওঠেছে। এখানকার পার্বত্য জনগোষ্ঠীর জন্যে ব্রিটিশ শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল ১৯০০ সাল জারি করা হয়। এই ম্যানুয়েলের ভিত্তিতে পার্বত্যবাসী উপজাতীয়দের

www.pathagar.com

অস্তিত্ব ও অধিকার সংরক্ষিত বলে মহল বিশেষ মনে করে। কিন্তু মূলতঃ এই ম্যানুয়েলের মাধ্যমে সভ্যতার আলো থেকে উপজাতীয়দের বিচ্ছিন্ন রাখা হয়।

ব্রিটিশ সরকার যখন পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসনভার পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছিল, তখন পার্বত্য মানুষের গ্রুপ ভিত্তিক নেতৃত্বকে প্রাধান্য দিয়ে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করে তিনজন সার্কেল চীফের মাধ্যমে অধীনস্ত ও করভূক্ত করে। সার্কেলগুলো হচ্ছেঃ চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল, মং সার্কেল। সার্কেলের অধিবাসীদের ভাষাগত জটিলতার কারণে যখন সংযোগ রক্ষা করা তথা রাজস্ব আদায় করা সম্ভব ছিলনা, তখন প্রতিটি সার্কেলের মৌজা প্রধান হেডম্যান এবং পাড়া প্রধান কার্বারী নিযুক্ত করে। এই নিযুক্তি কৌশলের মাঝ দিয়ে ব্রিটিশ সরকার তাদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল। এই সার্কেলভূক্ত নেতৃবৃন্দ কার্পাস তুলা কর হিসেবে দিয়েই করভূক্ত ছিল।

ভারত বিভক্তির সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন দিকে থাকবে- পাকিস্তান না ভারতের দিকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কতিপয় উপজাতীয় নেতা থাকতে চেয়েছিলেন ভারতের দিকে। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে রেড ক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তৎকালীন পাকিস্তানের দিকে জুড়ে দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষুব্ধ উপজাতীয় নেতারা ভারতীয় পতাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে উত্তোলন করেছিল। পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্তি ভারত পন্থী নেতারা মেনে নিতে পারেনি। মূলতঃ বিদ্রোহ প্রকাশ্যে রূপ নেয় তখনি, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট থেকে। তবে অবশ্য বান্দরবান অঞ্চলের অধিবাসীরা তখন বার্মার পতাকা উড্ডীন রেখেছিল।

পাকিস্তান জন্মের পর থেকেই এই উপজাতীয়দের সোজাভাবে মেনে নেয়নি। কড়াকড়ি আরো বৃদ্ধি করে। সেসময় প্রশাসনিক কড়া নির্দেশ জারি হলে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী অত্যাচারীত হবারও খবর পাওয়া যায়। বিদ্রোহীদের অনেকেই আশ্রয় নেয় ভারতে। ভারতপন্থী এই নেতারা ধীরে ধীরে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের সরকার বিরোধী করে তুলে। প্রথম থেকেই গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্তরায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল ১৯০০ সাল সংশোধনের ব্যাপারে উপজাতীয় জনগণের দাবি ছিল জোরালো। পাকিস্তান সরকারও এই অবস্থার মুখোমুখি হয়। শুরুতে পাকিস্তান সরকার ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও পরে অবশ্য উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ নজর দিতে শুরু করে। তবে উপজাতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

জলমগ্ন ভূমি মালিকদের অবস্থা

পাকিস্তান সরকার ষাটের দশকে বর্তমান রাঙামাটি জেলার কাপ্তাইয়ে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মানের জন্যে কর্ণফুলী নদীর গতিপথে বাঁধ দিলে বিস্তীর্ণ আবাদী জমি জলমগ্ন হয়ে যায়। হাজার হাজার উপজাতীয় ও বাঙালী পরিবার জমি হারায়। হাজার হাজার মানুষ ভূমিহীন হয়ে পড়ে। কাপ্তাই হ্রদের কারণে উচ্ছেদকৃত জলমগ্ন

www.pathagar.com

ভূমি মালিক, ভূমি হারা ক্ষতিগ্রস্ত পার্বত্যবাসীদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা থাকলেও প্রকৃত ক্ষতিপূরণ পায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। বিকল্প জমি দেয়া হলেও অনেকে জমিও পায়নি। আবাদী জমি, বসতভিটা হারিয়ে অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ভয়াবহ সংকটে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে বরাদ্দকৃত পুরো ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি কেন ? এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কারণ উদঘাটিত হয়নি। ক্ষতিপূরণ দেয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কারসাজিও সে সময় ছিল এমন অভিযোগ রয়েছে।

ভূমি হারা এই মানুষেরা, বিশেষ করে উপজাতীয়রা হয়ে ওঠে ক্ষুব্ধ। প্রতিবাদ মুখর। সরাসরি বিদ্রোহে পাকিস্তান সরকার বিপাকে পড়েছিল। পরে অবশ্য তাদের পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা গ্রহণ সহ সার্কেল প্রধানদের মাধ্যমে একটা সমঝোতায় আসা হয়। তখন থেকেই পার্বত্য উপজাতীয়রা সরকারের সদিচ্ছার প্রতি হয়ে পড়ে সন্দিহান। যদিও তাদের মাঝ থেকে চন্দ্রঘোনা পেপার মিল, রেয়ন মিলে অনেককে চাকরি দেয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল কিন্তু দেয়া হয়নি আশানুরূপ। চাপা ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে মনে। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রায় বিশ হাজার উপজাতীয় ভারতপন্থী উপজাতীয় নেতাদের প্রচারে মোহগ্রস্থ হয়ে আশ্রয় নেয় অরুণাচলে। ভারতপন্থী ঐসব উপজাতীয় নেতারা ভারতে নাগরিকত্ব পেলেও অরুণাচলে আশ্রিতরা আজো নাগরিকত্ব পায়নি। কাপ্তাই হ্রদ শুধু ক্ষতির কারণই নয়। বরং উপকারে এসেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। মৎস সম্পদের উন্নয়ন হচ্ছে। বিকল্প জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব রয়েছে।

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল ১৯০০ সাল অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছেন-জেলা প্রশাসক। জমাজমির মালিকও তিনি। উপজাতীয়রা শুধু ভূমির নামমাত্র মালিকানা পেতেন। মূলতঃ ভোগদখলই ছিল ভূমির অধিকার। সে কারণে সচেতন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই আইনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে। আবার একই ম্যানুয়েল অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলে সমতল ভূমির কেউ স্থায়ীভাবে বসবাস করা নিষিদ্ধ ছিল। পার্বত্য উপজাতীয়দের স্বার্থ বিরোধী বলে অভিযোগ পাওয়া গেলে জেলা প্রশাসক কর্তৃক অভিযুক্ত বাসিন্দাকে জেলা থেকে বের করে দেয়ার বিধান ছিল। কিন্তু জনৈক ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্ট তৎকালীন পাকিস্তান আমলে এই বিধানের উল্লেখিত ধারা বাতিল করে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই বিধানের মাধ্যমে সাংবিধানিকভাবে সংরক্ষিত নাগরিক অধিকার খর্ব হতো। তবে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল ১৯০০ সাল সংশোধিত রুপ পেলেও কার্যকর হয়নি।

অর্থনীতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের অর্থনীতি জুম্ম চাষ নির্ভর ছিল। জুম্ম চাষ হচ্ছে পাহাড়ের ঢালুতে জঙ্গল পরিস্কার করে ফসল উৎপাদন। এ উৎপাদন ব্যবস্থায়

www.pathagar.com

সুফলের চেয়ে কুফল বেশি। পাহাড়ী জমিতে জুম্ম চাষের ফলে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায়। ফলন ভালো হয় না। এই অনুন্নত উৎপাদন ব্যবস্থায় বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। দক্ষিণ পূর্ব এশীয় বিভিন্ন দেশে এই প্রাচীন চাষ পদ্ধতি থাকলেও বর্তমানে তা পরিবর্তিত হয়েছে। তবে এখন সব পাহাড়ীরাই জুম্মচাষ নির্ভর নয়। অনেকে এখন বিকল্প আয়ের মাধ্যমে জীবন ধারণের চিন্তা করছে। ব্যবসা বাণিজ্য চাকুরির দিকে মন দিয়েছে। শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধিত হবার কারণেই এই মনোভাব বলা যেতে পারে।

সশস্ত্র সন্ত্রাসের কারণ

উপজাতীয়দের অসন্তোষের কারণ আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রচলিত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'সামন্ত প্রথা নিপাত যাক' এমন দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিদ্রোহ শুরু হয়। পরে অবশ্য সরকার বিরোধী আন্দোলনে মোড় নেয়। ব্রিটিশ শাসনামলের সময় থেকেই এই বিদ্রোহ। পাকিস্তান আমলে বিরোধীতা কম ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকেই এ বিদ্রোহ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। স্বাধীনতা যুদ্ধে উপজাতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে সরকারি সিদ্ধান্ত উপজাতীয়দের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবর রহমানের সরকারের কাছে চার দফা দাবি পেশ করেন। কিন্তু শেখ মুজিবর সরকার তা প্রত্যাখ্যান করেন। তৎকালীন সরকারের আবেগ প্রবণ সিদ্ধান্ত সে সময় যেমন ঐক্যে চিড় ধরায়। অন্যদিকে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকেও ধৈর্য্য ধারণ করা উচিত ছিল। কেননা সদ্য স্বাধীন একটি দেশে চাওয়া পাওয়ার ক্ষেত্রে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দও ধৈর্য্য ধারণ করতে পারতেন।

১৯৭৪ সালে রাঙ্গামাটিতে এক জনসভায় ভাষণ দানকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উপজাতীয়দের বৃহত্তর বাঙালী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিশে যেতে পরামর্শ দেন। শেখ সাহেবের এ আহবান ছিল উপজাতীয়দের এতদিন যে লাঞ্ছনা বঞ্চনার সম্মুখীন হচ্ছিল, তার অবসান করার জন্যে। কিন্তু কতিপয় উপজাতীয় নেতা শেখ মুজিবের এ আহবানকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। বরং অপব্যাখ্যা করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিদ্রোহের পেছনে অনেকে এ দুটি কারণকেই মুখ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। কাপ্তাই হ্রদ সৃষ্টির কারণকেই ইস্যু করা হয়েছে। সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হবার প্রায় অর্ধ যুগ পরে তৎকালীন সরকার দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ঘনত্বের কথা বিবেচনা করে দেশের এক দশমাংশ পার্বত্য অঞ্চলে ঘনত্বের ভারসাম্য রক্ষার্থে ছিন্নমুল বাঙালীদের পুনর্বাসন করে। বিদ্রোহীরা পরবর্তীতে এটাকেও ইস্যু হিসেবে যুক্ত করে নেয়। কারণ যাই হোক পার্বত্য চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহের কোন অবকাশ নেই। অনেকে বলে থাকেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হওয়ায় জনসংহতি সমিতি সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করার আগে জনসংহতি

www.pathagar.com

সমিতি কখনো নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করে নাই। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিদ্রোহের কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ নেই।

বিভিন্ন সরকারের পদক্ষেপ

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রতিটি সরকার পার্বত্যঅঞ্চলে উদ্ভূত এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন সরকারের এই পদক্ষেপ সমূহের অবশ্যই মূল্য রয়েছে। শেখ মুজিব সরকারের আমলে বিদ্রোহীদের কাছ থেকে সময় পাওয়া না গেলেও সরকার অবশ্য পার্বত্য অঞ্চলের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল। জিয়া সরকার সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। উপজাতীয়দের জন্য নানা সুযোগ সুবিধাও তাঁর আমলেই প্রবর্তিত হয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে উপজাতীয়দের জন্য কোটা সংরক্ষণ করা হয়। ব্যবসা চাকুরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। উপজাতীয়দের কৃষ্টি সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সংরক্ষণের প্রতিও সরকার আন্তরিক ছিল। জিয়া সরকারের পর এরশাদ সরকার পার্বত্য অঞ্চলের জন্যে পূর্বেকার অনুসৃত নীতি ধরে রেখেছিল। আকাংখিত শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পার্বত্য পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে এখানে ট্রাইবেল কনভেনশন গঠন করেন। এই কনভেনশন পরিস্থিতির উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল। পরবর্তীতে শুরু হয় শান্তি আলোচনা প্রক্রিয়া।

এরশাদ সরকার পার্বত্য সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে স্বশাসিত পরিষদ স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের ছয় দফা বৈঠকের পর সংলাপের মাধ্যমে কোন স্থায়ী সমাধান আসেনি। তথাকথিত শান্তি বাহিনী পাঁচদফা দাবিতে অনড় থাকায় সংলাপ ফলপ্রসু হয়নি। জেএসএস সংবিধানের পরিপন্থী অবাস্তব দাবি উত্থাপন করে সমস্যা সমাধানে অন্তরায় ও বিলম্ব সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে বিগত সরকার মুক্ত রাজনীতিতে সম্পৃক্ত উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা চালু করেন। বস্তুতঃ জেএসএস-এর পাঁচ দফা দাবি দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব বিরোধী। উপজাতীয় নেতারা বাধ্য হয়ে জনসংহতি সমিতিকে বাদ দিয়ে এগিয়ে এলে সরকার ও উপজাতীয় নেতাদের কয়েক দফা আলাপ আলোচনার পর উল্লেখিত রূপরেখা প্রণীত হয়। ১৯৮৯ সালের ২৫ শে জুন তারিখে তিন পার্বত্য জেলায় নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিষদ গঠিত হয়। এই স্থানীয় সরকার পরিষদের কাছে ২২ টি বিভাগ হস্তান্তরের মাধ্যমে স্বশাসন ক্ষমতা রয়েছে। উন্নয়ন ও প্রশাসনে স্থানীয় নাগরিকদের অংশগ্রহন উপজাতীয়দের দীর্ঘকালের দাবি। সেই দাবির ভিত্তিতেই স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের ফলে এরশাদ সরকারের পতন

www.pathagar.com

হলে অবাধ ও নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। তখনকার গণতান্ত্রিক বিএনপি সরকারও পার্বত্য সমস্যা সমাধানে সদিচ্ছার প্রমাণ রেখেছেন। পূর্বেকার বিভিন্ন সরকারের অনুসৃত নীতি এই সরকারও অব্যাহত রেখেছে। সরকার সমূহের বিভিন্ন সময়ের নানাবিধ পদক্ষেপ মূলতঃ পার্বত্যবাসীর মৌলিক অধিকার সমস্যা নিরসনকল্পে গৃহীত জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং সর্বোপরি বিরাজমান পার্বত্য সমস্যার সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ সমাধান । কিন্তু সরকারের সব ধরনের মহৎ উদ্যোগই জনসংহতি সমিতিকে তুষ্ট করতে পারেনি। সরকার বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসীদের প্রতি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্যে এ পর্যন্ত ৫ বার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। শেষ পর্যন্ত ভারতের হস্তক্ষেপে হাসিনা সরকারের সময় একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এর পরও পাহাড়ী উপদলগুলো মারামারি, হানাহানি, চাঁদা আদায়, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। ফলে শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।

মানবাধিকার লংঘন

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠী আজ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে বাঁচতে চায়। বিগত ৩০ বছর যাবৎ শান্ত পার্বত্য ভূমিতে যে অশান্ত ঝড়ো হাওয়া বয়ে চলেছে তা কারো অজানা নয়। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা সহজ সরল পার্বত্যবাসীর জীবন যাত্রাকে জিম্মি করে রেখেছে। যখন তখন হঠাৎ হামলা চালিয়ে হত্যা ও অপহরণ করে চলছে তার কোন প্রকৃত বিচার পাওয়া যায়না। যদি কোন প্রকার প্রতিবাদ করা হয় তার প্রতিদান হয় মৃত্যু।

পার্বত্য এলাকার সকল সম্প্রদায়ের উপজাতি ও অউপজাতি সকলে মিলে মিশে এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে আসছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক স্বার্থান্ধ সুবিধাবাদী মহল সৌহার্দপূর্ণ সামাজিক পরিবেশকে ধ্বংস করে চলছে। শান্তির নাম করে অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে এই পার্বত্যবাসীর বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও হরণ করছে। বর্তমান অর্থনৈতিক দূর্দিন অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করছে। চাঁদা আদায়ে কোন রুপ বাঁধা প্রদান করলে শান্তি প্রিয় মানুষের জীবনে নেমে আসে নিষ্ঠুর নির্মম পরিহাস। এটা ভাবতেও অবাক লাগে। পার্বত্য জাতি স্বত্বার অধিকার প্রতিষ্ঠার ইস্যুকে সামনে রেখে একটি মহল সরলতার সুযোগ নিয়ে কেন অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি করছে। কষ্টার্জিত আয়ের উপর জোর করে অবৈধ চাঁদা আদায় করে নেতারা বিলাসী জীবন যাপন করছে। তাদের উদ্দেশ্যহীন মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় পার্বত্য জনপদ রক্তাক্ত হচ্ছে। নির্দয়ভাবে নিহত হচ্ছে শিশু, কিশোর, নারী, বৃদ্ধ। আজ পার্বত্য মানুষের আর্ত চিৎকার এবং মানবিক চেতনা পদদলিত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লংঘন করে চলছে এই সন্ত্রাসীরা। অনেকে পার্বত্য পরিস্থিতির শিকারও হচ্ছেন।

www.pathagar.com

এই কথা ভাবতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ভূখন্ডের প্রতিটি নাগরিকই এদেশের সন্তান। কোন অবস্থায় কারো অধিকার খর্ব হউক কিংবা মানবাধিকার লংঘিত হউক সেটা কোন দেশপ্রেমিক নাগরিকের কাম্য নয়। মাতৃত্ববোধ যাদের আছে তাদের মানবতাবোধও আছে তারা কোন দিনও হত্যা, অপহরণ, চাঁদা আদায়, নির্যাতন ইত্যাদি মেনে নিতে পারে না। অথচ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা একের পর এক নিষ্ঠুর হামলা চালিয়ে গ্রামে গ্রামে অশান্তির বিষ বাষ্প ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় নয় লাখ মানুষ গভীর উৎকণ্ঠা, অজানা আশংকা, ভয়, নিদ্রাহীনতার সাথে নিদারুন কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। নিরাপরাধ উপজাতীয় নারী ও শিশুরাও রেহাই পায় না তাদের অত্যাচার থেকে।

বিগত বছরগুলোতে পার্বত্য অঞ্চলে মানবাধিকার চরমভাবে লংঘনের চিত্র সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার দেশী-বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত/প্রচারিত হয়েছে অনেক। তারই কয়েকটি উদাহরণঃ-

১। **চন্দ্রঘোনা সেনা হত্যাকান্ড ঃ** ১৯৭৭ ইং সালের ২৯ মে, জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কাপ্তাই থানার চন্দ্রঘোনায় টহলরত সৈনিকের উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। এ হামলায় ৭ জন সৈনিক হতাহত হয়।

২। **লংগদু হত্যাকান্ড ঃ** ১৯৭৯ সনের ১৬ ও ১৭ই ডিসেম্বর তথাকথিত শান্তি বাহিনী বর্তমান লংগদু থানার ২৩ নং বগাতচর মৌজাধীন রাংগী পাড়ার পার্শ্ববতী বাঙালী গ্রামে হামলা চালিয়ে শতাধিক বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং বহু সংখ্যক নিরীহ নারী ও শিশুকে হত্যা করে।

৩। **কাউখালী হত্যাকান্ড ঃ** ১৯৮৪ ইং সনের ১৫ সেপ্টেম্বর সন্তু লারমার নির্দেশে উপজাতীয় সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী থানার বাঙ্গালী অধ্যুষিত গ্রামে হামলা চালিয়ে ১৩ জন নিরীহ বাঙালীকে হত্যা করে।

৪। **ভূষণছড়া হত্যাকান্ড ঃ** ১৯৮০ সালের ৩১শে মে সন্তু লারমার সন্ত্রাসীরা মেজর রাজেশ (বর্তমানে মন্ত্রী মনিস্বপন) এর নেতৃত্বে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল থানার ভূষণছড়া ইউনিয়নে অবস্থিত বাঙালীদের গ্রামসমূহে হামলা চালিয়ে ৩৫০ জন নারী, পুরুষ ও শিশু কিশোরকে এর রাত্রেই হত্যা করে এবং বাঙালী পল্লীতে অগ্নিসংযোগ করে।

৫। **পানছড়ি হত্যাকান্ড ঃ** ১৯৮৬ ইং সালের ২৯ এপ্রিল সন্তু লারমার হুকুমে শান্তিবাহিনী খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি এবং মাটিরাঙা থানার বাঙালী গ্রামসমূহে হামলা চালায়। সরকারি হিসাব মতে, এ হত্যাকান্ডে ৩৮ জন নিহত এবং ২০ জন বাঙালী আহত হয়।

www.pathagar.com

৬। **লোগাং হত্যাকান্ড ঃ** ১৯৯২ ইং সালের ১০ই এপ্রিল খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানার অর্ন্তগত লোগাং পল্লীতে ১২ বছরের একটি বাঙালী রাখাল শিশুকে উপজাতীয় সন্ত্রাসীরা জবাই করে ও ৩জন বাঙালী শিশুকে আহত করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতীয় ও বাঙালীদের মধ্যে ব্যাপক দাঙ্গা বাঁধে। ফলে উভয় পক্ষে ১৩ জন নিহত হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সন্তু গংরা মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার চালিয়ে এ ঘটনার জন্য শুধুমাত্র বাঙালীদের দায়ী করে এবং ১৩ জনকে ১৩০০ জন বলে বিশ্বব্যাপী অপপ্রচার চালায়।

৭। **নানিয়াচর হত্যাকান্ড ঃ** ১৯৯৩ ইং সালের ১৭ নভেম্বর তারিখে নানিয়াচর বাজারে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও বাঙালীদের মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি ও পরবর্তীতে পাহাড়ী সন্ত্রাসীরা হত্যাকান্ড সংগঠিত করে। এতে ২০ জন বাঙালী নিহত ও ৩৫ জন আহত হয়।

৮। **বাঘাইছড়ি হত্যাকান্ড ঃ** ১৯৮৮ ইং সালের ৮ই আগষ্ট বাঘাইছড়ি থানার নব খাগড়াছড়ি গ্রামে সন্তু লারমার হুকুমে শান্তিবাহিনী হামলা চালায় এবং ১১ জন নিরীহ বাঙালীকে হত্যা করে।

৯। **রামগড় হত্যাকান্ড ঃ** ১৯৮৬ ইং সনের ২২ ডিসেম্বর রামগড় বাজারে তথাকথিত শান্তিবাহিনীর নজিরবিহীন হত্যাকান্ড চালিয়ে ২২ জনের নৃশংস হত্যা ও ৫০ জনকে আহত করে এবং অসংখ্য বাড়িঘর, দোকানপাট, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেন। ১৯৮৬ ইং সনের ১৪ ডিসেম্বর রামগড়ের হাজাছড়ায় পাহাড়ী সন্ত্রাসীরা নৃশংসভাবে ১৩ জন বাঙালীকে ঘুমন্ত অবস্থায় ঘরে আগুন দিয়ে ও গুলি চালিয়ে হত্যা করে এবং ১৬ ডিসেম্বর রাত্রে বল্টুরাম টিলায় পুত্রসহ তিনজনকে জবাই করে হত্যা করে। একই বৎসর রামগড়ের পাতাছড়ায় ১১ জন, বড় পিলাগে ৭ জনকে অমানুষিক কায়দায় গুলি করে ও আগুন দিয়ে হত্যা করে। ১৯৯০ ইং সালে রামগড় থানায় খাগড়াবিল বাজারে শান্তিবাহিনী হামলা চালায় এবং ১১ জন নিরীহ বাঙালীকে হত্যা করে।

১০। **কুমিল্লাটিলা হত্যাকান্ড ঃ** ১৯৮৮ ইং সনের ২৪ এপ্রিল খাগড়াছড়ি সদরের কুমিল্লাটিলায় ঘুমন্ত মানুষের ঘরের দরজায় তালা দিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় সন্তুর সন্ত্রাসীরা অগ্নিসংযোগ করে একই পরিবারের নারী শিশুসহ ৭ জনকে হত্যা করে। ৮ই জানুয়ারি ৯৪ ইং তারিখে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সদস্যরা খাগড়াছড়ি জলার মহাজন পাড়া এলাকায় জামালউদ্দিন নামে এক রিক্সাচালককে হত্যা করে।

১১। ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ৯৬ ইং তারিখে রাঙামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি

www.pathagar.com

থানার অধিবাসী মোঃ ইসহাককে শান্তিবাহিনী অপহরণ করে পরবর্তীতে হত্যা করে।

১২। ১২ই জুন ৯৬ ইং তারিখে রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উপজাতীয় সন্ত্রাসীরা মোট ৩৮ জন আওয়ামী লীগ সমর্থককে অপহরণ করে। যার মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী।

১৩। **পাকুয়াখালী হত্যাকান্ড ঃ** ৯ই সেপ্টেম্বর ৯৬ ইং তারিখে রাঙামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি থানার গুলশাখালী, গাঘাছড়া, মাইনী, বড়মহিল্লা ও কালাকাপাকুয়াখালী এলাকার মোট ৩৪ জন বাঙালী কাঠ কাঠতে গেলে বড় মহিল্লা এলাকা হতে শান্তি বাহিনী তাদেরকে অপহরণ করে করে নিয়ে যায় এবং ১১ ই সেপ্টেম্বর ৯৬ ইং তারিখে ২৮জনকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৪। ১৯৮৬ সালে খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙার তাইন্দং-তবলছড়ি, ভগমানটিলা, তানাক্কাপাড়া, পানছড়ির ছনটিলা, মানিকছড়ি উপজেলার মলাঙ্গিপাড়ায় নৃশংসভাবে বাড়ীঘর জ্বালিয়ে প্রায় শতাধিক বাঙালী নারী-পুরুষ ও শিশুকে শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীরা হত্যা করে।

১৫। **বিদেশীদের অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়, উন্নয়ন কাজে বাঁধা প্রদান ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে বিদেশীরাও পাহাড়ী সন্ত্রাসীদের কর্তৃক অপহরণের শিকার হতে হয়েছে। ৮০'র দশকে মানিকছড়ি চিমুতং গ্যাস ফিল্ডে তেল গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত ৩জন বিদেশী বিশেষজ্ঞকে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অপহরণ করে বিপুল পরিমাণ মুক্তিপণ আদায় করে তাদের ছেড়ে দেয়। এরপর তেল গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে তেল গ্যাস অনুসন্ধান কাজ শুরু হলে থানার পাহাড়ী সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ি বিচিতলা এলাকা থেকে ১ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করে।

১৬। সর্বশেষ ২০০১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রাঙামাটি-মহালছড়ি সড়কের গুনিয়াপাড়া এলাকা থেকে কেমস্যারক্স কোম্পানীর তিন বিদেশী কনসালট্যান্ট ও ডেনিশ ইঞ্জিনিয়ারকে উপজাতীয় সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে কালো পাহাড়ে গোপন আস্তানায় নিয়ে যায়। পরে তাদের মোটা অংকের মুক্তিপণের বিনিময়ে এবং সেনাবাহিনীর উদ্ধার তৎপরতায় তিন বিদেশী প্রকৌশলী সন্ত্রাসীদের কবল মুক্ত হয়। এ ঘটনায় বিশ্বব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এই অপহরণ ঘটনায় বিভিন্ন দাতাদেশ ও সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ড বন্ধ করে দেয়।

১৭। **মহালছড়ি ঘটনাঃ** গত ২৪শে আগষ্ট ২০০৩ ইং তারিখে উপজাতীয় সন্ত্রাসীরা মহালছড়ির সিংগীনালা বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ হতে রুপম মহাজন নামে একজন হিন্দু বাঙালী যুবককে চাঁদার দাবিতে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

পরবর্তীতে বাঙালী জনগণ উক্ত ঘটনার প্রতিবাদ করলে গেরিলা পোষাক পরিহিত অবস্থায় উপজাতীয় সন্ত্রাসীরা নিরীহ পথচারী বাঙালীদের উপর মহালছড়ি সদরের বাবু পাড়ার সম্মুখ হতে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। এতে ৫ জন বাঙালী যুবক গুরুতর আহত হয় এবং পঙ্গুত্ব বরণ করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে বাঙালী ও উপজাতীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাঙালীদের ৪টি সহ উপজাতীয়দের প্রায় ৩০০ ঘরবাড়ি ভস্মিভূত হয়। বর্তমান সরকার এই ঘটনায় তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য গৃহ নির্মাণসহ যথাযথ পুনর্বাসন করে। অথচ পরিকল্পিতভাবে বাঙালী ও সেনাবাহিনীকে দোষারোপ করে সরকারকে বিব্রত করার অপচেষ্টা চালায় এবং বিষয়টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী বা সংস্থার নিকট তুলে ধরে ব্যাপক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। কিন্তু অপহৃত রুপম মহাজনকে আজো উদ্ধার করা যায়নি।

অর্থাৎ জেএসএস চায় এই পার্বত্য এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হউক। উপজাতি সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বাঙালীদের হত্যা করবে। পরবর্তীতে নীরিহ উপজাতীয়রা সেই হত্যাকান্ডের শিকার হবে। বিভিন্ন নোংরা ষড়যন্ত্রের খেলায় মত্ত হয়ে অনেক হত্যাকান্ড সন্ত্রাসীরা ঘটাচ্ছে। শুধু তাই নয় একসময় তথাকথিত শান্তিবাহিনী জোরপূর্বক উপজাতীয়দেরকে ভিটাবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে সীমান্তের ওপারে নিয়ে গিয়েছিল। ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ওপারে শিবিরে যারা অবস্থান করেছে তারা অর্ধাহারে মানবেতর জীবনযাপন করেছিল। সেই চিত্র ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় তুলে ধরা হয়েছিল।

সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী সংবিধান বিরোধী বিদ্রোহীদের প্রতিহত করা, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের হুমকি প্রতিরোধ করা এবং জননিরাপত্তার স্বার্থে সরকার এখানে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ করেছে। প্রথম দিকে নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসীদের খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে নানা সংকটে পড়েছিল। তখন সন্ত্রাস দমন করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে নিরীহ মানুষ কষ্ট পাবার খবর পাওয়া গেছে বলে অনেকে অভিযোগ করে। তার বেশিরভাগ ছিলো বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মহল বিশেষ করে জেএসএস/ইউপিডিএফ এর পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করার জন্যে। বস্তুতঃ জেএসএস সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করার কারনে সেনাবাহিনী এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে। জেএসএস এর পক্ষ থেকে সন্ত্রাস শুরু কিংবা দেশের স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন না হলে সেনাবাহিনীর আগমন ঘটতো না। তথাকথিত শান্তিবাহিনীই প্রকারান্তরে সরকারকে সেনাবাহিনী এখানে পাঠাতে বাধ্য করেছে। কেননা সেনাবাহিনী এসেছে ১৯৭৬ সালের দিকে। কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয় ১৯৭৩ সালের দিকে। সেনাবাহিনী উঠে গেলে সশস্ত্র

www.pathagar.com

সন্ত্রাসীদের হাতে পার্বত্য নাগরিক নির্মমতার শিকার হবে নিশ্চিত এমনকি বিবদমান দুইদল একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। অন্যদিকে নিরাপত্তা জনিত বিভিন্ন বিধি নিষেধের কারণে নাগরিক জীবনে সমস্যা দেখা দিয়েছে শুধুমাত্র সন্ত্রাসীদের অবস্থানের কারণেই। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে তা উদার মনে সহ্য করে যাচ্ছে পার্বত্যবাসী। নিরাপত্তাহীন পার্বত্য শান্তিপ্রিয় মানুষের নিরাপত্তা কিভাবে আসতে পারে? তবে উল্লেখ্য বর্তমানে নিরাপত্তাবাহিনী পার্বত্য অঞ্চলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সামরিক এই তিন ভাবে সমস্যা মোকাবেলা করছে।

নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি ও পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি। কিন্তু সশস্ত্র সন্ত্রাস নষ্ট করে শান্তি। পার্বত্য মানুষের অধিকার আদায়ের মিথ্যা বুলি আওড়িয়ে সন্ত্রাসীরা জনগণের শান্তি বিঘ্নিত করছে, তাদের বিভ্রান্ত করছে। সন্ত্রাসের কাছে মানবতাবাদ আজ মাথানত। জনসংহতি সমিতি অনেক ক্ষেত্রেই চুক্তি অনুযায়ী আচরণ করছে না। তারা সকল অস্ত্র সমর্পন করেনি, তারা সশস্ত্র দল স্বক্রিয় করেছে, অস্ত্র ও মাদক ব্যবসায় জড়িত হয়েছে, সরকার বিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পাচ্ছে, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশদ্রোহীতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছে, যা যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চলে বিদ্যমান।

আজ সারা দেশে গণতন্ত্রের চর্চা চলছে। সুতরাং পার্বত্য অঞ্চলেও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসা প্রয়োজন। কিন্তু কিভাবে আসবে? বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল পার্বত্য প্রেক্ষাপটের গভীরে না গিয়ে বিবৃতি দিয়ে নিবন্ধ লিখে ঘোলাটে করে তুলছে। এখানে সন্ত্রাসী কর্তৃক নিরীহ নাগরিককে খুন করার বিষয়টি অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যান। এখানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটতে শুরু হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। এ ব্যবস্থাকে জোরদার করার মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জন প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃত্ব গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়েছে। এই ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য দেশের পরিকল্পকদের আরো উদার হওয়া বাঞ্চনীয়। আজ পার্বত্যবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল মানবতাবাদী কর্মী, সাংবাদিক, রাজনীতিক সর্বোপরি সরকারের এই নিরীহ পার্বত্যবাসীকে সন্ত্রাসের হাত থেকে মুক্ত করার উদ্যোগের আহবান থাকলো। বিভিন্ন সরকারের গৃহীত উদ্যোগ যথাযথ কার্যকর না হওয়ায় সরকারের সদিচ্ছার প্রতি পার্বত্যবাসী অনেক সময় সন্দিহান হয়ে ওঠে। এ দিকটিরও প্রতি সরকার নজর রেখে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিরাজমান সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা অধিকাংশ মানুষ শান্তি চায়। কতিপয় বিভ্রান্ত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত কঠোর পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

মহালছড়ি ঘটনার নেপথ্যে কাহিনী

দিনটি ছিল ০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭, যে দিন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মধ্যে খাগড়াছড়ি ষ্টেডিয়ামে পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অবসান হয় দীর্ঘ দিনের সশস্ত্র সংগ্রামের, আর শান্তির দ্বার উন্মোচিত হয়, সূচিত হয় পার্বত্যাঞ্চলের উন্নয়নের সমূহ সম্ভাবনা। চুক্তির কতিপয় অংশে যদিও কিছুটা বিতর্ক বা ভিন্নমত প্রকাশ পায়, তথাপি তা অধিকাংশ মহল তথা দেশে-বিদেশে বেশ প্রশংসিত হয়। কোন কোন দেশ আবার এটাকে মডেল হিসেবে দীর্ঘ দিনের ইন্সারজেন্সী সমস্যা অবসানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে মনে করে। যদিও ইন্সারজেন্সী নির্মূলের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। যা হোক, আমাদের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্যই যে এ চুক্তিতে অনেকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কারণ, পার্বত্য চট্টগ্রামের দু'যুগেরও বেশী ইন্সারজেন্সী সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ। অনেক পিতা-মাতা হারিয়েছে তার অকুতোভয় সন্তানকে, স্ত্রী হয়েছে বিধবা, আর সন্তান হয়েছে পিতৃহীন, যার হিসাব এ মুহূর্তে অনুল্লেখযোগ্য। তাই অন্ততঃ শান্তি চুক্তির পর তুলনামূলকভাবে সকলের পাহাড়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে দ্বিধা বা সংশয় অনেকটা কমেছে। শুধু সেনাবাহিনী তথা নিরাপত্তা বাহিনীই নয়, বেসামরিক প্রশাসন, দেশী-বিদেশী সংস্থাসমূহ, ব্যবসায়ী, পর্যটক তথা আপামর জনগণ সকলেই এ শান্তি চুক্তির সুফল ভোগ করতে শুরু করে। এছাড়া তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সদস্যগণও ফিরে পায় দীর্ঘদিনের অনিশ্চিত জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি ও সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এককালীন আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা।

শান্তির দ্বার উন্মোচিত হওয়া সত্ত্বেও একটি অদৃশ্য শক্তির হাতছানিতে পাহাড়ের কিছু বিভ্রান্ত ও বিপথগামী ব্যক্তি বিশেষ করে যুবক শ্রেণী চুক্তি বিরোধী অবস্থান নেয়। এ চুক্তি বিরোধী গোষ্ঠী চুক্তি পক্ষের দল তথা জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করে ও বিভিন্ন সংঘাতময় ঘটনা যেমনঃ অপহরণ, মুক্তিপণ দাবি, হত্যা, মুখোমুখি সংঘর্ষ, ঘরে আগুন দেয়া ইত্যাদি শুরু করে। এতে চুক্তি পক্ষীয় দল তাদেরকে নিবৃত করতে চেষ্টা করে এবং তারাও প্রায় একইভাবে এর পাল্টা জবাব দেয়। চুক্তি বিরোধী দলটি এক সময় নিজেদেরকে সংগঠিত করার জন্য ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) নামে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেদেরকে আত্মপ্রকাশ করে, যার নেতৃত্ব দেন প্রসিত বিকাশ খীসা। বয়সে তরুণ ও শিক্ষিত এ যুবক দলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এ দলে মূলতঃ কোন

www.pathagar.com

বর্ষীয়ান নেতৃবৃন্দের অবস্থান চোখে পড়ে না, তবে জেএসএস প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার দলের প্রায় অধিকাংশ নেতৃবৃন্দই বেশ বর্ষীয়ান ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তা সত্ত্বেও পার্বত্যাঞ্চলের কয়েকটি বিশেষ এলাকায় ইউপিডিএফ আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং তারা ধীরে ধীরে নিজেদেকে অধিকতর শক্তিশালী করতে প্রয়াস চালায়। খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলা এমনই একটি স্থান যেখানে রয়েছে ইউপিডিএফ এর শক্ত ঘাঁটি। এই মহালছড়ির উত্তরে রয়েছে খাগড়াছড়ি জেলা সদর, পূর্বে লংগদু উপজেলা, দক্ষিণে নানিরয়াচর ও পশ্চিমে সিন্দুকছড়ি, মাটিরাঙা ও খেদাছড়া। মহালছড়ির পশ্চিমে কালাপাহাড় এবং পূর্বে চেংগী নদী ও মাইনী রেঞ্জ উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে। মহালছড়ি উপজেলা ছাড়াও নানিয়ারচর, গুইমারা ও খাগড়াছড়ি সদর থানার কিছু অংশ নিয়ে মহালছড়ি এলাকা বিন্যস্ত রয়েছে, যার দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ২২ কিঃমিঃ ও প্রস্থ ১৫ কি:মি:।

মহালছড়ির রাজনৈতিক পরিস্থিতি পার্বত্য এলাকার অন্যান্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়। তবে যেহেতু এ নিবন্ধের শিরোনাম মহালছড়িকে নিয়ে তৈরি হয়েছে, তাই এ নিবন্ধে শুধুমাত্র মহালছড়ির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ঘটনার প্রেক্ষাপট, উপজাতীয়দের বাড়িঘরে অগ্নিকান্ড ও পরবর্তী ঘটনাবলী, বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারনা দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে। যা পাঠকগণের মহালছড়ির সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছুটা হলেও জ্ঞান লাভে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

মহালছড়ির রাজনৈতিক পরিস্থিতি

পার্বত্য তিনটি জেলার মধ্যে খাগড়াছড়ি জেলার অবস্থান সর্ব উত্তরে। এ জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস অনেক দীর্ঘ, যা এ স্বল্প পরিসরে আর উল্লেখ করতে চাই না। নিবন্ধটি যেহেতু মহালছড়িকে নিয়ে লেখা, তাই আপাততঃ মহালছড়ি সম্পর্কেই কিছুটা ধারনা দিতে চাই। মহালছড়ি উপজেলার ইউনিয়নগুলি হলো মাইসছড়ি, কেয়াংঘাট, মুবাছড়ি ও মহালছড়ি সদর। মহালছড়ি মূলতঃ একটি চাকমা অধ্যুষিত এলাকা। এখানে উপজাতি ও অউপজাতি মিলে প্রায় ৬৩,৮৫৬ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যার পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্র/নং	গোত্র	আনুমানিক সংখ্যা	শতকরা হার
১।	চাকমা	২৯,৬৯৫	৪৬.৫০%
২।	মারমা	১০,৩৪৫	১৬.২০%
৩।	ত্রিপুরা	৫,১৬৮	৮.০৯%
৪।	বাঙ্গালী	১৮,৬৪৮	২৯.২০%
মোট			৬৩,৮৫৬

www.pathagar.com

মহালছড়িতে যে সকল গুচ্ছগ্রাম রয়েছে তার হিসাব নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্র/নং	নাম	জনসংখ্যা
১।	মহালছড়ি	২,২৪৭
২।	নুনছড়ি	১,৭৮৫
৩।	মাইসছড়ি	৪২৮
৪।	কেয়াংঘাট	৮০০
৫।	চংরাছড়ি	২,৬০০
৬।	জয়সেন পাড়া	১,০০০
৭।	পাকিজ্যাছড়ি	৭৭৫
মোট		৯,৬৩৫

মহালছড়িকে একটি স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারন, মহালছড়িতে শান্তি চুক্তি পক্ষ-বিপক্ষ উভয় দলেরই রয়েছে সুসংহত অবস্থান। জেএসএস নেতা সন্তু লারমা এক সময় মাইসছড়ি হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এছাড়া জেএসএস এর আরেক উল্লেখযোগ্য নেতা সুধাসিন্ধু খীসা, প্রজ্ঞান খীসা, ইউপিডিএফ প্রধান প্রসিত বিকাশ খীসা, আর্কিমিডিস চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সকলই মহালছড়ির অধিবাসী। তবে মহালছড়িতে অশান্ত পরিস্থিতির জন্য মূলতঃ আর্কিমিডিস চাকমা দায়ী বলে অধিকাংশ মহল মনে করেন। তিনি ইউপিডিএফ এর একজন প্রভাবশালী নেতা যিনি বর্তমানে মহালছড়ি সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং ইতিপূর্বেও একই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন। অত্র এলাকায় তার শক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত জেএসএস সমর্থিত নেতা প্রজ্ঞান খীসা যিনি ইতিপূর্বে আর্কিমিডিস চাকমাকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তার ভাইকে হত্যা করেন। বর্তমানে উভয়েই জনসমক্ষে সচরাচর হাজির হন না। সাধারণতঃ উভয় পক্ষের আধিপত্যকে বিভক্ত করেছে চেংগী নদী, যার পশ্চিমে জেএসএস ও পূর্বে রয়েছে ইউপিডিএফ। তবে সম্প্রতি ইউপিডিএফ বাবুপাড়া, থলিপাড়া, কেরেংগানালা ও যৌথখামার প্রভৃতি এলাকায় তাদের আধিপত্য জোরদার করতে সমর্থ হয়। তুলনামূলকভাবে ইউপিডিএফ উক্ত এলাকার অধিকাংশ সহিংস ঘটনার হোতা। তারা মূলতঃ চাঁদাবাজি, অপহরণ, মুক্তিপণ দাবি, খুন, মুখোমুখি সংঘর্ষ প্রভৃতি রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে। তবে তারা প্রধানতঃ চাঁদাবাজিতে অত্র এলাকায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি চাঁদাবাজি এমন চরমে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তাদের এ চাঁদাবাজি থেকে এলাকার কোন জনসাধারণ বাদ পড়েনি। সকল ধরনের যানবাহন, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার এমনকি চাকুরিজীবিরাও এ

www.pathagar.com

চাঁদাবাজি থেকে রেহাই পেত না। শান্তিচুক্তি পরবর্তী সময়ে অত্র এলাকায় চাঁদাবাজি ও অন্যান্য সহিংস ঘটনাবলীর একটি পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ক্র/নং	ঘটনার প্রকার	মোট
১।	নিহত	২৫ জন
২।	আহত	৪৮ জন
৩।	অপহরণ	৫৬ জন
৪।	গোলাগুলির ঘটনা	১৪ টি
৫।	চাঁদাবাজ গ্রেফতার	০৫ জন
৬।	বাঙালী-চাকমা দাংগার ঘটনা	০৫ টি
৭।	বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার	১০৩ জন

অপরদিকে স্থানীয় বণিক সমিতি যাদের অধিকাংশই মূলতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের, তারা অর্থনৈতিকভাবে বেশ সমৃদ্ধ ও চাকমা সম্প্রদায় থেকে নিজেদেরকে কোন অংশে কম মনে করে না। তারাও দীর্ঘ দিন ধরে এই ইউপিডিএফ এর চাঁদা সংগ্রহকারী দলকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাঁদা প্রদান করে আসছে এবং এ নিয়ে ক্রমান্বয়ে তাদের মাঝে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে থাকে। এছাড়া গুচ্ছগ্রাম ও মহালছড়ি সদরে বসবাসকারী অন্যান্য বাঙালী মুসলমান অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থা বেশ অনুন্নত। তারা সব দিক দিয়েই উপজাতি ও হিন্দু সম্প্রদায় থেকে বেশ পিছিয়ে রয়েছে এবং কোন রকমে বেঁচে আছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

যদিও দৃশ্যতঃ মহালছড়িতে ইউপিডিএফ ও জেএসএস এর দ্বন্দ্ব উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। তথাপি এখানে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু সম্প্রদায় ও চাকমা উপজাতিদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলে আসছে। এ দ্বন্দ্ব মূলতঃ ব্যবসা ও সামাজিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, যা কখনো তেমন একটা প্রকাশ্য সহিংসতার রূপ নেয়নি। তবে উভয় পক্ষই ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উপর নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে চেষ্টা করে। আরেকটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়, তা হলো ইউপিডিএফ মূলতঃ চাকমা নির্ভর একটি দল। যদিও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কর্মীও এ দলে রয়েছে, তবে তা অতি নগণ্য। এদিকে হিন্দু সম্প্রদায় মহালছড়িতে ধীরে ধীরে পুরো ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় ও পাহাড়তলীতে একটি শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। তারা চাকমা অধ্যুষিত এলাকা বাবুপাড়া ও চেয়ারম্যান পাড়াতেও তাদের অবস্থান প্রসারিত করতে শুরু করে। এ দু'টি পাড়ার অবস্থান হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা থেকে যথাক্রমে পশ্চিম ও দক্ষিণে। উপজেলা কমপ্লেক্স এর আশেপাশের অন্যান্য এলাকাসমূহে সাধারণতঃ বাঙালী সেটেলারদের

www.pathagar.com

বসবাস। বাবুপাড়ায় প্রায় ৩৮টি করে চাকমা ও মারমা পরিবার রয়েছে। এছাড়াও সেখানে ১টি ত্রিপরা ও কয়েকটি বাঙালী হিন্দু পরিবারও রয়েছে। বাবুপাড়া ও চেয়ারম্যান পাড়ার অবস্থান ও ভূমির গঠন ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র ও অন্যান্য কর্মকান্ড পরিচালনাকে বেশ সহজতর করেছে। পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা এ অরণ্যে মানুষের চলাচল সচরাচর চোখে পড়ে না। এর ফলে স্বয়ং আর্কিমিডিস চাকমা চেয়ারম্যান পাড়ায় তার শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। উপরন্ত এ দু'টি পাড়ার শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ নিরাপত্তা বাহিনীর সকল অভিযানের জন্য এলাকাটিকে স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। ইতিপূর্বে বাবুপাড়ায় অত্যন্ত সাবধানতার সাথে বেশ ক'বার অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সম্প্রতি রূপন মহাজন (২২), পিতা বিজয় মহাজন মহালছড়িতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে। কারণ, সে শুধু তার পিতার হার্ড ওয়্যারের ব্যবসাই দেখাশুনা করত না, পাশাপাশি সে ইউপিডিএফকে চাঁদা সংগ্রহ করে দিত। সম্প্রতি চাঁদা প্রদানের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া ও বিলম্বে প্রদানের কারণে তার সাথে ইউপিডিএফ এর তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে ইউপিডিএফ সদস্যগণ তার প্রতি দিনে দিনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং যতদুর জানা যায়, সম্প্রতি এক পর্যায়ে রূপন মহাজন ইউপিডিএফ কে চাঁদা প্রদান বন্ধ করে দেয়। এছাড়াও সে ধীরে ধীরে স্থানীয় বাজারকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে চেষ্টা করে। এতে চাকমা সম্প্রদায়ের বিশেষ করে যুবকদের সাথে তার শত্রুতা বাড়তে থাকে। রূপন মহাজনের সাথে তিক্ত সম্পর্কের আরেকটি কারণ উল্লেখযোগ্য। তা হলো অতি সম্প্রতি রূপন মহাজনের জনৈক চাচাতো ভাই পালিয়ে বাবুপাড়া নিবাসী বিনোদ বিহারী খীসার (প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান) মেয়েকে বিয়ে করে। উক্ত বিয়েতে কারও মত ছিল না। অনেকেরই ধারণা যে, রূপন মহাজন উক্ত বিয়েতে ও পালিয়ে যাওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, উক্ত চাকমা মেয়েটি জেএসএস নেতা প্রজ্ঞান খীসার সৎ বোন। অর্থাৎ বিনোদ বিহারী খীসা দ্বিতীয় বিয়ে করলে প্রজ্ঞান খীসার সাথে তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় এবং তার পিতা বাবুপাড়ায় পৃথকভাবে দ্বিতীয় সংসার শুরু করেন।

গত ২৪ আগষ্ট ২০০৩ তারিখে চেংগী নদীর পূর্ব পাড়ে সিংগীনালা হাইস্কুল মাঠে এক ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়, যেখানে রূপন মহাজন নিজেও উক্ত খেলা দেখতে যায়। আর সেখানেই পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ইউপিডিএফ সদস্যরা রূপন মহাজনকে জনসমক্ষে অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। ঐদিন রাত আনুমানিক ২১০০ ঘটিকায় মুবাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কংজুরী মারমা অপহরণের ঘটনাটি থানা ও জোন সদরকে অবহিত করেন। অথচ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা পরের দিন সকালে থানা ও সেনা জোন সদরকে অবহিত করে। ঘটনার

www.pathagar.com

পর হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ আলোচনায় মিলিত হয় এবং ঘটনার দিনই রাতে জোন সদর থেকে বেশ কয়েকটি টহল দল অপহৃত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন স্থানে গমন করে। কিন্তু তাকে না পেয়ে পরের দিন অর্থাৎ ২৫ আগষ্ট ২০০৩ তারিখ আনুমানিক সকাল ০৯০০ ঘটিকায় টহল দল সমূহ ফেরত আসে। অতপরঃ অপহৃত রূপন মহাজনকে উদ্ধারের জন্য নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক বিশেষ অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে অনেক চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি মহালছড়ি সদরের সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে ডেকে এক সভায় মিলিত হন এবং সকলকে পরবর্তীতে করণীয় ও অকরণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেন সেনা জোন সদরে। তাদের সকলকে এ আশ্বাস দেন যে, যদিও তারা অনেক বিলম্বে জোন সদরকে বিষয়টি অবহিত করেছে, তথাপি অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। এতদসত্ত্বেও তারা বাজারে এক সভা ও মিছিল সমাবেশের আয়োজন করে। এ সময় সিন্দুকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুইনি প্রু চৌধুরী (যিনি একজন ইউপিডিএফ এর নিবেদিত সমর্থক বলে পরিচিত) সমাবেশস্থলে আগমন করেন। এতে উত্তেজিত হিন্দু সম্প্রদায় তথা বণিক সমিতির লোকজন তাকে আটক করে মারধর করলে জোন সদরের তড়িৎ হস্তক্ষেপে তাকে উদ্ধার করে ২৬ আগষ্ট ২০০৩ তারিখ সকাল ০৮০০ ঘটিকা পর্যন্ত নিরাপদ হেফাজতে রাখা হয়। অথচ বণিক সমিতি কোন ঘোষনা ব্যতিরেকে সকল যান চলাচল ও বাজারের দোকান পাট বন্ধ করে দেয়। ইতিমধ্যে অপহরণকারীরা অপহৃতের পরিবারের কাছে ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে এবং যতদুর জানা যায়, বিষয়টি ২৬/২৭ আগষ্ট ২০০৩ তারিখে নিষ্পত্তি হওয়ার কথা ছিল।

অউপজাতি কর্তৃক উপজাতিদের বাড়িঘরে অগ্নিকান্ড

২৬ আগষ্ট ২০০৩ তারিখ আনুমানিক সকাল ০৯৩০ ঘটিকায় কিছু বাঙালী ও ইউপিডিএফ সদস্য বাবুপাড়া ব্রীজের কাছে মুখোমুখি অবস্থান নেয় এবং এক পর্যায়ে ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বাঙালীদের উপর গুলিবর্ষণ করে। এতে চারজন বাঙ্গালী গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতরভাবে আহত হয় এবং উভয় পক্ষের আরও অনেকেই আহত হয়। এদিকে মহালছড়ি বাজার ও তার আশেপাশে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, বাবুপাড়ায় ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা চারজন বাঙালীকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। খবরটি জোন সদরেও দ্রুত পৌঁছে গেলে কয়েকটি সেনা টহল দল তৎক্ষণাৎ বাবুপাড়ায় পৌঁছে যায়। তখন সেখানে ব্রীজের উপর ও তার আশেপাশে উভয় পক্ষের অনেককেই হাতাহাতি যুদ্ধে লিপ্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। উত্তেজিত শত শত বাঙ্গালী ধারালো অস্ত্র ও লাঠি-সোটা হাতে বিভিন্ন দিক দিয়ে বাবুপাড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। নিরাপত্তা বাহিনীর জনৈক অফিসার স্বয়ং যখন ব্রীজের উপর জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন, তখন তিনি নিজেও কয়েকটি

www.pathagar.com

উপজাতি যুবকের আক্রমণের শিকার হন। ঐ সময় ইউপিডিএফ এর অন্ততঃ ৫০/৬০ জন সশস্ত্র সন্ত্রসীকে বাবুপাড়া থেকে আর্কিমিডিস চেয়ারম্যান এর বাড়ি ও তার আশে পাশের এলাকার দিকে চলে যেতে দেখা যায়। পরিস্থিতি তখন বেশ ভয়াবহ আকার ধারণ করে ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সেনা কর্তৃপক্ষ তড়িৎ পরিস্থিতির মূল্যয়ন পূর্বক উভয় পক্ষের ও নিরাপত্তা বাহিনীর যাতে কারও প্রাণহানি না ঘটে সেদিকে গুরুত্ব দেন। উল্লেখ্য, তখন ঘটনাস্থলে ইউএনও ও থানার ওসি উপস্থিত ছিলেন। জোন কমান্ডার ওসিকে নির্দেশ দেন যে, কোন বাঙালী যাতে বাবু-পাড়া ব্রীজ অতিক্রম করে পাড়ায় ঢুকতে না পারে। তিনি তার টহল দলসমূহ নিয়ে বিভিন্ন দিক দিয়ে ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র অস্ত্রধারীদেরকে ধাওয়া করেন এবং এক পর্যায়ে তারা নৌকা যোগে চেঙ্গী নদী পথে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এমতাবস্থায় ওসি ও ইউএনও ঘটনাস্থল ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান এবং ঝাঁকে ঝাঁকে উত্তেজিত বাঙালী বিক্ষিপ্তভাবে বাবুপাড়া, রামেসু কারবারী পাড়া, পাহাড়তলী প্রভৃতি এলাকার দিকে চলে যায় যাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার বা বাধা দেয়ার মত তেমন কেউ ছিল না। সেনা টহল দল যখন ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দিকে ধাবমান ছিলো, সেই সুযোগে বাঙালীরা উপজাতীয়দের বাড়ি ঘরে একযোগে আগুন লাগিয়ে দেয়। এ কাজটি এত দ্রুত করা হয় যে, প্রত্যক্ষদর্শী সকলেই একমত হবেন যে এটা পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া সম্পন্ন করা মোটেও সম্ভব নয়। এছাড়া এভাবে আগুন লাগানোর বিষয়টি সম্ভবতঃ সকলেরই ধারণার বাইরে ছিল। তবে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, ক্ষতিগ্রস্ত পাড়াসমূহ থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প বা পোষ্ট ছিল এপি ব্যাটালিয়ন সদর, এপি'র পোষ্ট ও থানা সদর। তারা এদিকে একটু সুদৃষ্টি দিলেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হয়ত অনেকটা কমানো যেত।

এদিকে কিছু সেনা সদস্য কেয়াংঘাট আর্মি ক্যাম্প থেকে থলিপাড়া গমণ করে। তারা থলিপাড়ার প্রায় ষাটোর্ধ পরিবারকে উত্তেজিত বাঙালীদের নাশকতামূলক কর্মকান্ড থেকে রক্ষা করেন। অথচ এ পাড়ার অবস্থান বাঙালী পাড়া থেকে অতি নিকটে। সম্ভবতঃ উক্ত টহল দলের সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে গমনের ফলে অন্ততঃ উক্ত পরিবারগুলি ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পায়।

অগ্নিকান্ডের খবর পেয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য, রিজিয়ন কমান্ডার, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে আসেন। তারা ইউএন'র কার্যালয়ে প্রথমে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন ও পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সময়ে গুরুতর আহত প্রায় ১০ ব্যক্তিকে খাগড়াছড়ি জেনারেল হাসপাতালে সেনা ও পুলিশ প্রহরায় স্থানান্তর করা হয়। মাননীয় সংসদ সদস্য ও রিজিয়ন কমান্ডার যখন বাবুপাড়া পরিদর্শণরত তখন প্রায় ১৬০০ ঘটিকার দিকে জানা যায় যে, লেমুছড়ি ও চংরাছড়ির দিকে বাঙ্গালীরা অগ্রসর হচ্ছে। স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ

www.pathagar.com

তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ আর্মড পুলিশ ক্যাম্পকে (মগপাড়া ও লেমুছড়ি এপি ক্যাম্প) যে কোন উপায়ে উক্ত পাড়া দু'টিকে রক্ষা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা জানায় যে, তাদের ক্যাম্পের স্বল্প জনবল দিয়ে উত্তেজিত বাঙ্গালীকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়। পরবর্তীতে ঘটনা তদন্তকালে তারা তদন্তকারীদেরকে বলে ভিন্ন কথা। তারা নাকি তাদের ব্যাটালিয়ন সদর থেকে কোন আদেশ পায়নি, এজন্য বাঙালীদেরকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে যা হবার তাই হলো। দু'টি পাড়ার সমস্ত ঘরবাড়ি বাঙালীরা জ্বালিয়ে দেয়। অথচ ক্যাম্প থেকে পাড়াগুলির দূরত্ব তেমন বেশি নয়। ক্যাম্পের উপস্থিত জনবলই বাঙ্গালীদেরকে প্রতিহত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, বাবুপাড়া ও তার আশেপাশের এলাকার মতই লেমুছড়িতেও অগ্নিকান্ড ঘটানো হয়েছে। কিন্তু বাবুপাড়া থেকে উক্ত এলাকার দূরত্ব প্রায় ৭/৮ কিঃমিঃ। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে সেখানে কিভাবে অগ্নিকান্ড সাধিত হলো? অগ্নিকান্ডের পরে অনুসন্ধানে যতদূর জানা যায়, বাঙালীরা ১৯৮০ সালে লেমুছড়িতে পুনর্বাসিত হয় ও ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত সেখানে বসবাস করে। পরবর্তীতে তাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তাদেরকে চংরাছড়িতে একত্রিত করা হয়। এ সুযোগে উপজাতিরা (বিশেষতঃ চাকমা) লেমুছড়িতে তাদের অবস্থান সুসংহত করে এবং আশেপাশের চাষাবাদের জমির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। সূত্রমতে ২০০২ সালে উক্ত বাঙ্গালীরা মাননীয় সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে তাদের হারানো জায়গা-জমি ফেরত পাবার জন্য আবেদন জানালে তিনি তাদেরকে ন্যায় বিচারের আশ্বাস দেন। অথচ এর অব্যবহিত পরে কোন প্রকার নির্দেশ বা পূর্বাভাষ ব্যতিরেকে জনৈক আবুল কালামের নেতৃত্বে বাঙালীরা বিতর্কিত স্থানে প্রায় ১০০ ঘর তৈরি করে। স্থানীয় প্রশাসনের তড়িৎ হস্তক্ষেপে অবশ্য উত্তোলিত ঘরসমূহ ভেংগে ফেলা হয় ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা হয়। ধারনা করা হয় যে, বাবুপাড়ায় অগ্নিকান্ডের সুবাদে চংরাছড়ির সুযোগ সন্ধানী বাঙালীরা একযোগে লেমুছড়ির চাকমা বাড়িঘরগুলি পুড়িয়ে দেয়।

অগ্নিকান্ড পরবর্তী ঘটনাবলী

অগ্নিকান্ডের পর থেকে অদ্যাবধি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনগণের সাহায্যার্থে ও নিরাপত্তা বিধানে সার্বক্ষণিকভাবে অফিসারের নেতৃত্বে সেনাসদস্যগণ মোতায়েন ছিল। জোন সদর কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে ২,০০০/- টাকা করে তাৎক্ষণিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও ক্ষতিগ্রস্থদের প্রথম ২/৩ দিন নিজেদের তৈরিকৃত খাবার, চাউল, ডাল, বসবাসের জন্য তাঁবু, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পরিধেয় বস্ত্র, সার্বক্ষণিকভাবে চিকিৎসা সহায়তা (জীবন রক্ষাকারী দামি ঔষধপত্র ক্রয়সহ), অর্থসহ উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা, ছাত্রছাত্রী বিশেষ করে বিভিন্ন পরীক্ষার্থীদেরকে নতুন বইপত্র, ঘর তৈরির জন্য টিন, কিয়াং ঘর/মন্দিরের জন্য মুর্তি ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। মোট কথা স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে

www.pathagar.com

ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সার্বক্ষণিকভাবে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। রিজিয়ন কমান্ডারও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে দু'এক হাজার টাকা করে বিতরণ করেন।

মাননীয় সংসদ সদস্য ও সেনাবাহিনীর উর্ধতন কর্মকর্তারা একাধিকবার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। এছাড়াও মাননীয় জিওসি কিয়াংঘর, মন্দির, ঘরের জন্য টিন, মুর্তি ইত্যাদি প্রদান করেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহনির্মাণ বাবদ ৩০,০০,০০০/- টাকা সাহায্য প্রদান করেন। জিওসি মহোদয়ের অনুরোধক্রমে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট এর মাননীয় চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অবঃ) জেড এ খান আইএফআরসি দলের প্রধান মিঃ টনি মরিয়মসহ দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিপুল ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। চেয়ারম্যান ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৫০ মেট্রিক টন চাউল প্রদানের কথাও ঘোষণা করেন।

উর্দ্ধতন সেনা কর্মকর্তাগণ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপ মন্ত্রী জনাব মনি স্বপন দেওয়ানের নেতৃত্বে সংসদীয় কমিটি দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এছাড়াও বিরোধী দলীয় উপনেতা জনাব এ্যাডভোকেট আবদুল হামিদের সেতৃত্বে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যগণও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে বিভিন্ন বক্তব্য রাখেন। সন্তু লারমা দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পূর্বেই অহেতুক সেনাবাহিনী তথা সরকারকে বিভিন্নভাবে দোষারোপ করেন এবং ঘটনাটিকে তাদের পক্ষে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেন। পরিশেষে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে সামান্য ত্রাণ সামগ্রী এবং গৃহনির্মাণের জন্য খুঁটি ও বাঁশ দেন। এছাড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রথমতঃ মোমবাতি ও দিয়াশলাই প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীতে চাউল, ডাল ও টাকা-পয়সা প্রদান করা হয়। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন এলাকার জন সাধারণ ও সংস্থার পক্ষ থেকেই ক্ষতিগ্রস্তদেরকে বিভিন্ন ধরণের ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়। মাননীয় আইজিপি ও চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ঝটিকা সফর করেন, তবে তারা কোন ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করেননি। এছাড়া ০৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে ইউপিডিএফ ও তাদের অংগ সংগঠন সমূহ থলিপাড়ায় এক সমাবেশের আয়োজন করে সেনাবাহিনী ও সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য রাখে।

মহালছড়িতে গত ২৬ আগষ্ট ২০০৩ তারিখে সংঘটিত অগ্নিকান্ডের ঘটনা কভার দেয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মিডিয়া বিশেষ করে বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক, টিভি, বিভিন্ন সংগঠনের ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গমন করেন। তারা উপজাতি নারী-পুরুষের সাথে গোপনে ও প্রকাশ্যে কথাবার্তা বলেন, স্থির ও ভিডিও চিত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু তারা নিরাপত্তা বাহিনী, প্রশাসন ও বাঙালীদের সাথে তেমন একটা যোগাযোগ করেননি। তবে নিরাপত্তা বাহিনী বিশেষ করে সেনা সদস্যদের

www.pathagar.com

কাছে মাঝে মাঝে কিছু উস্কানীমূলক ও উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন ছুড়েন যা বেশ আপত্তিজনক ছিল। শুধুমাত্র স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক সরকারের জবাবদিহিতার কথা বিবেচনাপূর্বক সেনা সদস্যগণ এসব প্রসঙ্গে ধৈর্য ধারণ করেন ও বিড়ম্বনা এড়িয়ে গেছেন। তা সত্ত্বেও প্রায়শঃ বিভিন্ন দৈনিকে উস্কানীমূলক, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও একপেশে সংবাদ প্রকাশিত হয়। ভাবখানা এ রকম যেন 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'। পার্বত্যাঞ্চলের সংঘটিত যে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য তার সত্যতা উদঘাটনের পূর্বেই মিডিয়া কর্তৃক সেনাবাহিনীকে দায়ী করা হবে কে? শান্তি চুক্তির পর অন্ততঃ এটা আশা করা যায় না। সেনাবাহিনী প্রতিটি সরকারের আমলেই বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে দেশবাসীর কাছ থেকে যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন করেছে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অঙ্গণেও সুনাম কুড়িয়েছে। আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনী দেশের সম্পদ। অথচ পার্বত্যাঞ্চলে সেনাবাহিনীর কর্মকান্ড কেন এত সমালোচনামুখর হবে? যে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি পার্বত্যাঞ্চলে নিরাপত্তার খাতিরে প্রতিটি সরকারই অনুভব করেছে, সে সেনাবাহিনীকে সন্ত্র লারমা ও স্বার্থান্বেষী মহল কেন প্রত্যাহার করতে বলে? বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের মিডিয়াগুলোর কয়েকটির মধ্যে কোন সমন্বয় আছে কিনা বা দেশপ্রেমিক মনোভাব কাজ করে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। নতুবা তারা কেন কোন সুনির্দিষ্ট মহলের হয়ে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করবে। উল্লেখ্য, গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের সভাপতি সুমনালংকার মহাথেরোর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মেজবাহ কামালের নেতৃত্বে ২০ সদস্যের একটি দল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মহালছড়ির ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। যতদুর জানা যায়, আর্কিমিডিস চেয়ারম্যানের সার্বিক আয়োজনে উক্ত দলটিকে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক বিশেষ বিশেষ স্থানে ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাতের জন্য নেয়া হয়। উক্ত দলটি সেনা কর্মকর্তা ও সেনাসদস্যদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে এবং বিভিন্ন উস্কানীমূলক ও আপত্তিকর প্রশ্ন করে। পরবর্তীতে আবার তারা কিছু কিছু পত্রিকায় মনগড়া ও একপেশে খবর প্রকাশ করে, যা নিতান্তই দুঃখজনক। আরও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এসবের প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেই। এহেন পরিস্থিতিতে যে কোন সচেতন নাগরিকেরই বিবেকে নাড়া দেয়ার বা জাতীয় স্বার্থে আঘাত লাগার কথা। কারন দেশের প্রতিটি অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা দরকার। জনগণকে বিভ্রান্তির মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি কোন দেশপ্রেমিকের কাজ হতে পারে না।

বর্তমান পরিস্থিতি

উপজাতি স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদল (জেএসএস/ইউপিডিএফ) কর্তৃক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে সংগঠিত অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিঃসন্দেহে বেশ ব্যাপক। আর তার খেসারত যদিও অনেকটা সরকারকেই দিতে

www.pathagar.com

হচ্ছে। তথাপি সেনাবাহিনী যেহেতু সার্বক্ষণিকভাবে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে, তাই এর খেসারত সরেজমিনে তাদেরকেই দিতে হচ্ছে বেশি। এ জন্য অবশ্য কারও কোন আক্ষেপ নেই, কারণ একটি সুশৃংখল সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের মধ্যে ঐ বোধশক্তিটুকু রয়েছে যে, যখন যেখানে যেভাবে আদেশ দেয়া হয়, সেভাবেই দেশ ও জনগণের কল্যাণে আদেশ পালন করা হবে। এর কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। তাই প্রাথমিক ধাক্কা সামলাতে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশাপাশি সেনাসদস্যদের কম বেগ পেতে হয়নি। শত সীমাবদ্ধতা ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও সার্বক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অফিসারগণের নেতৃত্বে অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা পুনরায় তাদের নতুন জীবন শুরু করার উৎসাহ ও সাহস পায়। সরকারের অর্থায়নে সেনাবাহিনীর সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে সকলের জন্য ঘর। অপরদিকে, বিভিন্ন ধারার রাজনৈতিক অঞ্চল হিসেবে সেখানে প্রায়শঃ বিভিন্ন বক্তৃতা, সমাবেশ, মিছিল প্রভৃতি কর্মসূচি চলছে। এ সকল কর্মসূচি মূলতঃ ইউপিডিএফ, জেএসএস, তাদের অঙ্গ-সংগঠনসমূহ, চারদলীয় ঐক্যজোটের নেতা-কর্মীরা পালন করছে। তবে এ পর্যন্ত এ ধরনের কর্মসূচির ফলে কোন ধরনের সহিংসতা বা হানাহানির ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

সম্প্রতি মহালছড়িতে পর্যায়ক্রমে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করলে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। কেউ কেউ হয়তবা এর দ্বিমত পোষণ করতে পারেন, তবে আশা করি অনেকেই একমত পোষণ করবেন। যাহোক, এ সকল তথ্য বা মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১। ইউপিডিএফ এর চাঁদা সংগ্রহকে কেন্দ্র করেই মূলতঃ ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে। তাদের চাঁদাবাজিকে কোন মহলই সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। চাঁদাবাজির উপর নির্ভর করেই তারা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী ও সংগঠিত হচ্ছে এবং আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করতে সমর্থ হচ্ছে। শান্তি চুক্তির পর থেকেই এ দলটি পার্বত্যাঞ্চলে অশান্ত পরিস্থিতি জিইয়ে রেখেছে, যা প্রকারান্তরে নিরাপত্তা বাহিনী তথা সরকারের ঘাড়েই চাপানো হয়ে আসছে।

২। বাবুপাড়া ও চেয়ারম্যান পাড়া তুলনামূলকভাবে আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে উন্নত। তদুপরি তারা যেহেতু সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করে এবং ইউপিডিএফ ও তাদের সশস্ত্র কর্মকান্ডকে সমর্থন দিয়ে থাকে, তাই স্বভাবতঃই বণিক সমিতি তথা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন তাদেরকে সমকক্ষ কিংবা প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। এছাড়া চাঁদাবাজির কারণে তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের ফলে তারা সম্ভবতঃ

www.pathagar.com

প্রতিশোধপরায়ণ থাকায় এ ধরনের নাশকতামূলক কর্মকান্ড সংঘটিত হওয়ায় সহায়ক হয়েছে।

৩। ইউপিডিএফ কর্তৃক রূপন মহাজনকে অপহরণ, পাঁচ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি ও বাঙালীদের উপর গুলিবর্ষণ করা থেকে বাঙালীদেরকে হত্যার গুজব উঠে, এ সকল কারণ থেকেই বাঙালীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে পরবর্তীতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। ইউপিডিএফ যদি প্রথমে এহেন কর্মকান্ড না চালাতো তা হলে হয়ত অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটার কোন পরিস্থিতি হতো না। তাই প্রাথমিকভাবে ইউপিডিএফকে দায়ী করা হলে অত্যুক্তি হবে না।

৪। জেএসএস নেতা প্রজ্ঞান খীসার পিতা প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিনোদ খীসা (যিনি ঘটনার দিন সহিংসতায় নিহত হন) দু'টি বিবাহ করেন। প্রজ্ঞান খীসা প্রথম স্ত্রীর ঘরের সন্তান হওয়ায় তিনি তার পিতার দ্বিতীয় বিয়েকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। বিনোদ বিহারীর দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরের মেয়েকে হিন্দু রূপন মহাজনের চাচাতো ভাই পালিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেও এতে তিনি তেমন কোন প্রতিবাদ না করায় স্বভাবতঃই উপজাতি চাকমারা বিশেষ করে ইউপিডিএফ এর লোকজন তার উপর বেশ ক্ষিপ্ত ছিল। তারা রূপন মহাজনকে উক্ত বিয়েতে সহায়তার জন্য বিনোদ বিহারীকে দিয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা করতে বাধ্য করে। জানা যায়, উক্ত কারণে রূপন মহাজন অপহৃত হয়ে থাকতে পারে এবং বিনোদ বিহারীকে উপজাতিরা ঘটনার সময় হত্যা করে থাকতে পারে। এ বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি হলো, বিনোদ বিহারী নিহত হওয়ার তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও কেউ তার মৃতদেহ গ্রহণ করেনি। অবশেষে জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় তার সৎকার কার্য সম্পন্ন করা হয়।

৫। মহালছড়ি থানার ওসি ও ইউএনও ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেও স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বরং তারা পরিস্থিতি অনুধাবনপূর্বক ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়েন। বিষয়টি অবাক করার মতই এবং এ থেকে অনেক প্রশ্নের জন্ম নেয়াটাই স্বাভাবিক। বিষয়টি দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

৬। অপহরণ, মুক্তিপণ দাবি, সভা-সমাবেশ, অবরোধ ইত্যাদি কর্মকান্ড সংঘটিত হওয়ার পরও জেলা প্রশাসন বা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি অগ্নিকান্ড সাধিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ মহালছড়ি পরিদর্শন করলে হয়ত পরিস্থিতি মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা যেমন ১৪৪ ধারা জারি করতঃ পরিস্থিতি শান্ত বা প্রশাসনের অনুকূলে রাখা সম্ভব হতো।

www.pathagar.com

৭। স্থানীয় সকল নেতৃবৃন্দও এহেন সহিংস ঘটনা নিরসনের কোন উদ্যেগ গ্রহণ করেননি। অথচ স্থানীয়, জাতীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও দেখা গিয়েছে যে, দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের কার্যকরী পদক্ষেপের ফলে এর চেয়ে আরও অনেক জটিল বা গুরুতর সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

৮। আপাতঃ দৃষ্টিতে বাবুপাড়া ও লেমুছড়ির অগ্নিকান্ডের ঘটনা একই কারণে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, বাবুপাড়ায় অগ্নিকান্ডের সুবাদে আরেকটি সুযোগ সন্ধানী মহল পূর্ব শত্রুতার জের ধরে লেমুছড়িতে অগ্নিকান্ড ঘটিয়েছে বলেই অধিকতর যুক্তিসংগত মনে হয়।

৯। সেনা টহল দল যেভাবে থলিপাড়াবাসীকে ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা করেছে তা স্বয়ং উপজাতি মহলও প্রশংসা করেছে। একইভাবে হয়ত সেনা টহল দ্বারা বাবুপাড়াকে রক্ষা করা যেত। কিন্তু সেক্ষেত্রে ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীর ফায়ারে অনেক উপজাতি, অউপজাতি ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের প্রাণহানি ঘটতে পারত এবং ইস্যুটিকে আরও গুরুতর ও ভয়াবহ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হতো। তাছাড়া যে ভাবে অগ্নিকান্ড সাধিত হয়েছে, তা সকলেরই ধারনার বাইরে ছিল।

১০।যে কোন দায়িত্বশীল মিডিয়ারই কাজ হলো বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করা। অপরিপক্ক, অপেশাদার, বিবেকবর্জিত, পক্ষপাতমূলক ও সর্বোপরি হলুদ সাংবাদিকতার কারণে অনেক নামি-দামি সংবাদপত্রের সুনাম খর্ব হওয়াটা কারও কাম্য নয়। কোন স্বার্থান্বেষী মহলের আমন্ত্রণে একপেশে রিপোর্টিং এর ফলে যেমন একজন সাংবাদিকের প্রতি পাঠকের আস্থা নষ্ট হতে পারে, একইভাবে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রেরও গ্রহণযোগ্যতা কমে যাওয়াটা স্বাভাবিক। তাই এ সকল বিবেকহীন ও স্বার্থান্বেষী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা গেলে হয়ত ভবিষ্যতে আমরা আরও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের আশা করতে পারব।

ভবিষ্যতে সকলের করণীয়

মহালছড়ির সাম্প্রতিককালের সংঘটিত ঘটনাসমূহের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে জন্য নিরাপত্তা বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক দলসমূহ ও স্থানীয় সকল সম্প্রদায়ের জনগণের সর্বোচ্চ আন্তরিকতা, ধৈর্য, সহনশীলতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ, সেখানকার পরিস্থিতি শান্ত বা অনুকূলে থাকলে সকলেই লাভবান হবে বলে আশা রাখি। তবে একটি স্বার্থান্বেষী ও কুচক্রী মহল পরিস্থিতি যাতে শান্ত না থাকে সে জন্য সর্বদাই প্রচেষ্টা চালাতে পারে, এ জন্য নিম্নের প্রস্তাবনাসমূহের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা যেতে পারে :

www.pathagar.com

১। ইউপিডিএফ বা কোন সশস্ত্র দল যাতে কোন অউপজাতি বসতি, নিরাপত্তা বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন, সামরিক/বেসামরিক যানবাহন ইত্যাদির উপর কোন নাশকতামূলক কর্মকান্ড চালাতে না পারে বা কোন অপহরণের ঘটনা ঘটাতে না পারে, সে জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

২। কোন ধরনের সহিংস ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে জন্য নিরাপত্তা বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয় উপজাতি ও অউপজাতি নেতৃবৃন্দদের সমন্বয়ে মাঝে মাঝে সভা-সমাবেশের আয়োজন করা যেতে পারে। এতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দুরত্ব অনেকটা কমবে এবং ভুল বুঝাবুঝির অবসান হবে বলে আশা করা যায়।

৩। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার নিমিত্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দের জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনাপূর্বক স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

৪। কোন স্বার্থান্বেষী মহল যাতে সেনাবাহিনী, প্রশাসন, তথা সরকারের ভাবমুর্তি খর্ব করতে না পারে সে জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৫। আপাততঃ সকল উপজাতি জনগণের প্রতি নিরাপত্তা বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন ও সকল বাঙ্গালীদের সহানুভূতিসূচক আচরণ প্রদর্শন করা শ্রেয়। এ ছাড়া কোন উপজাতির কোন উগ্র বা নেতিবাচক আচরণে তাৎক্ষণিকভাবে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা সমীচীন হবে না বলে মনে করি।

৬। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পনর্বাসনের কাজ যাতে অনতিবিলম্বে তরান্বিত করা হয়, সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

৭। সন্দেহভাজন, বিতর্কিত বা নিজ দায়িত্বে আন্তরিক নয় এমন সরকারি পর্যায়ের সকল দায়িত্বশীল কর্মকর্তাবৃন্দের গতিবিধি বা কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতঃ তাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৮। শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের দিকে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আরও নজর দেয়া যেতে পারে। যে সকল ছোট খাট দাবি-দাওয়া বাস্তবায়ন করলে আপাততঃ কোন সমস্যা দেখা দিবে না, সেগুলি বাস্তবায়ন করলে হয়ত উপজাতি নেতৃবৃন্দের আন্দোলন অনেকটা স্থিমিত হয়ে পড়বে বলে আশা করা যায়।

৯। সংবাদপত্রের অপপ্রচার বন্ধ করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

মহালছড়ির পরিস্থিতি পার্বত্যাঞ্চলের অন্যান্য এলাকা থেকে কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। গত ১৯ এপ্রিল ২০০৩ তারিখেও খাগড়াছড়ির ভূয়াছড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। এছাড়া শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে পাহাড়ে এর চেয়ে আরও

www.pathagar.com

অনেক ভয়াবহ, নৃশংস ও নাশকতামূলক ঘটনা ঘটেছে। তবে এটা ঠিক যে, শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে এ ধরনের ঘটনা কারও কাম্য নয়। কারণ, স্যাটেলাইটের কল্যাণে বিশ্ব এখন অনেক অনেক দুরে এগিয়ে গেছে। আর তাই পার্বত্যাঞ্চলকে দেশের অন্যান্য জনপদ থেকে আলাদা করার বা পিছে ফেলে রাখার কোন অবকাশ নেই। আমাদের পার্বত্যাঞ্চলে এখন আর কোন ইন্সারজেন্সী সমস্যা নেই বলে জানি, কিন্তু সন্ত্রাসীদের কর্মকান্ড রয়েই গেছে, যা দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও কম বেশি বিরাজমান। আর তাই পার্বত্যাঞ্চলের সকল অশান্তি বা অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দায়ভার কোনভাবেই সেনাবাহিনীর উপর বর্তানো যুক্তিসঙ্গত নয়। আইন-শৃংখলা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পার্বত্য সকল জেলায় বেসামরিক ও পুলিশ প্রশাসন রয়েছে, তারা যদি তাদের দায়িত্ব পালনে কোন প্রকার শিথিলতা বা গাফিলতি প্রদর্শন করে বা ব্যর্থ হয়, সে জন্য তার দায়ভার তাদেরকেই বহন করতে হবে। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে কখনই যেন অনাকাংখিতভাবে জড়ানো না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

পাহাড়ে বসবাসকারী উপজাতি ও অউপজাতি উভয় জনগোষ্ঠির ন্যায়সংগত অধিকার বা সামাজিক মর্যাদা সমানভাবেই দেখা প্রয়োজন। কারণ, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে এ অঞ্চলে সকল সম্প্রদায়েরই সমান অধিকার রয়েছে। এছাড়া কোন স্বার্থান্বেষী মহল ভবিষ্যতে যাতে মহালছড়ির মত সহিংস ঘটনার সূত্রপাত ঘটাতে না পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকেই সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আমরা আশা করব ও প্রার্থনা করব, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো যেন অচিরেই তাদের এ দুঃসময় কাটিয়ে উঠতে পারে এবং নতুন আলোর প্রত্যাশায় তাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা শুরু করতে পারে। আর সে কাজটি যাতে সহজতর হয়, সেজন্য সেনাসদস্যরা তাদের সাথে একযোগে কাজ করতে কখনও পিছ পা হবে না বলে আশা রাখি। একইভাবে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-দলমত নির্বিশেষে সকলকেই এ গুরু দায়িত্ব পালনে ঐকান্তিক সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে হবে। তাহলেই মহালছড়ি, এমনকি পাহাড়ের সর্বত্রই প্রকৃত শান্তির সুবাতাস বইবে।

www.pathagar.com

দলীয় সংঘাতে জর্জরিত পার্বত্যাঞ্চল

পার্বত্য জেলা সমূহে বর্তমানে অপেক্ষাকৃত অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার মত বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত এবং যুবকদের মাঝে জাতিগত দুরত্ব, অসন্তোষ এবং একে অপরের উপর সন্দেহের বিষয়টি অনেকাংশে কমে আসতে শুরু করেছে। শান্তি প্রিয় সাধারণ উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় পার্বত্যবাসীরা উন্নয়নের জন্য বৈধ্য দাবি এবং কর্মপন্থাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। সুষ্ঠু ধারার এ ধরনের মনোভাব সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। ধীরে ধীরে সাধারণ পার্বত্যবাসী কর্মউদ্দীপনার পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। বেশিরভাগ জনগোষ্ঠী শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে আগ্রহী থাকলেও কিছু সংখ্যক তথাকথিত ব্যতিক্রম আদর্শে উজ্জীবিত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ সাধারণ এবং ছোটখাট সামাজিক ঘটনাগুলোকে জাতিগত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে। একই সাথে তারা জনসাধারণের সামনে স্বচ্ছ রাজনীতির কথা বলে থাকলেও অন্তরালে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মদদ দিয়ে থাকে।

সাধারণ পার্বত্যবাসীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য আরও অধিক প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা উচিৎ বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। পার্বত্য জেলাগুলোর অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের মাঝে এখনো মৌলিক চাহিদার সবকটি উপাদান অনুপস্থিত। এই চাহিদা গুলোর সর্বোচ্চ খাত খাদ্য এবং চিকিৎসা সেবার রয়েছে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি। তবে বিরাজমান শান্ত পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের মাঝে সরকারের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আস্থা অর্জন করেছে বলে অনেকে দাবি করেছেন। এই ধারাকে ধরে রাখার জন্য পার্বত্য এলাকার যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনে এর স্পর্শকাতরতার ব্যাপারগুলো বাস্তব অবস্থার আলোকে মূল্যায়ন এবং গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া বাঞ্চনীয়। তবে অত্র অঞ্চলে বসবাসরত বেশিরভাগ জনগোষ্ঠীর মতামত নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান সমস্যার সমাধান এবং সুষ্ঠু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা উচিৎ হবে বলে অনেকে মত পোষণ করেছেন।

পার্বত্য অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষি শীর্ষ নেতাদের অধিকাংশই দলমত নির্বিশেষে সকলের কল্যাণে সহনশীল উদার যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং সকলের স্বার্থরক্ষার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। একই সাথে জাতিগত দূরত্ব কমিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। উল্লেখিত ধারাকে বর্তমান সরকার বিশেষ প্রক্রিয়ায়

www.pathagar.com

গুরুত্বসহকারে অব্যাহত রাখলে এবং সঠিকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরলে মানুষ পথভ্রষ্ট তথাকথিত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অনৈতিক চক্রান্তে বিভ্রান্ত হবেনা। একই সাথে কিছু সংখ্যক কতিপয় উপজাতীয় শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের গুরুত্বকে অক্ষুন্ন রাখতে পার্বত্য পরিস্থিতিকে জটিল করতে সদা তৎপর রয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম ও পারস্পরিক সম্পর্ক

জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াত ইসলামী এবং অন্যান্য সংগঠন গুলো সুষ্ঠু ধারার রাজনীতি চর্চা করছে। আঞ্চলিক দু'টি প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন কর্তৃত্ব ও অধিকারের প্রশ্ন তুলে জন অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন জনসভা, সেমিনার ও রুদ্ধদ্বার বৈঠকের আয়োজন করছে। দল দু'টি যথাক্রমে জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) ও ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) জন সমক্ষে সুষ্ঠু ধারার রাজনীতির কথা বললেও অন্তরালে নিজস্ব সশস্ত্র সন্ত্রাসী লালন এবং পরিচালনা করে থাকে। একই সাথে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপে কখনও কখনও দল দু'টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের স্বক্রিয় উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়।

জেএসএস ও ইউপিডিএফ পরস্পর বিরোধী অবস্থানে কঠোরভাবে স্বক্রিয় এবং আক্রমণমূখী। আঞ্চলিক এই রাজনৈতিক সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ চাকমা সম্প্রদায়ভূক্ত। তবে বর্তমানে অনেক উপজাতীয় পরিবারের সদস্যরা আওয়ামী লীগ, বিএনপি অন্যান্য জাতীয় রাজনৈতিক দলের সমর্থক। তবে সাধারণ উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পার্বত্য বাঙালী অধিবাসীদের অনেক পরিবার আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংগঠন এবং সমর্থকদের চাপের মুখে রয়েছে। এ দলগুলোর সন্ত্রাসী ও সহিংস কর্মকান্ড এবং ভয় প্রদর্শনের স্বক্রিয় প্রভাব থেকে সাধারণ জুম চাষী থেকে শুরু করে কাঠ ব্যবসায়ীরা কেউ রেহাই পায় না। এছাড়াও অপেক্ষাকৃত বিত্তশালীরা অনোন্যপায় হয়ে নিয়মিত চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন ব্যবসা কার্যক্রমকে পরিচালনা করছে।

উল্লেখ্য যে, জেএসএস ও ইউপিডিএফ পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নিজস্ব কর্মী দ্বারা প্রতিরোধ এবং সশস্ত্র কার্যক্রম ছাড়াও স্বনিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে বিরোধীদের উচ্ছেদ এবং নিজ অনুসারীদের স্থানান্তরের মাধ্যমে বসতি স্থাপনের মতো ঘটনাও ঘটেছে বলে জানা যায়। জেএসএস পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং ইউপিডিএফ চুক্তির বিরোধী অবস্থানে থেকে পূর্ণ স্বায়তশাসন দাবি করেছে। তবে তারা যে আদর্শের কথাই বলুক না কেন, প্রত্যেক সংগঠনই নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির আবরণে সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলে দু'টি সংগঠনই আধিপত্য বিস্তারে

www.pathagar.com

নিরবিচ্ছিন্নভাবে তৎপর রয়েছে। দু'টি সংগঠনই বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং বনজ সম্পদ পরিবহনকারীদের থেকেও জোর করে চাঁদা আদায় করে থাকে। জেএসএস এবং ইউপিডিএফ তাদের নিজস্ব আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে পরস্পর বিরোধী সশস্ত্র সংঘাতমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। দু'টি দলেরই রয়েছে আদর্শগত দ্বন্দ্ব। ইউপিডিএফ জাতীয় রাজনৈতিক ধারায় বিশ্বাসী হলেও, জেএসএস সাম্প্রতিক কালে তাদের কর্মকান্ডকে অগণতান্ত্রিক এবং একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন ছাড়া অন্য কিছুই বিবেচনায় আনেনি।

জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রধান আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসেবে চুক্তির পক্ষে আন্দোলন করছে। দলের সংগঠকরা দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার পাশাপাশি এবং সাধারণ জনগণকেও উদ্বুদ্ধ করছে। তবে জেএসএস এর অনেক সুবিধা বঞ্চিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েছেন। পাশাপাশি অনেকে প্রত্যক্ষভাবে অসন্তোষ এবং ক্ষোভ ও প্রকাশ করেছেন। এমতাবস্থায় নেতৃত্বের এই টানাপোড়েনে দলের অনেক সদস্যরাই এখন বিপথগামী। তবে জেএসএস অত্র অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে তাদের রাজনৈতিক শাখা স্থাপনের পাশাপাশি কর্মী ও সংগঠক নিয়োগ করেছে। একই সাথে তাদের দাবি-দাওয়া বাস্তবায়নের জন্য যানবাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য, এনজিও এবং সামাজিক কর্তৃত্ব থেকে শুরু করে সব কটি সেক্টরে শাখা স্থাপন করেছে। দলটি পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে নিজস্ব সশস্ত্র ক্যাডার রাখার পাশাপাশি গোপন আস্তানা থেকে তাদেরকে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকান্ডও পরিচালনা করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প, কাঠ ও পণ্য পরিবহন সমূহ এবং গ্রামভিত্তিক মোটা অংকের চাঁদা আদায় করে থাকে একই সাথে অত্র অঞ্চলের পরিস্থিতিকে অস্বাভাবিক করে তুলতে এই দলের মতাদর্শে বিশ্বাসী কিছু সংখ্যক লোভী প্রভাবশালী সদস্যরাও অনেক সাধারণ ঘটনাকে উপজীব্য করে জাতিগত দাংগার মত মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারকে নাজুক পরিস্থিতিতে ফেলার অপ প্রয়াসে তৎপর রয়েছে।

জেএসএস এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বাম রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। এ সকল ব্যক্তিবর্গের সাথে বিভিন্ন বৈদেশিক এনজিও, মানবাধিকার সংগঠন এবং মিশনের সাথে সুসম্পর্ক রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সম্পর্ককে তারা সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যতিক্রমধর্মী দিকটিকে আলোক পাতের অপপ্রচারণার মাধ্যমে প্রশাসনকে নাজুক অবস্থায় ফেলার চেষ্টা করছে। এছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এ বিভিন্ন প্রচারনার মাধ্যমে জন মত আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছে। তবে চুক্তি বিরোধী পক্ষ নির্যাতিত বাংলা ভাষী আদি বাঙালী

www.pathagar.com

মুসলিম ব্যতিত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যেমন বৌদ্ধ, হিন্দুদের স্বপক্ষে নিতে নানা কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা সংখ্যালঘুদের বুঝিয়ে সুবিধা দেওয়ার আশ্বাসে আদি বাঙালীদের বিভক্ত করার প্রচেষ্টায় তৎপর রয়েছে। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জেএসএস রাজনৈতিক শক্তি বিস্তৃত করতে গত কয়েকমাস থেকে সাংগঠনিক তৎপরতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করেছে। গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে জনসংহতি সমিতি নির্বাচন বর্জনের কথা বললেও গোপনে স্বতন্ত্র দল হিসেবে নিজস্ব নেতা কর্মীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। গ্রাম পর্যায়ে জেএসএস তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা সমূহে নিজস্ব প্রার্থীর পক্ষে জোরালো সমর্থন দিয়েছিল এবং প্রতিপক্ষ দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধেও শক্ত অবস্থানে ছিল। বিভিন্ন সময়ে দলটি সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা মূখর ইস্যু সৃষ্টির অপকৌশলে যুক্ত থাকলেও সাধারণ জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়নি। তবে গত ইউপি নির্বাচনে বিরোধীতার আবরণে পরোক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে জেএসএস তাদের জনপ্রিয়তা যাচাই করেছে। এই ফলাফলের উপর ভিত্তি করে চতুর এই রাজনৈতিক দলটি তাদের ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং দলীয় শক্তি বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

জেএসএস সরকার বিরোধী দলগুলো এবং অঙ্গ সংগঠনগুলোকে পরোক্ষ ভাবে মদদ দিচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রধান একটি দলের স্থানীয় কমিটিগুলো জেএসএস সমর্থিত নেতা-কর্মীদেরকে দিয়ে গঠন করা হচ্ছে। এতে করে ভবিষ্যতে জেএসএস সেই প্রধান রাজনৈতিক দলটির সহায়তায় তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দলটি উদ্বাস্তদের পূনর্বাসন ও ভোটার তালিকায় সংযুক্ত করার অজুহাতে প্রতিবেশী দেশে (অরুণাচল, মিজোরাম, ত্রিপুরা) বসবাসরত চাকমা সম্প্রদায়ের সদস্যদের পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে তাদের সমর্থক বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করছে। এতে করে জেএসএস সংখ্যাধিক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করবে। বর্তমান সরকার বিরোধী আন্দোলন বা ইস্যুতে জেএসএস বিরোধীদল বিশেষ করে প্রধান সেই দলটির সাথে একযোগে তাদের আন্দোলন এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারে।

জেএসএস অত্র অঞ্চলে অন্য কোন সংগঠনকে তাদের সমকক্ষ রাজনৈতিক দল হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতি নয়। বর্তমান নেতৃত্বে অন্য কারও হস্তক্ষেপকে তারা মেনে নিতে চায় না। দলটি অত্র অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে গণতান্ত্রিক চর্চা নয় বরং কর্তৃত্ব ভিত্তিক নেতৃত্বের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসের অধিকারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পাহাড়ীদেরকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। দলটির নীতি নির্ধারকরা শান্তি চুক্তির সমসাময়িক কালে এবং চুক্তির পর

www.pathagar.com

ভারত থেকে প্রত্যাগত চাকমাদেরকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বাঙালী অধ্যুষিত বিভিন্ন বন্দোবস্তীকৃত এলাকায় কৌশলে পুনর্বাসিত করে ফলশ্রুতিতে পাহাড়ী ও বাঙালীদের মধ্যে জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ স্থায়ীভাবে জিইয়ে রাখে।

ইউপিডিএফ

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফ আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসেবে অতি সম্প্রতি বিশেষ করে গত সংসদ নির্বাচনে প্রচুর জনসমর্থন অর্জন করেছে। ১৯৯৭ সনের পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের বিরোধীতা এবং সেই সাথে পূর্নস্বায়ত্বশাসনের দাবি নিয়ে এই দলটি তরুণ পাহাড়ী প্রজন্ম এবং পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর কাছে একটি আদর্শ দল হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছে। বেশ কিছু পাহাড়ী বুদ্ধিজীবি যারা এই নীতিতে বিশ্বাসী তারা ইউপিডিএফ এর আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করে। তারা মনে করে যে, জেএসএস এর পৌঢ় এবং সংস্কারহীন নেতৃত্ব তাদের অধিকার যতটুকু এনে দিতে পেরেছে ইউপিডিএফ এর প্রগতিশীল আন্দোলনের ক্ষেত্রে বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হবে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশ কিছু অঞ্চল নির্দিষ্টভাবে ইউপিডিএফ এর সমর্থনপুষ্ট এবং আধিপত্য বিস্তারকৃত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

ইউপিডিএফ নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক রাজনীতির পাশাপাশি সশস্ত্র কার্যক্রম চালিয়ে থাকে তবে কখনই তারা এর দায়-দায়িত্ব স্বীকার করেনি। ইউপিডিএফ তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল সমূহে সাধারণতঃ ভিন্ন অঞ্চলের নেতা কর্মীদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। যদিও এর উপযুক্ত কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি তবুও ভিন্ন এলাকার যুবকদের স্থানীয় অধিবাসীরা সমীহের চোখে দেখবে এবং অবৈধ চাঁদা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে নম্র মনোভাব পোষণ করবে না বিধায় এরকম নিয়োগ দেয়া হতে পারে।

বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে শান্তি চুক্তির আগে যেসব প্রত্যন্ত পাহাড়ী এলাকা জেএসএস এবং তথা কথিত শান্তি বাহিনীর দখলে ছিল ইউপিডিএফ শান্তিবাহিনীর ছেড়ে আসা কিংবা অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থানগুলো নিজেদের আয়ত্বে নিয়েছে। দূর্গম কিছু কিছু এলাকায় তাদের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গুপ্তাশ্রয় থাকার তথ্যও বহুল প্রচলিত। ইউপিডিএফ মূলতঃ জেএসএস এর প্রতিপক্ষ হিসেবে কাজ করছে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা জেএসএস এর ব্যর্থতার বিষয়কে ইস্যু করে তৃণমূল পর্যায়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে জনসমর্থন গড়ে তুলছে।

ইউপিডিএফ নেতা কর্মীরা নিজেদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সকল ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য, উন্নয়ন প্রকল্প, কাঠ ব্যবসায়ী এবং পরিবহন মাধ্যম থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায় করে থাকে। এছাড়াও ব্যবসায়ীরা অপহৃত হবার ভয়ে চাঁদা দিতে বাধ্য

www.pathagar.com

হচ্ছে। ইউপিডিএফ বাঙালীদের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান বিরোধীতা পূর্ণ হলেও এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কোন নাশকতামূলক কার্যকলাপ তারা এখনও পরিচালিত করেনি। বেশিরভাগ স্কুল-কলেজের উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা ইউপিডিএফ এর একান্ত সমর্থক। বেশিরভাগ শিক্ষিত যুবক যুবতীদের মাঝে তাদের সমর্থন লক্ষ্যণীয় তবে তারা বেশির ভাগই চাকমা সম্প্রদায়ভূক্ত।

ইউপিডিএফ দলটিকে রাজনৈতিক মোকাবেলার উপযোগী করে তুলতে মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক কাজ করলেও সাম্প্রতিক কালে জেএসএস সমর্থিত সশস্ত্র দলটির মোকাবেলায় কিছুটা দূর্বল অবস্থায় রয়েছে। যেসব উপজাতীয় পরিবার জেএসএস এর দ্বারা অত্যাচারীত ছিল তারা এখন ইউপিডিএফ এর মূল স্রোতধারার সাথে মিশে গেছে। একই সাথে বেশিরভাগ মুক্ত মত প্রকাশের মনোবৃত্তি সম্পন্ন প্রগতিশীল শিক্ষিত জনসাধারণ ইউপিডিএফ এর সমর্থক। ইউপিডিএফ ভবিষ্যৎ পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থী নির্বাচন, সাংগঠনিক কাজ এবং প্রেষণামূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করেছে। সশস্ত্র সংগঠনের মাধ্যমে সংঘাতমূলক নৃশংস কাজ করলেও দলটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক অবক্ষয় রোধে বেশ কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে।

জেএসএস-ইউপিডিএফ এর মূল দ্বন্দ্বের কারণ সমূহ

জনসংহতি সমিতি এবং ইউপিডিএফ এর দ্বন্দ্বের মূল কারণ হচ্ছে নেতৃত্বের জটিলতা। জেএসএস চেয়ারম্যান সন্তু লারমা পার্বত্য অঞ্চলে অন্য কাউকেই তার সমকক্ষ নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চাননা। অন্যদিকে ইউপিডিএফ নেতা প্রসিত বিকাশ খীসা বর্তমান সময়ের সবচাইতে উপযুক্ত নেতা হিসেবে নিজেকে দাবি করে থাকেন। তাছাড়া খাগড়াছড়ি জেলার পুরানো বাসিন্দারা কাপ্তাই হ্রদে ক্ষতিগ্রস্ত এবং পুনর্বাসিত জনসাধারণ সহসা নতুন করে চাকমা পরিবারের কর্তৃত্বকে মেনে নিতে চায় না। অন্য দিকে চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে দেওয়ান ও খীসা সম্প্রদায়ভূক্তরা নিজেদেরকে উচ্চ বংশীয় এবং অন্যান্য চাকমা বা লারমাদেরকে নিম্ন বংশীয় বলে মনে করে। গোত্রীয় এই দ্বন্দ্ব থেকেই দুটি দলের পৃথক মতাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, জেএসএস যে সময় গুপ্ত সশস্ত্র আন্দোলনে লিপ্ত ছিল তখন প্রসিত খীসা ঢাকা সহ সারা দেশে জেএসএস এর আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে নিয়মতান্ত্রিক কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে। এমনকি প্রসিত খীসা ১৯৯০ সালেও জেএসএস এর দাবিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে গুরুত্ববহ করার প্রয়াসে রত ছিল। কিন্তু ১৯৯২-১৯৯৬ সালে তৎকালীন সরকারের সময় জেএসএস পার্বত্য ইস্যুতে আলোচনায় বসার প্রাক্কালে প্রসিত খীসা আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে সন্তু লারমা তার এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করেনি। এ ঘটনায় প্রসিত খীসা অপমানিত বোধ করে এবং এক পর্যায়ে দলের অপেক্ষাকৃত তরুনদের মাঝে বিদ্রোহ

www.pathagar.com

শুরু হয় এবং নিজেদের মধ্যে মত বিরোধ প্রচন্ড আকারে ধারন করতে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৬২ সালে প্রসিত বিকাশ খীসার বাবা অনন্ত বিহারী খীসাই পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে এ দলটিই বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি হিসেবে আবির্ভূত হয়। উল্লেখ্য যে, কাপ্তাই হ্রদে ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে আন্দোলনের মূল ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনের স্থপতি অনন্ত বিহারী খীসাকেও তদানিন্তন সময়ে উক্ত আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। অথচ বাস্তবিক অর্থে অনন্ত বিহারী খীসাই হচ্ছেন সন্তু লারমার রাজনৈতিক দ্রষ্টা।

কাপ্তাই হ্রদে ক্ষতিগ্রস্ত চাকমা পরিবারগুলোকে খাগড়াছড়িতে বিভিন্ন এলাকায় পুনর্বাসিত করা হয়েছে। ১৯৬১ সালের আগে অত্র অঞ্চলে চাকমারা সংখ্যায় অপ্রতুল ছিল। অথচ বর্তমানে পুনবার্সিত অধিকাংশ চাকমা ব্যক্তিত্বই খাগড়াছড়িতে সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধিত্ব করছেন। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় চাকমা বা পাহাড়ী-রা তাদের দ্বারা পরিচালিত একচ্ছত্র এই নেতৃত্বকেও সহসা মেনে নিতে পারেনি। স্থানীয় এবং অস্থানীয় নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এখনও অনেকাংশে লক্ষ্য করা যায়। ফলে একই দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ অভিন্ন নয়। পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে তারা এককভাবে নির্দিষ্ট কোন সমাধানে পৌঁছাতে পারেনা।

প্রত্যাগত শরণার্থী এবং আদিবাসী সমস্যা

ত্রিপুরা সম্প্রদায়ই প্রথমে খাগড়াছড়ি এলাকায় ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এসে প্রথম দিকে বসতি গড়ে তোলে পরবর্তীতে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পরে মারমারা এখানে এসে বসতি গড়ে। চাকমা সম্প্রদায় কাপ্তাই বাঁধ নির্মানের পর ক্ষতিগ্রস্ত পূনর্বাসিত হিসেবে বসতি গড়ে। পার্বত্য অঞ্চল তখন দুর্ভেদ্য জঙ্গলাকীর্ণ ছিল বলে প্রথম দিকে কেউ বসতি স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তবে অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালী অধিবাসীদের সংখ্যাও ছিল অনেক।

সাম্প্রতিককালে ভারতের উদ্বাস্ত উপজাতীয়রা ফিরে এসে নিজ নিজ ভূমিতে আবার বসতি স্থাপন শুরু করেছে। প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের শতকরা পচানব্বই ভাগই খাগড়াছড়ি জেলার। উল্লেখ্য যে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী মনে করে মারমা সম্প্রদায় এখানে প্রত্যাগত অধিবাসী। আবার মারমা ও ত্রিপুরা যারাই এখানে আগে এসেছে তারা মনে করে হ্রদে ক্ষতিগ্রস্ত চাকমা সম্প্রদায় এখানে পুনর্বাসিত। একইভাবে চাকমা এবং ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী পুনর্বাসিত বাঙালীদেরকে শরণার্থী ছাড়া অন্য কিছুই মনে করে না। তবে ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রতি অত্র অঞ্চলের সবারই বিদ্রুপাত্মক আচরণ লক্ষনীয়। বর্তমানে খাগড়াছড়ির পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব রাঙ্গামাটি থেকে প্রত্যাগত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে চাকমা সম্প্রদায়ের কাছে রয়েছে। বস্তুতঃ গোত্রীয় কারণে সৃষ্ট এসব ক্ষোভই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি করেছে।

www.pathagar.com

তবে ইউপিডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা প্রসিত খীসা খাগড়াছড়ির নেতৃত্ব জেলার আদি বাসিন্দাদের কাছে রেখে সুষ্ঠু গণতন্ত্র চর্চার আদর্শে অনুপ্রাণিত বলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেকে মনে করে।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

১৮৬০ থেকে ১৯৭১। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সৃষ্টি থেকে শুরু করে পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন, কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং চাকমা রাজার তথাকথিত বিতর্কিত ভূমিকা এই সময়টিকে উল্লেখযোগ্য করে রেখেছে। নিম্নে ১৮৬০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হলোঃ

১। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা হয়।

২। ১৯০০ সালে হিল ট্রাক্স ম্যানুয়েল প্রবর্তন।

৩। ১৯৪৭ সাল থেকে চট্টগ্রামের অনাবাদি পার্বত্য অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে রেড ক্লিফ রোয়েদাদে পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশের সঙ্গে বিভক্ত করে দেয়।

৪। ১৯৪৭ সালে জনাব যামিনী চাকমা ও স্নেহকুমার চাকমা ভারতের পক্ষে থাকতে চেয়ে আন্দোলন করে বিরোধীতার মুখে পড়ে এবং আন্দোলনকারীদের অনেকেই ভারতের মিজোরামে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

৫। ষাটের দশকে কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কারণে হাজার হাজার উপজাতীয় এবং পুরনো বাঙালী পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পানির নীচে তলিয়ে যায় অনেক ফসলী জমি এবং বসতি। বসতিহীন প্রায় ২০ হাজার উপজাতি পরিবার আন্দোলন করে এবং বেশিরভাগ ভারতে আশ্রয় নেয়। বর্তমানে আনুমানিক ৩০ হাজার পরিবার অরুণাচল রাজ্যে বসতি স্থাপন করলেও গত ৪৩ বছরে তারা ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করেনি।

৬। ১৯৬২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের কানুনগো পাড়া থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি আন্দোলন সূচনা করে এই আন্দোলনে অনন্ত বিহারী খীসা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন পরবর্তীতে তার অবমূল্যায়ন করা হয়।

৭। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত কাপ্তাই হ্রদে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দাবি উত্থাপিত হয়।

৮। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে চাকমা রাজা জনাব ত্রিদিব রায়ের বিতর্কিত ভূমিকা। উপজাতীয়দের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

১৯৭২ থেকে ১৯৯০ ঃ শান্তিবাহিনীর জন্ম, উপজাতীয়দের জাতীয়তা সংক্রান্ত মতবিরোধ ও তৎকালীন সরকার প্রধানের বিতর্কিত উক্তি, সরকারি খাস জমিতে ভূমিহীনদের পূনর্বাসন, সেনাবাহিনী মোতায়েন এবং তথাকথিত শান্তিবাহিনী কর্তৃক

www.pathagar.com

সশস্ত্র কার্যক্রম এবং শান্তি আলোচনার প্রস্তাব এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নিম্নে ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হলো ঃ

১। ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন সহ ৪ দফা দাবি উত্থাপিত হয়।

২। ১৯৭৩ সালে শান্তিবাহিনী গঠনের মাধ্যমে সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা করে।

৩। ১৯৭৪ সালে রাঙ্গামাটিতে তৎকালীন সরকার প্রধানের বিতর্কিত উক্তি।

৪। ১৯৭৫ সাল থেকে বিভিন্ন এলাকায় সশস্ত্র আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি।

৫। ১৯৭৮ সালে ট্রাইবাল কনভেনশনের মাধ্যমে তৎকালীন সরকার প্রধানের পক্ষ থেকে ক্ষোভ প্রশমনের উদ্যোগ গ্রহণ।

৬। ১৯৭৯ সালে পার্বত্য খাস জমিতে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, আপত্তি এবং বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি ।

৭। ১৯৮০ সালে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ এবং বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

৮। ১৯৮৫ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সরকারের সংগে আলোচনা শুরু। জেএসএস এর প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসিত ৫ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা, সংবিধানের পরিপন্থী দাবি সংশোধনের প্রস্তাব এবং আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়া।

৯। ১৯৮৮ সালে উম্মুক্ত উপজাতীয় ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে বৈঠক ও আলোচনা।

১০। ১৯৮৯ সালের ২৫ জুন নির্বাচন অনুষ্ঠান পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন, সংসদে আইন পাশ এবং চুক্তি অনুযায়ী একজন চেয়ারম্যান ও একত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন। পরিষদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেএসএস এর শক্ত অবস্থান এবং পরিষদ বাতিলের দাবি।

১১। ১৯৯০ সালে পার্বত্য গণ পরিষদ ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের আত্মপ্রকাশ এবং জেএসএস এর দাবির পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে উম্মুক্ত আন্দোলন, জন সমর্থনের চেষ্টা।

১২। ১৯৯০ সালে নীরিহ জনগণ হত্যা, সেনাবাহিনীর উপর অবিরত আক্রমন, সংঘাত-সংঘর্ষ, পরিস্থিতির ক্রমাবনতি এবং জাতিগত সংকট তীব্র আকার ধারন।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ ঃ শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ রচনার ক্ষেত্র তৈরি এবং অত্র অঞ্চলের রাজনৈতিক দল সমূহের দাবি দাওয়া আদায়ের পরিবেশ সৃষ্টিতে এই সময়

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। নিম্নে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হলো :

১। ১৯৯২ সালে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সংসদীয় কমিটি গঠন এবং ১৯৯২ সালে জেএসএস এর এক তরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা।

২। ১৯৯২ থেকে জেএসএস এর সঙ্গে সরকারের ৫ দফা দাবি পর্যালোচনা পূর্বক সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ।

৩। ভারত থেকে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু। সংসদীয় কমিটি, উপকমিটি পর্যায়ে ১৩ দফা বৈঠকের আয়োজন।

৪। ১৯৯২ সালে যোগাযোগ কমিটি গঠন এবং ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা ও পর্যালোচনা। সরকারের সাথে জেএসএস এর আলোচনা সভায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ নেতা প্রসিত খীসার অংশগ্রহনের দাবি জেএসএস কর্তৃক প্রত্যাখান, তরুন ছাত্র সংগঠকদের বিদ্রোহ এবং প্রসিত খীসার অসন্তোষ।

৫। ১৯৯৬ সালে পুনরায় আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ।

৬। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন এবং পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর। ইউপিডিএফ এর আত্মপ্রকাশ এবং পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থাণ গ্রহন। প্রসিত বিকাশ খীসার ইউপিডিএফ এর নেতৃত্বে অত্র অঞ্চলে উদীয়মান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরূপে আবির্ভাব।

১৯৯৮ থেকে ২০০৩ : শান্তি চুক্তির পরবর্তী সময়ে অস্ত্র জমাদান, আঞ্চলিক পরিষদ গঠন এবং শরণার্থী প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত বিষয়গুলি এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবে জেএসএস কর্তৃক দাবিকৃত নতুন ভোটার তালিকা তৈরি, সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার ও ল্যান্ড কমিশনের কার্যক্রম শুরু করার পাশাপাশি শান্তি চুক্তির বিপক্ষে ইউপিডিএফ এর শক্ত অবস্থান এখন পর্যন্ত বর্তমান। নিম্নে ১৯৯৮ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করা হলো :

১। ১৯৯৮ সালে সশস্ত্র শান্তি বাহিনীর অস্ত্র জমাদান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন এবং ভারত থেকে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন।

২। শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন এবং শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স গঠন।

৩। ১৯৯৮ থেকে ২০০১ পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে জেএসএস এর পক্ষ থেকে চুক্তি বাস্তবায়িত না করার অভিযোগ।

৪। শান্তি চুক্তি অত্র অঞ্চলে বসবাসকারী বাংলাভাষীদের অধিকার খর্ব করেছে এই ইস্যুতে তৎকালীন বিরোধী দলের আন্দোলন, প্রতিবাদ এবং চুক্তির বিরোধীতা।

www.pathagar.com

৫। ১৯৯৮ সালে তৎকালীন সরকার পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ ভেঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন ৫ সদস্যের জেলা পরিষদ গঠন। একই সাথে অন্তর্বর্তীকালীন জেলা পরিষদ ব্যবস্থার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের রুল নীশি জারি।

৬। সরকার পরিষদের ১৯৯২ সালে মেয়াদ শেষ হলেও দফায় দফায় মেয়াদ বৃদ্ধি অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক জেলা পরিষদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ। এখানে উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মেয়াদ ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে পাঁচ বছর পূর্তির মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়।

পার্বত্য জেলাসমূহে বর্তমানে অপেক্ষাকৃত অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত এবং যুবকদের মাঝে জাতিগত দুরত্ব অসন্তোষ এবং একে অপরের উপর সন্দেহের বিষয়টি অনেকাংশে কমে আসতে শুরু করেছে। শান্তি প্রিয় সাধারণ উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় পার্বত্যবাসীরা উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈধ দাবি এবং কর্মপন্থাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রধান আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসেবে চুক্তির পক্ষে আন্দোলন করছে। দলের সংগঠকরা দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করছে। তবে জেএসএস এর অনেক সুবিধা বঞ্চিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা এবং দলীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অনেকে প্রত্যক্ষভাবে অসন্তোষ এবং ক্ষোভ ও প্রকাশ করেছেন। এমতাবস্থায় নেতৃত্বের এই টানাপোড়েনে দলের অনেক সদস্যরাই এখন বিপথগামী।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফ আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসেবে অতি সম্প্রতি বিশেষ করে গত সংসদ নির্বাচনে প্রচুর জনসমর্থন অর্জন করেছে। ১৯৯৭ সন এবং শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের বিরোধিতা, সেই সাথে পুর্নস্বায়ত্বশাসনের দাবি নিয়ে এই দলটি তরুণ পাহাড়ী প্রজন্ম এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে একটি আদর্শ দল হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছে। বেশ কিছু বুদ্ধিজীবি ইউপিডিএফ এর আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করে। তারা মনে করে যে, জেএসএস এর প্রৌঢ় এবং সংস্কারহীন নেতৃত্ব যতটুকু পরিবর্তন এনে দিতে পেরেছে ইউপিডিএফ এর প্রগতিশীল শিক্ষিত আন্দোলন আরো বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল নির্দিষ্টভাবে জেএসএস কিংবা ইউপিডিএফ এর সমর্থনপুষ্ট হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

প্রসিত খীসা ১৯৯০ সালেও জেএসএস এর দাবিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে গুরুত্ববহ করে তুলে ধরার প্রয়াসে রত থাকলেও ১৯৯৫ সালে তৎকালীন সরকারের সাথে পার্বত্য ইস্যুতে আলোচনায় বসার প্রাক্কালে প্রসিত খীসার অনুসারী তরুণদের মাঝে বিদ্রোহ ও মত বিরোধের সূত্রপাত ঘটায়।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সৃষ্টি থেকে শুরু করে পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন, কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন চাকমা রাজার তথাকথিত বিতর্কিত ভূমিকা, শান্তিবাহিনীর জন্ম, উপজাতীয়দের জাতীয়তা সংক্রান্ত মতবিরোধ ও সরকার প্রধানের বিতর্কিত উক্তি, সরকারি খাস জমিতে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, সেনাবাহিনী মোতায়েন এবং তথাকথিত শান্তিবাহিনী কর্তৃক সশস্ত্র কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ রচনার ক্ষেত্র তৈরি অত্র অঞ্চল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। এছাড়া দাবি দাওয়া আদায়ের পরিবেশ সৃষ্টি ছাড়াও শান্তি চুক্তির পরবর্তী সময়ে অস্ত্র জমাদান, আঞ্চলিক পরিষদ গঠন এবং শরণার্থী প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত বিষয়গুলির জন্য খাগড়াছড়ি সর্বসময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। তবে জেএসএস কর্তৃক দাবিকৃত স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের জন্য পৃথক একটি নতুন ভোটার তালিকা তৈরি, সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার ও ল্যান্ড কমিশনের কার্যক্রম শুরু করার পাশাপাশি চুক্তির বিপক্ষে ইউপিডিএফ এর শক্ত অবস্থান অত্র অঞ্চলের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে যে কোন মুহূর্তে অনাকাংখিত গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের সকল জাতিসত্ত্বার কথা বিবেচনায় রেখে যাবতীয় সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

www.pathagar.com

জে এস এস এর ছায়া প্রশাসন

সেদিন জানতে পারলাম একটি বিষয় যা সত্যিই সরকার ও সচেতন মহলের উদ্বিগ্ন হবার বিষয়। আমরা সকলে জানি জনসংহতি সমিতি তথা এককালীন সন্ত্রাসী শান্তি বাহিনী নামে যারা সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বিনষ্ট করেছে ও ঝরিয়েছিল অনেক রক্ত তারা বিভিন্ন পাড়া/গ্রাম বা এলাকায় নিরীহ জনগণের ব্যক্তিগত, সামাজিক প্রতিটি বিষয়ে অহেতুক প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করতো। যেমন ঃ বিচার আচার করা, চাঁদা ধার্য করা, বিবাহ বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত, জায়গা জমির ভাগাভাগি ইত্যাদিতে জনগণের উপর তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতো। জনগণ তাদের এ সকল অহেতুক প্রভাব খাটানো, বিচার আচার করা ও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া পছন্দ না করলেও বন্দুকের ভয়ে তাদের মেনে নিতে হতো। আর এ বিষয়টাকে জেএসএস তাদের পক্ষে সাধারণ জনগণের সমর্থন বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো। কিন্তু জনসংহতি সমিতি বিগত সরকারের সাথে চুক্তি করেছে এবং তা তার আপন স্বাভাবিক গতিতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চুক্তির অনেক কিছু বাস্তবায়িত হয়েছে। বাকিগুলো হয়তো আস্তে আস্তে হবে কারণ সরকারের সদিচ্ছা এ ব্যাপারে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। জেএসএস ও বিভিন্নভাবে সরকারের সাথে যোগাযোগ সাপেক্ষে চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্তে তাদের দাবি জানিয়ে আসছে। নিরাপদ একটি পরিবেশ যদি ফিরে না আসে শান্তি স্থাপন বা উন্নয়নের ধারা চালিয়ে যাওয়া কোনটাই সম্ভব হবে না। নিরীহ সাধারণ জনগণ যদি তাদের নিরাপদ ও স্বাভাবিক জীবন ফিরে না পায় তা হলে কি প্রয়োজন ছিল এ পার্বত্য চুক্তির।

কেবলমাত্র একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের সাথে চুক্তির কি কোন অর্থ থাকতে পারে? কারণ পার্বত্য জেলাগুলোতে জেএসএস ও ইউপিডিএফ নামক দুটি দলের সশস্ত্র সংঘাত, হত্যা, অপহরণ, চাঁদা আদায়, বাড়িঘরে আগুন লাগানো ইত্যাদির মাধ্যমে সধারণ নিরীহ জনগণের মাঝে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে পুরো অঞ্চল ও তার অধিবাসীদের নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। জেএসএস কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তারা ইউপিডিএফ এর সদস্যদের ও উক্ত দলের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেবে যে কোন উপায়ে। যা জেএসএস নেতা সন্তু লারমা কোন এক পত্রিকাকে দেয়া তার একটি সাক্ষাৎকারে ও উল্লেখ করেছে। এ তো কোন গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারা হতে পারে না।

আগের কথায় ফিরে আসি, যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি উদ্বেগজনক তা হলো সম্প্রতি

www.pathagar.com

বেশ কিছু ঘটনার আলোকে জানা যায় এবং প্রমাণিত হয়েছে যে, জেএসএস পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন লোকালয়ে সংগঠিত বিভিন্ন এমনকি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে নাক গলাতে শুরু করেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত, আদেশ, নির্দেশ, মীমাংসা ইত্যাদি না মানতে জনগণকে চাপ সৃষ্টি করছে, অনেকক্ষেত্রে ভয়ভীতি প্রদর্শণের মাধ্যমে তারা তাদের সিদ্ধান্ত ও দলীয় ইচছা জনগণের মাঝে চাপিয়ে দিচ্ছে। এ ধরণের কর্মকান্ড তো নেহায়েত সংবিধান বিরোধী ও দেশোদ্রহীতার নামান্তর। তারা সরকার ও প্রশাসনকে অনেকটা চ্যালেঞ্জ করেছে এবং ছায়া প্রশাসন চালানোর প্রয়াস পাচেছ। জনগণও নিরুপায় হয়ে অনিচছা সত্ত্বেও বন্দুকের ও মৃত্যুর ভয়ে জেএসএস এর এহেন কর্মকান্ড মেনে নিচ্ছে। অনেকের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা বলে আগে কেবল চাঁদা দিতাম শান্তি বাহিনীকে কিন্তু পার্বত্য চুক্তি হয়েতো কোন লাভ হলো না আমাদের। এখন আমাদের চাঁদা দিতে হচ্ছে জেএসএস সহ একাধিক দলকে। আমরা শান্তিতে ঘুমাতে পারি না, ব্যবসা বাণিজ্য, চাষাবাদ ও কোন কর্মকান্ড নিশ্চিন্তে করতে পারি না। পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় কালের আবর্তে উপজাতি ও অ-উপজাতি অধিবাসীদের মাঝে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও এমনকি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবে সম্প্রীতি ও সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। জেএসএস সহ অন্যান্য পাহাড়ী দলগুলোর উস্কানিতে এই সম্প্রীতি রক্ষা করা বর্তমানে সমস্যার সৃষ্টি করছে। তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনাকে তারা রাজনৈতিক ভাবে প্ররোচিত করে সাধারণ জনগণকে জিম্মি করে রেখেছে। এ দলগুলোর ফাটাফাটি ও অন্যায় অত্যাচার ও প্রভাব খাটানোর জন্যে। অথচ সন্তু বাবুরা বিরাট দালানে থাকেন, পুলিশ প্রহরায় দামি ও বিলাসবহুল গাড়িতে ঘুরে বেড়ান এবং মাসশেষে গুনে নিচ্ছে সরকার থেকে হাজার হাজার টাকা। সাধারন জনগণ বলছে সন্তু বাবু চুক্তিতে কেবল তার দলের লোকদের সুযোগ সুবিধার কথাই বিবেচনা করেছে। আমরা যারা তথাকথিত শান্তিবাহিনী বা নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমাদের সুযোগ সুবিধার বিষয় গুলো চুক্তিতে আসেনি। সরকার পার্বত্য এলাকার নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন ও শান্তি স্থাপনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

শান্তিবাহিনী চুক্তির পুর্বে সময়কালে এই অঞ্চলে গড়ে তুলেছিল আলাদা সরকার ব্যবস্থা। স্বাধীন দেশের মধ্যে আলাদা সরকার! যত আশ্চর্যজনক মনে হউক না কেন বাস্তবতা ছিল এমনি। শান্তিবাহিনীর হুকুম ছাড়া পাহাড়ীরা কোন কাজ করতে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতো। 'ছায়া সরকার' নামক একটি শব্দের সঙ্গে আমরা পরিচিত। সাধারণতঃ বিরোধীদল এই সরকার গঠন করে থাকে। সরকারি দলকে সঠিক পথে রাখার জন্যে, সরকার যাতে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে না পারে, সে কারনেই বিরোধী দল গঠন করে ছায়া সরকার। আমাদের দেশের রাজনৈতিক

www.pathagar.com

বাস্তবতায় শব্দটি কেবল রাজনৈতিক নেতাদের মুখেই শোনা যায়। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রায় তেত্রিশ বছরের ইতিহাসে কখনো দেখা যায়নি ছায়া সরকারের অস্তিত্ব। কিন্তু দলগুলো না পারলেও সন্তু লারমার জনসংহতি সমিতি গঠন করেছিল এরকমই একটি ছায়া সরকার। পাহাড়ীরা তাদের বিভিন্ন বিচার বা বিরোধ মীমাংসার জন্যে সরকারের প্রশাসনের কাছে যদি যেতো তাহলে শান্তিবাহিনী তাদের উপর অত্যাচার চালাতো। সে কারণে পরবর্তীতে পাহাড়ীরা স্থানীয় সরকারি প্রশাসনের কাছে যেতে পারতো না। জোরপূর্বক তারা পাহাড়ীদের সবকিছুতেই প্রভাব খাটাতো। এই অঞ্চলের সকল ধরনের উন্নয়ন কাজের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা ধার্য করেছিল শান্তিবাহিনী। বিল্ডিং, রাস্তা-ঘাটসহ সরকারের উন্নয়ন কাজের ঠিকাদারদের দিতে হতো এই অর্থ। চাঁদার পরিমাণ ছিল মোট টাকার পনের বা বিশ পার্সেন্ট। কাঠ থেকে মাছ সব ব্যবসায়ীদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা দিতে হতো শান্তিবাহিনীকে। পার্বত্য এলাকার প্রতিটি জায়গা জুড়েতো আর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা দাড়িয়ে নেই। সেটা সম্ভবও নয়। কাজেই নিজেদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য সকলে তাদের চাঁদা দিত নইলে শান্তিবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করতো। বর্তমানেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। জেএসএস ও ইউপিডিএফ এই দুটি পাহাড়ী দলের চাঁদাবাজি হতে পাহাড়ীরাও রেহাই পায়নি। পাহাড়ীদের চাষযোগ্য জমির উপর নির্ভর করতো চাঁদার পরিমাণ। যেমন যার এক একর জমি আছে, তাকে প্রতি বছর চাঁদা দিতে হতো দশ কেজি চাল এবং দশ টাকা। এভাবে জুম বা বাগানের জন্যও হার নির্দিষ্ট দিতে হচ্ছে।

কাঠ চোরাচালানীদের স্বর্গরাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম। এই এলাকায় প্রচুর গাছ জন্মে। সশস্ত্র সন্ত্রাসী ও অসৎ বন কর্মচারীদের সহযোগীতায় দুর্গম জঙ্গলের গাছ কেটে নিয়ে আসে চোরাচালানীরা, যদিও অনেক বন বিভাগের চেকপোষ্ট আছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি ওরা সকলেই দুর্নীতিগ্রস্থ। যদিও কাঠ ঠেকানো সেনাবাহিনীর কাজ নয়, তবুও তাদের সহযোগিতায় অনেক কোটি টাকার সরকারি বনজ সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে পার্বত্যঞ্চলে। পূর্বেও ছিল এবং বর্তমানেও জেএসএস এর অর্থ উপার্জনের অন্যতম উৎস কাঠ চোরাচালানীরা। তারা মোটা অংকের চাঁদা দেয় জেএসএসকে। আর এ টাকা দিয়ে জেএসএস ও ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। অস্ত্র ক্রয় করছে। সোনা এমন কি তারা মাদক ব্যবসার সাথেও জড়িত।

যারা অত্র অঞ্চলে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া উচিত। যারা ছায়া প্রশাসন চালানোর প্রয়াস পাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ও যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া উচিত বলে অনেকে মত পোষণ করছেন।

www.pathagar.com

আঞ্চলিক রাজনীতি অচল ও অকার্যকর

রাজনীতি বিজ্ঞানের ভাষায় কোন রাষ্ট্রে অবাধ ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার পরিবেশ থাকা উচিত। কারণ এতে সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনা, বিভিন্ন গৃহীত পদক্ষেপের উপর সমালোচনার মাধ্যমে সঠিক পথে চলতে সরকারকে সাহায্য করে। জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা নিজ নিজ এলাকার প্রয়োজনীয় উন্নয়নের জন্য কাজ করার সুযোগ পান। এলাকার জনগণের বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে সংসদসহ দেশের বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা করা যায় এবং সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা সম্ভব। এসব ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। এভাবেই যে কোন একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সার্বিক উন্নতি সাধন করা যায়। তবে এটা কেবল মাত্র সম্ভব হবে কোন একটি দেশের জাতীয় মূলধারা রাজনীতি চর্চা ও তার সাথে সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক সমস্যাদি থাকতে পারে যেমন- অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষায় অনগ্রসরতা, দূর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু এসব নিয়ে সোচ্চার হয়ে সমাধানের চেষ্টা উপরোল্লিখিত পন্থাতেই সম্ভব। আজকের আধুনিক ও অগ্রসর এ পৃথিবীতে আঞ্চলিক রাজনীতির কোন স্থান নেই। মূলত এটি সেকেলে, অচল ও অকার্যকর। দুনিয়ার কোথাও সমসাময়িক কালে এমন কোন নজীর নেই যে, আঞ্চলিক রাজনীতির মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের উন্নয়ন ও দাবি আদায় সম্ভব হয়েছে। কারণ আঞ্চলিক রাজনীতির মাধ্যমে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠির সমর্থন লাভ ও সরকারসহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ দুষ্কর হয়ে পড়ে। এমনকি অনেকে অজ্ঞ থাকে প্রকৃত পক্ষে কি ঘটছে ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলে তার ব্যাপারে। তাদের চাওয়া পাওয়ার দাবি সঠিকভাবে সঠিক সময়ে পৌঁছে না সরকারের কাছে। তাদের নেতারাও একাকী অনেক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন না। অনেকক্ষেত্রে তাদের আশ্রয় নিতে হয় সহিংসতার-ফলে নেমে আসে জনজীবনে অশান্তি ও দূর্ভোগ, কমতে থাকে জনসমর্থন। আঞ্চলিক রাজনীতিতে নেতৃত্বের নুতন ও সুষ্ঠু বিকাশ ঘটেনা ফলে একসময়ে নেতৃত্ব সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। সংগঠন বা দলের সাংগঠনিক ও অন্যান্য কর্মকান্ডের প্রসার লাভ করে না। জাতীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণেও থেকে যায় অনেক সীমাবদ্ধতা। সর্বোপরি তাদের রাজনীতিটা একটি বিরাট শূন্যের কোঠায় গিয়ে উপনীত হয় একসময়ে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতি তাদের রাজনীতি শুরু করে ষাটের দশকে। কিন্তু এক সময়ে তারা শুরু করে সশস্ত্র সন্ত্রাসী আন্দোলন। যা ছিলো সহিংসতা ও

www.pathagar.com

ধ্বংসের রাজনীতি। পুরো পার্বত্য এলাকায় তারা হত্যা করলো অনেক নিরীহ পার্বত্যবাসীদের। নিঃস্ব করেছে অনেক পরিবারকে, তাদের হিংস্রতা ও চাঁদাবাজি হতে এমনকি দরিদ্র জুমিয়া পাহাড়ী পরিবারগুলোও রেহাই পায়নি। এক সময়ে তারা বুঝতে পারলো তাদের এ সহিংসতার আন্দোলন কেবল রক্তই ঝরাবে -তাদের লক্ষ্যে পৌছার আশা ও সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসছিলো। প্রায় দুই যুগ জঙ্গলে অবস্থানের পরে তাদের আগ্রহে ও ঐকান্তিকতায় সরকারের সাথে চুক্তি করে অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসলো। আশা করা হয়েছিল পার্বত্য জেলাগুলোতে শান্তির সুবাতাস বইবে। বিরাজ করবে নিরাপদ পরিবেশ। শান্তি বাহিনীর তথাকথিত সশস্ত্র আন্দোলনের যাতাকলে নিষ্পেষীত নিরীহ জনগণ ফিরে পাবে এক স্বাভাবিক শান্তিময় জীবন। কিন্তু জনগনের সে আশা গুড়েবালি।

শুরু হলো ফাটাফাটির আঞ্চলিক রাজনীতির অস্ত্রের ঝনঝনানি ও সন্ত্রাসের প্রতিযোগিতা। চুক্তির বিপক্ষে স্থান নিলো একটি অংশ, দল ছাড়লো জনসংহতি সমিতি হতে। এখন এই দু'দলের মধ্যকার সন্ত্রাসী ও সহিংস কর্মকান্ডের ফলে জনজীবন হয়ে উঠেছে নিরাপত্তাহীন ও অতিষ্ঠ। দু'দলই প্রতিযোগিতা নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজি, বাড়িঘরে আগুন লাগানো ইত্যাদিসহ আরো অনেক জঘন্য সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। বিভিন্ন এলাকায় স্ব স্ব আধিপত্য নিয়ে একদল অন্য দলকে নির্মূল করতে সংকল্পবদ্ধ। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে নিরাপত্তা বাহিনীও পার্বত্য এলাকায় তৎপর। নিরাপত্তা বাহিনী বা স্থানীয় প্রশাসন যখন বিভিন্ন সময়ে এলক্ষ্যে কোন পদক্ষেপ নিতে যায় সন্ত্রাসী উপজাতি তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে জেএসএস বিভিন্ন ভাবে কর্মসূচি দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে চায়। বলতে হয় এটা তাদের অন্যায় আবদার বা স্পর্ধা বেড়ে যাচ্ছে বলে ধরে নিতে হবে। মাঝে মাঝে মনে হয় এরা রাজনীতির কোন ব্যকরণ জানে না। আর জানবেই বা কোত্থেকে। অঞ্চল ভিত্তি দেশের বাকি অংশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন আঞ্চলিক রাজনীতিতে এর অবকাশ নাই বললেই চলে।

আবার পার্বত্য এলাকার অউপজাতি অধিবাসীদের মাঝেও দেখা যায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র দল বা মতের সৃষ্টি। যার ফলে অনেক সময় তাদের দাবি দাওয়া ইত্যাদি দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বা কোন সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হয়। অনেক ক্ষেত্রে উপজাতি দলগুলোর সাথে তাদের বনিবনা হয় না। কাজেই এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো দেশের একটি ক্ষুদ্র অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে আঞ্চলিক রাজনীতিতে সময় নষ্ট না করাই হবে পার্বত্যবাসীর জন্য শ্রেয়। দল, মত, বর্ণ, ধর্ম ইত্যাদির উর্ধে থেকে পার্বত্য জেলাগুলোর জনগণকে তাদের নেতা নির্বাচন করা উচিত। সকলে ঐক্যবদ্ধ ও কোন সমন্বিত মঞ্চে সংগঠিত হয়ে জাতীয় মূল ধারার রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েই রাজনীতি চর্চা করা উচিত। গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়ে

www.pathagar.com

কেবলমাত্র জনসমর্থনের মাধ্যমেই নেতা নির্বাচন ও তার নেতৃত্বে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যে সকল স্বার্থান্বেষী নেতা জনগণকে জিম্মি করে নোংরা ও সহিংসতার রাজনীতির মাধ্যমে কেবল নিজ আরাম আয়েস ও সুবিধার কথা ভাবে, তাদের প্রত্যাখান করতে হবে। যারা এলাকা ও জনগণের সমস্যা ও উন্নয়নের জন্য ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করবেন তাদের নেতৃত্বই কেবল গ্রহণ করা উচিত। কাজেই, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের পথে এটি একটি বিরাট অন্তরায়। এখানকার রাজনীতি জাতীয় মূলধারায় প্রবাহিত হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

জনগণই নির্বাচন করবে তাদের নেতা

ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মাহুতির বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীন সর্বভৌম বাংলাদেশ। আর এই দেশটির এক-দশমাংশ হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম। পাবর্ত্য চট্টগ্রাম নিয়ে অনেক রাখ ঢাক ও অজ্ঞতা বিদ্যমান। কিন্তু রাখ ঢাক করার আগে আমাদের প্রথমেই জানা প্রয়োজন পার্বত্য চট্টগ্রাম কী বাংলাদেশের সাথে সংযোজিত কোন অঞ্চল? পার্বত্য অঞ্চলের গোটাটাই কী জনবসতি? পার্বত্য উপজাতীয় লোকদের রাজনৈতিক মর্যাদাইবা কী? তারা কি পার্বত্যাঞ্চলের আদি স্থানীয় বাসিন্দা? ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, লোকালয় বা মানব বসতিহীন দুর্গম তৎকালীন বনভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃটিশ আমলেই প্রথম আংশিকভাবে আরাকানী শরণার্থী অধ্যুষিত জনবসতিতে পরিণত হয় এবং এই প্রবাসী অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলীয় বন ও পাহাড়কে ১৮৬০ সালে চট্টগ্রাম থেকে পৃথক করে পৃথক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় পরিণত করা হয়, যেখানে বাঙালীরা দাঁড়ায় সংখ্যালঘু। অথচ তখনো শরনার্থী অবাঙালীরা আইনত বিদেশী এবং এদেশে তাদের কোন বৈধ নাগরিকত্ব ছিলো না। রেগুলেশন নং ১/১৯০০ জারির পর গত ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়কালে ঐ প্রবাসীদের বিদেশী শরণার্থীর পরিচয় ঘোচাতে সরকার জারি করেন 'ইমিগ্রেশন ইন্টু দি হিল ট্রাক্টস' নামীয় একটি আইন, যা ধারা নং ৫২ আকারে হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলে যুক্ত হয়েছে। আর এই ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন আইনের বলে তখনই প্রথম আরাকান, লুসাই ও ত্রিপুরা থেকে আগত বিদেশী বিজাতীয়রা, এদেশে বসবাসের আইনি বৈধতা পান। বাঙ্গালীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষে স্বদেশী। বর্ণিত ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন আইনটি তাদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। অথচ বাঙালীদের প্রতি এই আইনটি বেআইনিভাবে প্রয়োগ করে, তাদের বসবাস ও ভূমি লাভের অধিকারকে হরণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক বিরুপতা ও উপজাতীয় মারমুখীতার সাথে সরকারি বিতাড়ন নীতি বাঙ্গালীদের করেছে পাহাড় বাসে নিরুৎসাহিত। বিপরীতে বিদেশী অভিবাসীদের করা হয়েছে অনুগ্রহ ভাজন ও অগ্রাধিকার ভোগী। কিন্তু একক উপজাতীয় মেধা, পুঁজি আর পার্বত্য প্রাকৃতিক সম্পদ স্থানীয় উন্নয়নের জন্য যে, যথেষ্ট নয়, তা যে কোন সচেতন নাগরিকই এক বাক্যে স্বীকার করবেন। এক্ষেত্রে বহিরাঞ্চলীয় মেধা, পুঁজি ও সম্পদ, পার্বত্য উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

বাংলাদেশ হলো একটি অপর্যাপ্ত আয়তন বিশিষ্ট রাষ্ট্র যা ঘন বসতিপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদে দরিদ্র। পার্বত্য চট্টগ্রাম এর এক-দশমাংশ। পার্বত্যাঞ্চলের বিশালতা, বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যা স্বল্পতা উপজাতিদের পক্ষে উল্লাস ও গর্ব করার

www.pathagar.com

মত হলেও এটি কেবল উপজাতীয় অঞ্চল এবং উপজাতীয়দের একক সম্পদ ও ভাবনাটি যথার্থ নয় বরং এটি জাতীয় সম্পদ। উপজাতিরা যেমন বাংলাদেশী জাতির এক ক্ষুদ্রাংশ, পৃথক কোন রাজনৈতিক জাতিসত্ত্বা নয়, তেমনি এই পার্বত্য অঞ্চল চট্টগ্রামের আদি ভৌগলিক এলাকা এবং বাংলাদেশের চিরকালীন অবিচ্ছেদ্য অংশ যার কোন ভৌগলিক ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নেই। এই অখন্ডতার ভিত্তিতে বাঙালী পাহাড়ী এক জাতি। এতদাঞ্চলের বাঙালী ও পাহাড়ীরা অবশ্যই স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বাভূক্ত লোক। তবু তারা উভয়ই এই বাংলা মাটির সন্তান, ঘনিষ্ট প্রতিবেশী এবং অনেক ক্ষেত্রে অভিন্ন রক্ত মাংস আর বংশধারারও অংশীদার। ভিন্নতা আছে, তবে অভিন্নতাও পাশাপাশি বিদ্যমান। এর ভিন্ন চিন্তা ও চেতনা হলো বিচ্ছিন্নতাবাদ। স্বাভাবিক ভাবেই তা সহজ মান্য নয়।

সাম্প্রদায়িক জনসংখ্যার হিসাবে এখন পার্বত্য বাঙালীরা পার্বত্যাঞ্চলের প্রধান স্থানীয় সম্প্রদায়। তাদের এই অবস্থান কোন আন্দোলন, হানাহানি বা ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবাঙালী জাতিসত্ত্বা সমুহের সাথে তাদের জাতিগত নৈকট্যই উভয়ের শান্তিপূর্ন সহাবস্থান অপরিহার্য করে তুলে। জাতিগত বিদ্বেষ এখানে অবাঞ্ছিত। উপজাতীয় অস্তিত্বরক্ষা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তবে কান বিভেদ, হানাহানি ও নৈরাজ্যতার মাধ্যমে নয় বরং সদিচ্ছা সদ্ভব ও সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমেই পৃথিবী ব্যাপী সংখ্যালঘুরা টিকে আছে এবং থাকবে। আর এটাই হলো সংখ্যালঘু উপজাতিদের টিকে থাকার পুঁজি। হিংসাত্মক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এ চরম বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না।

ইতিহাসই প্রমাণ বাঙালীরা চিরকালই সংখ্যালঘু ও উপজাতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল। খোদ উপজাতিরাও এই সহানুভূতির প্রতি আস্থাশীল বলে তারা দক্ষিন পুর্ব সীমান্তের ওপারে বার বার উৎপীড়িত হয়েও নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছে এপারে। এই বহিরাগত উপজাতিদের এদেশকে স্বদেশরূপে গ্রহণ করাকে বাঙালীরা কখনো আপত্তিজনক মনে করেনি এবং বিজাতি রূপে এদের প্রতি কখনও বিদ্বেষ, ঘৃণা বা অবজ্ঞাও দেখায়নি। অথচ এই বাঙালীরাই আজ ঐ বহিরাগত বংশধরদের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অবজ্ঞার শিকার। তারপরেও বাঙালীরা ক্ষুব্ধ প্রতিহিংসা পরায়ণ নয়। আর এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে অবাঙালী সংখ্যালঘুদের নিজেদের কল্যাণেই সাম্প্রদায়িক মৈত্রী, সৌহার্দ্য ও সহনশীলতায় ব্রতী হওয়া জরুরি।

পার্বত্য অঞ্চলটি কোন দ্বীপাঞ্চল বা ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন এলাকা নয় বরং এটি বাংলাদেশেরই একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। আইনি নিষেধাজ্ঞা ও দুর্ভেদ্য দেওয়াল নির্মাণের দ্বারা এতদাঞ্চলে বাঙালী আগমন ঠেকান বা অনুরুপ চেষ্টা করা পন্ডশ্রম ছাড়া কিছুই নয়। যদি এতদাঞ্চল স্বাধীনও হয়, তবুও পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে বাঙ্গালী ও বাংলাদেশ নির্ভর করে রাখবে। ভুটান নেপাল ইত্যাদি ভূবেষ্টিত দেশ সমুহের মত টিকে থাকা এর পক্ষে অসম্ভব। কেবল স্বায়ত্ত্বশাসন ক্ষমতা বা স্বাধীনতা

www.pathagar.com

লাভই শেষ ও সব পাওয়া নয়। সর্বাবস্থায় নাগরিক সুস্থিতি, শান্তি ও সৌহার্দ্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নাগরিক বিসম্বাদ ও সংঘাত প্রতিনিয়ত বিব্রতকর অবস্থায় ব্যতিব্যস্ত করে রাখলে শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন হবে সুদুর পরাহত। বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র সমাদৃত ও চর্চণীয়। কোন সম্প্রদায় বিশেষকে অগ্রাধিকার দান বা কোণঠাসা করে রাখার আন্দোলন সংঘাত ও অশান্তির কারণ রূপে গণ্য। বাংলাদেশ ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ও সরকারি অবকাঠামোতে সংখ্যালঘুদের অংশীদারিত্ব যেমন অপরিহার্য, তেমনি সম্ভাব্য স্বাধীন উপজাতীয় রাষ্ট্র বা সরকারকেও বাঙালীমুক্ত রাখার চিন্তা অবাস্তব। সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও বাঙালী প্রতিবেশীরা সহানুভূতিশীলতার কথা ভুলে আক্রমণাত্মক ভূমিকাই নিতে বাধ্য হবে। এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে যারা ইন্ধন যোগাচ্ছে তাদের লক্ষ্য হলো বসনিয়া বা পূর্ব তিমুরের মত পরিস্থিতির সৃষ্টি করা, যাতে সংখ্যালঘু ও মানবিক অধিকার রক্ষার নামে মুরুব্বী রাষ্ট্রদের হস্তক্ষেপ সম্ভবপর করে তোলা যায়। পাশাপাশি এতদাঞ্চল থেকে বাঙালী ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহারে বাধ্য করা এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য নির্ণয়ে কেবল মাত্র উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জনমত যাচাইয়ের জন্য গণভোট অনুষ্ঠান। আর এই ক্ষেত্রে এতদাঞ্চলের সীমান্ত সংলগ্নতা, বিজাতীয় সহযোগিতা ও মদদের আশ্বাস পুঁজি হিসাবে কাজ করছে। এর প্রতিকারই হলো দেশপ্রেম, অখন্ডতা যা প্রতিরক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট। অবশ্য এক্ষেত্রে আরেকটি নির্মম বিকল্পতা হলো পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালীর জনবিস্ফোরণ ঘটানো। এটি এক অমোঘ অস্ত্র, যা থেকে উপজাতিদের আপোষে আত্মরক্ষাই উত্তম। অতীতে তাই হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ কৌশল কার্যকর। হিংসা ও সংঘাত নয়, শান্তিপুর্ণ সহাবস্থান, সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক সৌভ্রাতৃত্বেই সমস্যার হেতু দূরীভূত করা সহজতর এবং সম্ভব।

ভৌগলিকভাব বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অখন্ড ভূমি সম্বলিত একটি একক দেশ। এদেশবাসী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, বর্ণ ও সম্প্রদায় সম্বলিত নাগরিকদের সম্মিলিত রাজনৈতিক সত্ত্বা হলো ঃ এরা বাংলাদেশী। রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ক্ষেত্রে এই ঐক্যবদ্ধ পরিচয় হলো শক্তি ও সামর্থের উৎস। একে খন্ডিত করার প্রয়াস অবশ্যই রাষ্ট্রদ্রোহিতা। এদেশে বসবাসরত সকল জনগোষ্ঠীর সমমর্যাদা ও সম্পদের ন্যায্য অংশীদারিত্ব অবশ্যই প্রাপ্য। এর নিশ্চয়তা বিধান করাই হলো যোগ্য রাজনীতিক ও রাষ্ট্র নীতিবিদদের কাজ। বাংলাদেশে আজ তারই অভাব প্রকট। আজ যারা পার্বত্যঞ্চলের স্বায়ত্বশাসন নিয়ে রাজপথে আন্দোলন করছে, যারা পার্বত্য চুক্তির নামে পাহাড়ী-বাঙ্গালীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পায়তারা করছে, কি তাদের অতীত ইতিহাস?

ইংরেজ শাসন আমলে ১৯২০ সালে জনৈক কামিনীমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি' যা ১৯৩৯ সালে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় এই 'জনসমিতি' নামক রাজনৈতিক দলটি

www.pathagar.com

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের সাথে অন্তর্ভূক্তির জোর তৎপরতা চালায়। এই দলের পক্ষ থেকেই স্বাধীনতা পূর্ব ১৯৭০ সালের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা) প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার পর উপজাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রধান একটি অংশের মধ্যে পার্বত্য জনগণের স্বার্থ সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পাকিস্তান আমলের 'পার্বত্য জনসমিতি' কে পুনরুজ্জীবিত করা হয় নামের সামান্য হেরফের করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য রাঙ্গামাটিতে এম এন লারমার উদ্যোগে 'পার্বত্য জনসমিতি' পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে আত্মপ্রকাশ করে।

পুনরুজ্জীবনের লগ্ন থেকেই জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করে। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ পাহাড়ী অস্তিত্ব বিপন্ন করবে, এই ধারনা থেকে এম এন লারমা পার্বত্যাঞ্চলের ১৩ টি উপজাতিকে 'জুম্ম' জাতীয়তাবাদ এর নামে নতুন এক জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার আওয়াজ তোলেন। দাবি আদায়ের গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে মনে করে এম এন লারমা ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখা হিসাবে ১৯৭৩ সালের ০৭ জানুয়ারি 'শান্তিবাহিনী' নামক সশস্ত্র দল গঠন করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৩-৭৪ সাল ছিলো শান্তিবাহিনীর বিশেষ তৎপরতার অর্থাৎ রিক্রুটিংয়ের জন্মলগ্ন। হাজার হাজার যুবককে এসময় ভর্তি করা হয় শান্তিবাহিনীতে। প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিটি যুবককে করে তোলা হয় এক একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গেরিলা যোদ্ধা। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী গড়ে তোলে তাদের সুদৃঢ় অবস্থানগত ভিত্তি। ততদিন দলটির সদস্য সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় পাঁচ হাজারের কোটায়। ১৯৭৬ সাল থেকেই শান্তিবাহিনী পার্বত্যাঞ্চলে পরিকল্পিত সামরিক তৎপরতা শুরু করে। এই সামরিক তৎপরতা অব্যাহত থাকা অবস্থাতেই ১৯৮২ সালে 'জনসংহতি সমিতি' ও শান্তিবাহিনী আদর্শগত মত পার্থক্যের কারণে দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে এম এন লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় মার্কসবাদী 'লারমা গ্রুপ' অন্যদিকে প্রীতিকুমার চাকমার নেতৃত্বে গঠিত হয় জাতীয়তাবাদী 'প্রীতি গ্রুপ'। অল্প সময়ের মাঝে দল দু'টি পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই সংঘাতের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর মাসে 'প্রীতি গ্রুপ' এর হামলায় তৎকালীন জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান ও শান্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এম এন লারমা তার ০৮ জন সহযোগীসহ নিহত হন। এম এন লারমার মৃত্যুর পর 'লারমা গ্রুপ'এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এম এন লারমার ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)।

www.pathagar.com

এদিকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের কৌশল হিসেবে ১৯৭৯ সাল থেকে পার্বত্যাঞ্চলে ব্যাপকভাবে বাঙালী অভিবাসন শুরু করেন। সমতল ভূমি হতে প্রতিটি বাঙালী পরিবারকে ৫ একর জমি ও নগদ ৩ হাজার ৬ শত টাকা দিয়ে পার্বত্যাঞ্চলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮১ সালের শেষের দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পুনর্বাসিত বাঙালীর সংখ্যা দাঁড়ায় আনুমানিক ২ লক্ষাধিক। নদী ভাঙা, ঘর-জমি-ভিটেমাটি হারা ০২ লক্ষাধিক গরিব মেহনতি মানুষকে 'গুচ্ছগ্রামে' পুর্নবাসনের নামে পার্বত্যাঞ্চলে বাঙালী অভিবাসনের মাধ্যমে পাহাড়ী-বাঙালী জনসংখ্যাণুপাত অনুকূলে আনার প্রচেষ্টা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে তীব্রতর করে তোলে। এক হিসেব থেকে জানা যায়, ১৯৭৪ সালে পাহাড়ী-বাঙালী জনসংখ্যার অনুপাত ছিল যেখানে ৭৩% এবং ২৪%, সেখানে ১৯৮১ সালে সে অনুপাত দাঁড়ায় ৬০% এবং ৪০% এ। জিয়া সরকারের এই নীতি পাহাড়ী ও বাঙালীদের মধ্যে সংখ্যাগত ভারসাম্য আনতে সক্ষম হলেও পাহাড়ীদের সশস্ত্র আন্দোলন বা ইন্সার্জেন্সি বন্ধ করতে পারেনি। বরং ক্ষেত্র বিশেষে তা আরও ব্যাপক ও তীব্রতর আকার ধারণ করে।

অপরদিকে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও গৃহ-বিবাদের কারণে 'প্রীতি গ্রুপ' এবং 'লারমা গ্রুপ' এ দু'টি দলের ওপরই পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিপ্রিয় পাহাড়ী জনগণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে দুই গ্রুপের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহন করে সরকারি দল। সামরিক অভিযানের পাশাপাশি তৎকালীন এরশাদ সরকার রাজনৈতিক উদ্যোগের অংশ হিসাবে দফায় দফায় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। পরিণামে গৃহযুদ্ধের প্রতিবাদে নিরাপত্তাহীন, হতাশ ও অসহায় শান্তিবাহিনীর প্রায় আড়াই হাজার কর্মী ও সমর্থক সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে যাদের প্রায় সকলেই ছিল 'প্রীতি গ্রুপ' এর সদস্য। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালের ১৯ এপ্রিল প্রীতি গ্রুপের অন্তর্ভূক্ত শান্তিবাহিনীর সদস্যবৃন্দ সরকারের সাথে এক সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। বিলুপ্ত হয় 'প্রীতি গ্রুপ'। পক্ষান্তরে ১৯৮৫ সালের মে মাসে 'লারমা গ্রুপ' কে সন্তু লারমার নেতৃত্বে ঢেলে সাজানো ও পুর্নগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জোরদার করা হয় শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতা। পার্বত্যাঞ্চলের পরিস্থিতি আবার হয়ে ওঠে অশান্ত।

১৯৭৬ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সন্ত্রাসী তৎপরতায় পার্বত্যাঞ্চলে কত লোক নিহত, আহত ও নিখোঁজ হয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট হিসেব পাওয়া খুবই দুরূহ। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ সেনাবাহিনীর বরাত দিয়ে তার প্রকাশিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ১৯৯৭ এর মে পর্যন্ত পার্বত্যাঞ্চলে সন্ত্রাসী তথা হিংসাঅক কর্মকান্ডে মারা গেছে সেনাবাহিনীর ৭৩ জন, বিডিআর এর ৯৬ জন ও পুলিশের ৪১ জনসহ সব মিলিয়ে ৩৪৩ জন এবং আহত হয়েছে ৩৭৩ জন। পক্ষান্তরে ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে ১৫৬

www.pathagar.com

জন। অপরদিকে ঐসময় কালের মধ্যে বাঙালী মরেছে ১০৫৪ জন ও উপজাতীয় মরেছে ২৩৭ জন এবং আহত হয়েছে ৬৮৭ জন বাঙালী আর ১৮১ জন উপজাতীয়। পাশাপাশি অপহৃত হয়েছে ৪৬১ জন বাঙালী আর ২৮০ জন উপজাতীয়। এ পরিসংখ্যানটি যেহেতু সামরিক বাহিনীর কাজেই শান্তিবাহিনীর পরিসংখ্যানে উপজাতীয় মৃতের ও আহতের সংখ্যা হয়তো কয়েক গুণ বাড়বে। উল্লেখিত তথ্য/পরিসংখ্যান ছাড়াও বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা ও তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, ১৯৭৬-১৯৯৬ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালী ও উপজাতীয় মিলে আনুমানিক ২০ হাজারের মতো মানুষ নিহত ও আহত হয়েছে, অপহৃত বা নিখোঁজ হয়েছে প্রায় দুই সহস্রাধিক এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে প্রায় ৬ শত।

জনগণের নামে সংগঠিত হয় রাজনীতি, আন্দোলন, সংগ্রাম আর প্রতিনিধিত্ব। রাষ্ট্রের পরিচয়টাও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। প্রকৃত নেতা ও রাজনীতিক ব্যক্তিদের চরিত্রগুন সার্বজনীন ও কল্যাণকামী হলেই তার নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। স্বধর্ম ও সম্প্রদায় বিশেষের গন্ডিতে তিনি নিজেকে আটকে রাখলে, তার রাজনীতি হবে সংকীর্ণ। জনপ্রিয় রাজনীতি হলো শত্রুকে মিত্রে পরিণত করা, জনগণের মাঝে বিভেদহীন সমর্থন তৈরি করা। রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক উগ্রতা বর্জিত গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা হলো ক্ষমতা লাভের নিরাপদ ব্যবস্থা। এই সুস্থ প্রতিযোগিতা মানে অবাধ মৈত্রী ও জণকল্যানের প্রচেষ্টা এবং তাতে জনপ্রিয়তা অর্জন ও জয়লাভ সম্ভব হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে এর অভাব সীমাহীন।

ক্ষমতাধর উপজাতীয় নেতারাই পরিতোষিক ও সরকারি আশীর্বাদ লাভের বিনিময়ে অতীতে পার্বত্যাঞ্চলে বাঙালীদের বসিয়েছেন। যদিও ১৯৭৫ সালের পরবর্তীতে পার্বত্যাঞ্চলে বাঙালী অভিবাসন একটি সরকারি উদ্যোগ। প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে এর সূচনা হলেও, উপজাতীয় উপদেষ্টা বাবু সুবিমল দেওয়ান তাদের মদদ যুগিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে এর গতি ধীর হলেও বন্ধ ছিলো না। বরং তার আমলে উপদেষ্টা ছিলেন পার্বত্য রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রভাবশালী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা ও বিনয় কুমার দেওয়ান। সুতরাং বাঙালীরা হাওয়ায় ভর করে আপনাতেই উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। সরকারও একক ক্ষমতা বলে পার্বত্যাঞ্চলে বাঙালী অভিবাসনের এক রোখা নীতি গ্রহণ করেননি। আগে পরে সব হেডম্যান, চীফ ও রাজনৈতিক নেতাই আর্থিক সুবিধা ও সরকারি আশীর্বাদের বিনিময়ে পার্বত্যাঞ্চলে বাঙালীদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে মদদ যুগিয়েছেন। তখন আইনি প্রতিবন্ধকতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আর্থিক সুবিধা ও আশীর্বাদের টোপ এক অব্যর্থ অস্ত্র, তাতে ভবিষ্যতেও যে বাঙালীরা পার্বত্যাঞ্চলে বসবাস ও ভূমির মালিকানার সুযোগ জয় করে নিবে তা অবধারিত। এই রাজনীতি / আন্দোলন কোন সুস্থ্য উন্নয়নের রাজনীতি নয়, পয়সা কড়ি কামানো আর আশীর্বাদ লাভের পসরা পাতার ব্যবস্থা। যদ্বারা নেতা ও অভিজাতরা উপকৃত হবেন। সাধারণ উপজাতীয়দের তাতে

www.pathagar.com

কোন লাভ ক্ষতি হবে না। তারা চিরকাল গরিব প্রজা হয়ে আছে এবং থাকবে। বাঙ্গালীদের বঞ্চিত রেখে সাধারণ পাহাড়ীদের সহজ ভূমি স্বত্বদানের কোন পদ্ধতি না হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েলে আছে না জেলা পরিষদ আইনে। জনসাধারণকে ভূমির স্বত্ত্ব দিতে হবে। জেলা প্রশাসকের অনুমোদন সাপেক্ষ খরিদ বিক্রি ও মিউটেশন আইন, উপনিবেশবাদী ও সামন্তবাদী ব্যবস্থা। এটি মানুষের ভূমি অধিকারের পরিপন্থি ও পরাধীনতার বাহন। পার্বত্য অঞ্চল কোন পরাধীন উপনিবেশ নয়। এই আইনের দ্বারা পার্বত্যাঞ্চলে বাঙ্গালী আগমন, বসবাস ও ভূমির মালিকানা লাভ আগেও ঠেকান যায়নি, ভবিষ্যতেও যাবে না, বরং তদ্বারা উপজাতীয় জনসাধারণ, অদৃশ্য বাধা নিষেধ ও প্রতিবন্ধকতায় আবদ্ধ হয়ে, কুপ মন্ডুকে পরিণত হয়েছে এবং হবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, যেহেতু পার্বত্যাঞ্চলে সশস্ত্র সংঘাতের অবসান ও শান্তি কাম্য ছিল, তাই সরকার জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের দাবিগুলোকে নমনীয়ভাবে বিবেচনা করেছেন এবং এটাও বিবেচনাধীন ছিলো যে, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ, বাস্তবতার আলোকে দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন করবেন এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে রাজী হবেন। কিন্তু বাস্তবে ঘটছে তার উল্টোটি। সর্বত্র চলছে চাঁদাবাজি, অপহরণ, খুন এর মতন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। সন্তু বাবু সংবিধান বহির্ভূত বিষয় পার্বত্যাঞ্চল থেকে বাঙালী প্রত্যাহার এবং তাদের ভোটাধিকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রেখেছেন। এতে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা ও হিংসা মনোবৃত্তিরই প্রকাশ ঘটছে। গোটা পার্বত্যাঞ্চল উপজাতীয় জমিদারী নয়। এটি বাঙালীদের ও স্বদেশ ভূমি। এখানে উভয়ই আছে ও থাকবে। কেউ কারো দয়ার কাঙ্গাল বা অধীনস্থ প্রজা, এ ধারণা যেমন ভুল তেমনি আন্দোলনের চমৎকারিত্বে উপজাতীয়রা কেবল উজ্জীবিত হলেই যে তারা পার্বত্যাঞ্চলের একক ও একচ্ছত্র মালিকে পরিণত হয়ে যাবেন তা আশায় গুড়েবালি।

এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত সত্য যে, উপজাতীয়রা স্থানীয় নয়, বহিরাগত অভিবাসীদের বংশধর। তবে তাদের এই বহিরাগমন শতাব্দী প্রাচীন। তাদের বর্তমান প্রজন্ম জন্ম সুত্রে পার্বত্যাঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দা। এখন তাদের অভিবাসী বা বিদেশী বলা যুক্তিযুক্ত নয়। তবু ইতিহাস হলো ঃ তারা অভিবাসী বংশধর। তথাপি এই দেশবাসী বাঙালীরা তাদের স্বজাতি বলে মেনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে অভ্যস্ত হলেও উপজাতিদের একদল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি স্বদেশবাসী বাঙ্গালীদের সাথে শান্তি পূর্ণ সহাবস্থানে অনীহ। আর এটাই হলো পার্বত্যাঞ্চলে অশান্তির প্রধান হেতু।

বাস্তবতা হলো ঃ বাংলাদেশে বাঙ্গালীরা শাসক সম্প্রদায়। জনসংখ্যায় তাদের অনুপাত ৯৯%। বিপরীতে পার্বত্য উপজাতীয়দের অনুপাত মাত্র এক শতাংশের অর্ধেক, অর্থাৎ এরা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু হওয়াতে তাদের নিজেদের মহা পরাক্রমশালী ভাবার অবকাশ নেই। তথাপি কেবল অহংবোধ ও বিদেশী প্ররোচনায় তারা

www.pathagar.com

বাঙ্গালীদের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। আর এই অহংবোধকে আরো তীব্রতর করেছে উপজাতীয় আবাস ভূমি হিসাবে পার্বত্যাঞ্চলের বিশালত্ব এবং স্থানীয়ভাবে তাদের সংখ্যাগুরু হওয়া। পাশাপাশি অহংবোধকে স্ফীত ও সম্প্রসারিত করেছে অঞ্চলটির সীমান্তবর্তী দুর্গম অবস্থান, যার পাশে সমশ্রেণী ও সমসম্প্রদায় ভিত্তিক প্ররোচনা দাতা ও মদদ দার জনশক্তি এবং রাষ্ট্র বিদ্যমান। অপরদিকে পার্বত্য উপজাতীয়রা সংখ্যায় একের আধা শতাংশ হলেও এই পার্বত্য অঞ্চলটি গোটা বাংলাদেশের প্রায় এক-দশমাংশ। তাই পার্বত্য রাজনীতির কথিত নেতাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ হলো, এখানে উপজাতীয় অধিকার ও প্রাধান্য রক্ষা করা। কিন্তু এই উপজাতীয় আবেগ ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ জাতীয় আধিপত্য ও অধিকারের প্রতি হুমকিরুপে অনুভূত।

১৯৯৭ সালের ০২ ডিসেম্বর পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সাথে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সমঝোতা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যা শান্তিচুক্তি নামে সাধারণভাবে অভিহিত। চুক্তিটি সংসদীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত না হওয়ায়, এর খুটিনাটি ফাঁক ফোকর অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তবে চুক্তিটির শিরোনামে শান্তি সংজ্ঞা নয়, নিম্নোক্ত পরিচয়ই ব্যক্ত হয়েছে, যথাঃ 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটিরি সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি'। রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন চুক্তি স্বাক্ষরের আনুষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা ও নিয়ম নীতি কোনটাই এই চুক্তি স্বাক্ষরের প্রাক্কালে অনুসৃত হয়নি। সুতরাং এটির নাম শান্তিচুক্তি বা নির্বাহী ক্ষমতাবলে সম্পাদিত সরকারি চুক্তি কোনটাই হতে পারে না, বরং এটি একটি সরকার সমর্থিত চুক্তি তথা চীফ হুইপের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য জনসংহতি সমিতি নামক একটি সংগঠনের চুক্তি। তাই সার্বজনিনভাবে এটিকে পালনের বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে কিছুটা ফাঁকফোকর রয়েই গেছে। তবে দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এটা স্বীকার্য যে চুক্তিটি তাৎক্ষণিকভাবে যথেষ্ট সুফল দান করেছে। আর তা হলো বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর একটি বিরাট অংশের অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ। ভারতের শরণার্থী শিবির ছেড়ে দেশত্যাগী উপজাতীয়তরা দেশে ফিরেছে এবং নিত্য দিনের নিরাপত্তাহীনতার পরিমান কমেছে। আত্মগোপনকারী বিদ্রোহীরা এখনও সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি অব্যাহত রাখলেও, আগের মত তারা সংগঠিত স্বাধিকারবাদী নয়। বরং বর্তমানে তারা সন্ত্রাসী ও দুস্কৃতিকারী মাত্র।

সর্বাবস্থায় সার্বজনিন শাসন ব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র। রাজনৈতিক সাফল্যের সূত্র হলো গণতন্ত্র ও সুস্থ প্রতিযোগিতা। মানবতা ও গণতন্ত্রের এটাই চাহিদা। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। আর গনতান্ত্রিক দেশ হিসাবে এর পরিচালনার দায়িত্ব যাদের উপর বা যে সরকারের উপর ন্যস্ত হবে তারা বা সে সরকার দেশের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন সেটাইত স্বাভাবিক। স্বাধীনতা পরবর্তীতে

www.pathagar.com

এই দেশটিতে অনুষ্ঠিত দেশ পরিচালক বা সরকার নির্বাচনের প্রতিযোগীতার সংখ্যা মোটামুটি কম নয়। দেশের জনগনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিংবা পছন্দ-অপছন্দের কষাকষিতে দেশে বিভিন্ন সময়ে অনেক সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে। আর এই সরকার পরিবর্তন/ নির্বাচনের প্রতিযোগিতা কখনও হয়েছে নিরপেক্ষভাবে আবার কখনওবা হয়েছে লোক দেখানো মাত্র। তারপরেও নির্বাচন হয়েছে, হয়েছে দেশ পরিচালনার তথা জনগণের প্রতিনিধি মনোনয়নের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। পার্বত্যাঞ্চল আমাদের এই দেশটির প্রায় এক-দশমাংশ। কাজেই দেশের দশভাগের নয়ভাগ জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন তথা দেশের নয়ভাগ পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পনের জন্য যোগ্য পরিচালক নির্বাচনে যে পন্থা অবলম্বন করা হয় বা হয়েছে বাকি একভাগের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম অনুসৃত হবে সেটাইকি স্বাভাবিক নয়? অথচ আজ যারা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে কিংবা পার্বত্যাঞ্চলে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে নেতা বনে গেছেন, নিজেরা সরকারি গাড়ি-বাড়ি তথা সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে নিরীহ জনগণকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আর বড় বড় বুলি শুনিয়ে তাদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন, দেশের তথা জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রতিযোগিতা কালে তারা কোথায় ছিলেন, কোথায় ছিল সে সকল প্রতিবাদী রাজনৈতিক দলসমুহ। ১৯৭২ সালে জন্ম নেয়া জেএসএস স্বাধীনতা পরবর্তী দেশে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচনে কি অংশগ্রহণ করেছে? অপরদিকে জেএসএস তথা শান্তিচুক্তি বিরোধী পার্বত্য রাজনীতির বর্তমান সময়ের আরেক প্রতিবাদী কণ্ঠ ইউপিডিএফ এর জন্মতো সেদিন মাত্র। এখন প্রশ্ন হলো, জেএসএস তথা এর নেতারা কেন অদ্যাবধি কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি, কি ছিল জেএসএস নেতাদের উদ্দেশ্যে, কোন ভয়ে জেএসএস নেতারা নিজেদের বিরত রাখেন প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে জনগনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হবার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ থেকে? আর কেহ যদি প্রতিযোগিতায়ই অংশগ্রহণ না করে তবে দেশবাসীর কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু, জনগণ বা দেশ তথা দেশের অংশ বিশেষ পরিচালনায় তার যোগ্যতা কতটুকু, তার বিচার করা কি আদৌ সম্ভব? একথা সর্বজন বিদিত যে, আমাদের দেশটির শতকরা ৯৯ ভাগ জনগণই বাঙালী। যদিও জাতিগত বৈষম্যের কারণে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এক-দশমাংশ পার্বত্যাঞ্চলটি কিছুটা আলাদা প্রকৃতির তথাপি পার্বত্যাঞ্চলেও মোট বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অর্ধেকাংশই বাঙালী। আর বাকী অর্ধেকাংশের একাধিক জাতিগত বৈষম্য নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলেছে পাহাড় সমতুল্য মতবিরোধ ও দ্বিধাদ্বন্ধ। সেই ক্ষেত্রে বিরোধপূর্ণ এই পার্বত্যাঞ্চল পরিচালনার দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত হওয়া উচিৎ, কার হওয়া উচিৎ এর ধারক, বাহক ও পরিচালক, আর কিই বা হওয়া উচিত তা নিরুপনের পন্থা বা মাপকাঠি সেটা নির্ধারনের দায়িত্বটুকু না হয় সচেতন দেশবাসীর উপরই ন্যাস্ত রইল।

www.pathagar.com

মানবাধিকার সংস্থার উদ্দেশ্যমূলক কর্মকান্ড

সারা বিশ্বে এমন কিছু সৌখিন ও ভাড়াটে মানবাধিকার সংস্থা গড়ে ওঠেছে, যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সর্বোপরি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গণহত্যা ও দেশদ্রোহীতামূলক কার্যক্রমের নির্মমতা বিবেচনা না করে মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবাস্তব, ভিত্তিহীন, একপেশে এবং পক্ষপাতদুষ্ট তথ্য ও কাহিনী প্রচার করে বিশ্ব সমাজের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে পরিকল্পিতভাবে ম্লান করছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপ দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসী বিদেশী চরদের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে।

কোন কোন মানবাধিকার সংস্থার অতি উৎসাহী ভূমিকা প্রমাণ করে যে, কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে নাক গলানোর মধ্যেই তাদের কার্যক্রম সীমিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাঙ্গালী, সেখানে নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা এবং মানবাধিকার লংঘনের অতিরঞ্জিত দুর্নাম রটালেও সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের মানবাধিকার লংঘনজনিত অত্যাচার, নির্মমতা, হত্যা, ধর্ষণ, গুম, অপহরণ, অগ্নিসংযোগ, চাঁদাবাজি, সর্বোপরি, একটি দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করার অপরাধ প্রসঙ্গে বাস্তব অর্থে নিরবতা পালন করে।

ইতোমধ্যে কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে কতিপয় মানবাধিকার সংস্থাকে মাঠে নামানো হয়েছে। এ ধরনের কোন কোন সংস্থার আত্মপ্রকাশের পেছনে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার-এর প্রত্যক্ষ পৃষ্টপোষকতা সক্রিয় ছিল বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। কারণ এসব সংস্থা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বর্বরোচিতভাবে মানবাধিকার লংঘন হওয়া সত্ত্বেও সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরব থাকে।

ভারতীয় গোয়েন্দাচক্র, এর প্রচার মাধ্যম এবং দূতাবাসসহ সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অসত্য ও বানোয়াট তথ্য ও ঘটনা প্রচার করে গণতান্ত্রিক বিশ্বের মানবতাবাদী সংস্থাসমূহকে নানাভাবে প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মুসলিম বিদ্বেষী কিছু কট্টর খ্রিস্টান মিশনারী, যারা তথাকথিত উন্নয়নমূলক কাজের আবরণে সহজ সরল উপজাতীয় জনগণকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার কাজে ব্যস্ত। তারা মনে করে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বাংলাদেশকে দূরে রাখা গেলে এর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া ও

www.pathagar.com

ধারাবাহিকতা স্থবির হয়ে যাবে, পার্বত্য উপজাতীয়দের মধ্যে সচেতনতা আসবে না, ফলে তাদের দরিদ্রতা ও অজ্ঞতা, সর্বোপরি সহজ সরল বিশ্বাসকে ব্যবহার করে তাদেরকে দ্রুত খ্রিস্টানে পরিণত করা সম্ভব হবে। এ জন্য এনজিও নামক খ্রিস্টান মিশনারীগুলো বাংলাদেশের রক্ষণাত্মক ও গঠনমূলক ভূমিকার তুখোড় সমালোচক।

এনজিওগুলোর মিথ্যে প্রচারণা কিভাবে পাশ্চাত্যের মানবতাবাদীদের প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন করছে, তার বাস্তব প্রমাণ হলো CHITTAGONG HILLTRACTS COMMISSION ১৯৯৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার অবস্থা সম্পর্কিত "Life is not ours" শীর্ষক যে রিপোর্ট এ সংস্থাটি প্রকাশ করেছেন তার প্রারম্ভিক মন্তব্যে স্বীকার করা হয়েছে যে, কতিপয় এনজিও এর পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে এই সংস্থাটি আত্মপ্রকাশ করেছে।

বিগত ২০ বছর যাবত বেসরকারি সংস্থাসমূহ (এনজিও) বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, জোর পূর্বক স্থানান্তর এবং সাংস্কৃতিক অবদমন সংক্রান্ত বিরক্তিকর বিবরণী প্রচার করে আসছে। এ্যামনেষ্টী ইন্টারন্যাশনাল, এ্যান্টিশ্লেভারী ইন্টারন্যাশনাল (নেদারল্যান্ডস), দ্য অর্গানাইজিং কমিটি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস ক্যাম্পেন (জার্মানী), গিসেলচ্যাপ্ট ফার বেডরোট ভলকার (ডেনমার্ক), আদিবাসী বিষয়াবলী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কর্মদল (যুক্তরাজ্য) সংসদীয় মানবাধিকার গ্রুপ এবং সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি সংস্থা ১৯৮৩ সাল হতে তাদের প্রচারণা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে।

এদের বিভিন্ন রিপোর্টের মন্তব্য, বক্তব্য এবং রিপোর্ট সংগ্রহের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যাবে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক প্রণীত এ ধরনের রিপোর্ট একপেশে, ভূয়া ও উদ্দেশ্যপ্রনোদিত বলে প্রকৃত পরিস্থিতির প্রতিফলন এসব রিপোর্টে ঘটেনি। এই সংস্থা সমূহের রিপোর্ট সংগ্রহ পদ্ধতির প্রতি নজর দিলেই বুঝা যায় সমূদয় মানবাধিকার সংস্থাসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সত্যিকার পরিস্থিতি এবং তা নিরসনে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলী সম্পর্কে কেমন অবাস্তব এবং কাল্পনিক তথ্য বিশ্বময় প্রচার করছে। সমূদয় মানবাধিকার সংস্থা, তাদের পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থকরা যেসব বিষয় যথার্থভাবে হয়তো অনুধাবন করেন নি সেগুলো হলো ঃ

ক। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সেখানে বাংলাদেশ কোন ভাবেই দখলদার শক্তি নয়। যে কোন মূল্যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে টিকিয়ে রাখার সার্বভৌম ও নৈতিক অধিকার বাংলাদেশের রয়েছে।

খ। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বাংলাদেশের সৃষ্ট নয়। বরং ইহা চাকমা উপজাতিভূক্ত কিছু বিদেশী চরের বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেয়া সমস্যা। বাংলাদেশ সেখানে বিদেশী চর এবং দেশদ্রোহীকে প্রতিহত ও শায়েস্তা

www.pathagar.com

করার জন্য সীমিত সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মীকে মোতায়েন করেছে। যাদের ভূমিকা নেহায়েত রক্ষণাত্মক, আক্রমণাত্মক নয়।

গ। সর্বোপরি, যে কোন মূল্যে দেশের অখন্ডতা, রক্ষার ক্ষমতা ও অধিকার বাংলাদেশের রয়েছে এবং তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই।

বহুবিধ অসত্য ও ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কমিশন তাদের প্রতিবেদন তৈরি করেছিল বলে বিশেষজ্ঞগণ সুস্পষ্টভাবে দাবি করেন। তাদের মতে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি বিনষ্ট করার জন্যই ভূয়া তথ্যসম্বলিত এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। শুধু হিল ট্রাক্টটস কমিশনই নয়, এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালসহ আরো কতিপয় মানবাধিকার সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের কথিত মানবাধিকার লংঘন প্রসংগে একই ধরনের ভিত্তিহীন প্রচারণা চালিয়ে আসছে। কিন্তু তাদের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই দেশী-বিদেশী জনমত বিভ্রান্ত হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মানবাধিকার লংঘনের ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনী প্রচারকারী দেশী-বিদেশী মানবাধিকার সংস্থাগুলো যে ভাড়াটে এবং তাদের সমুদয় কার্যক্রম যে সম্পূর্ণরুপে একপেশে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তার বহুবিধ প্রমাণ তারা ইতোমধ্যেই স্থাপন করেছে। পার্বত্য মহিলা সমিতির নেত্রী কল্পনা চাকমা উধাও হয়ে যাবার পর প্রায় শতাধিক অজ্ঞাত-অখ্যাত প্যাডসর্বস্ব মানবাধিকার সংস্থা তার অনুকূলে বাংলাদেশে প্রতিবাদপত্র ও স্মারকলিপি প্রেরণ করে। কিন্তু রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে ২৮ জন বাঙ্গালীকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর কোন একটি বিদেশী মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ হতেও কোন প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানো হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বয় ও শান্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুবিনয় চাকমাকে প্রকাশ্যে গুলি হত্যা করা হয় আরো হত্যা করা হয় চাবাই মগকে। শান্তিবাহিনীর সাবেক সদস্য সুবিনয় চাকমা ও চাবাই মগ শান্তিবাহিনী ত্যাগ করে শান্তির সপক্ষে আজীবন লড়াই করেছেন। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাদের অবদান অপরিসীম। এতদসত্বেও কোন একটি মানবাধিকার সংস্থাও সুবিনয় চাকমাকে হত্যা করার পর কোন ধরনের নিন্দা জ্ঞাপন করেনি। নিন্দা করেনি দীঘিনালা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান কালিজয় চাকমা কিংবা বেতছড়ির বিভূতি রঞ্জন কারবারী নিহত হবার পর।

অথচ এরাই পার্বত্য চট্টগ্রামে নুন থেকে চুন খসলে বিশ্বব্যাপী শোরগোল শুরু করে। তথাকথিত শান্তি-বাহিনীর হত্যা, অপহরণ, নির্যাতন তথা মানবাধিকার লংঘনের প্রতিবাদ ও নিন্দা না করে এরা প্রমাণ করেছে যে, এরা জনসংহতি সমিতি তথা বিদেশী চর বিদ্রোহীদের ভাড়াটে।

www.pathagar.com

মানবাধিকার সংস্থাসহ জনসংহতি সমিতির স্বদেশী-বিদেশী পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের বুঝতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দখলীকৃত উপনিবেশ নয়, ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অভিন্ন আইন প্রশাসন এবং শাসনতন্ত্রের আওতায় ইহা পরিচালিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব এখানেও সমানভাবে প্রযোজ্য ও কার্যকর। বাংলাদেশ ভূ-খন্ডের কোন অংশ কোন সম্প্রদায় বিশেষকে ইজারা দেবার কোন সুযোগ নেই। সম্প্রদায় বিশেষের অন্তর্ভূক্ত সামান্য সংখ্যক বিদেশী চরের উচ্চাভিলাসসুলভ ভ্রান্তির কাছে দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা জলাঞ্জলী দেয়া যায় না। যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী প্রতিটি উপজাতীয়কে তথাকথিত জুম্মল্যান্ডের দাবিদার বলে গণ্য করা হয়, তথাপি তারা হবে মোট জনসংখ্যার মাত্র .৪৫ শতাংশ। মাত্র .৪৫ শতাংশ বহিরাগত উপজাতীয়দের অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবির মুখে ৯৯.৫৫ শতাংশ জনগণের মাতৃভূমির ১০ শতাংশ ছেড়ে দেয়া কোন মানবাধিকার বা গণতন্ত্রের আওতার মধ্যে পড়ে ? এ ধরনের আঞ্চলিক বা সম্প্রদায়গত দাবি কখনই মানবাধিকার বা গণতন্ত্র সম্মত হতে পারে না। কেউ উপজাতি বলেই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বা দাবিদার হবে, আর ভূমিজ সন্তানরা অবৈধ চাপের মুখে তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে দেবে এর নাম গণতন্ত্র নয়। মানবাধিকার কেবল উপজাতিদের জন্যই সংরক্ষিত নয়, সমগ্র দেশবাসীর জন্য। মানবাধিকারের মোড়লরা এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করতে পারেন না।

www.pathagar.com

বিদেশী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের বৈষম্যমূলক ও আপত্তিকর কর্মকান্ড

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ যেখানে গণতন্ত্রের হয় অবাধ চর্চা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরবর্তী বৎসর পার্বত্য চট্টগ্রামে সার্বিক পরিস্থিতি বেশ শান্ত এবং প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নানা সহিংস রাজনৈতিক কার্যক্রম যেমন মিছিল, মিটিং, সমাবেশ, অবরোধ ও হরতাল পালনের মাধ্যমে জেএসএস তাদের চার দফা দাবি আদায়ের আন্দোলনের মাধ্যমে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে ও উত্তপ্ত করে তুলছে। পাশাপাশি তারা বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা ও দেশের ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার, নিরাপত্তা বাহিনী ও পার্বত্য বাঙ্গালী অধিবাসীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে বিষয়টিকে আন্ত র্জাতিকভাবে জটিল আকারে পরিণত করার চেষ্টা করছে। হয়ত তারা এখন ভাবতে শুরু করেছে যে, বিদেশী দেশ/শক্তির মাধ্যমেই তাদের দাবি আদায় সম্ভব হবে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না-এদেশ এ মাটি আমরা সকল বাংলাদেশীর। বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে ক্ষুদ্র হলেও একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

যদিও পূর্ব থেকেই জেএসএস আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের স্বপক্ষে বিভিন্ন উপায়ে প্রচার প্রপাগান্ডা চালিয়ে আসছিলো, কিন্তু ইদানিং তাদের এই ধরণের কর্মকান্ড অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা বিদেশীদের বিভিন্ন সময়ে ডেকে এনে পার্বত্য এলাকার অপেক্ষাকৃত কম উন্নত জায়গা গুলো ভ্রমণ করাচ্ছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে তাদেরকে উন্নয়নের ছোয়া হতে বঞ্চিত করার ভুল অপবাদ দেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ তিন পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন অঙ্গণে অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সে ব্যাপারে তারা বিদেশী প্রতিনিধিদের বিন্দুমাত্র ধারণা দেয় না। যেহেতু এক্ষেত্রে আমাদের সরকারেরও কোন প্রচারণা নেই, সেহেতু বিদেশীরা জেএসএস এর পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে তুলেধরা মিথ্যা চিত্রকেই বিশ্বাস করছে।

পার্বত্য চুক্তি পরবর্তী সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিদেশীদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে তা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যাচ্ছে বলে অনেকে মন্তব্য করেন। স্থানীয় প্রশাসন/পুলিশ এর সাথে যথাযথ সমন্বয় সাধন সাপেক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশী নাগরিকদের যাতায়াত করার প্রবিধান থাকলেও, ইদানিং পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, বিদেশী নাগরিকরা প্রশাসন/পুলিশ সকলের অগোচরে জেএসএস এর 'গাইডেড ট্যুরে' প্রত্যন্ত অঞ্চলে গমন করে থাকে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের প্রশাসন ও আইন কানুন কে বৃদ্ধাংগুলি প্রদর্শন করে অনেক বিদেশী নাগরিক উদ্দেশ্যমূলকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে আনাগোনা ও দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মকান্ড চালিয়ে

www.pathagar.com

যাচ্ছে। অনতিবিলম্বে বিদেশী নাগরিকদের যাতায়াতের উপর পার্বত্য চট্টগ্রামে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা উচিৎ। কারণ আঞ্চলিক রাজনীতিতে লিপ্ত জেএসএস নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে নিয়ে বিদেশী কোন অপশক্তি কর্তৃক ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হতে পারে। এর প্রমাণ আমরা ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে পেয়েছি। কারণ তারা নিজেদের বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে ভাবে না। একই কথা উচ্চারণ করেছে সন্তু বাবুর প্রেরিত প্রতিনিধি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে আমেরিকায়। আবার এর সাথে বিভিন্নভাবে উস্কানীর মাধ্যমে পার্বত্য ইস্যুকে উত্তপ্ত করার প্রয়াস চালাচ্ছে কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দল, যারা দেশ প্রেম বুঝে না। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিসংঘের অংগসংস্থা ইউএনডিপি এর ছত্রছায়ায় বিদেশী স্বার্থান্বেষী চক্রের সন্দেহজনক ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরুপ কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা বিশেষ একটি গোষ্ঠীর হয়ে তাদের কর্মকান্ড চালাচ্ছে বলে পার্বত্য এলাকার চাকমা ব্যাতীত অন্যান্য অধিবাসীরা সন্দেহ পোষণ করছে।

বিভিন্ন সময়ে ইউএনডিপি এর সহায়তায় ইউরোপীয় কমিশন ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশের প্রতিনিধিবর্গ পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন পরিদর্শনে আসেন, তখন তারা কেবল জেএসএস কর্তৃক নির্দিষ্ট এলাকাগুলোতে যান এবং চাকমাদের সাথে কথা বলেন। অন্যান্য উপজাতি বা বাঙ্গালী অধিবাসীদের অবস্থা/দুর্দশা অবলোকন বা তাদের সাথে কথাবার্তার কোন কর্মসূচি তারা রাখে না। সম্প্রতি ইউএনডিপি এর নিরপেক্ষতা নিয়ে পার্বত্য এলাকার জনগণ সন্দিহান। ইউএনডিপি কার স্বার্থে কাজ করছে ? একটি স্বাধীন দেশে এভাবে চলতে দেয়া যায় না। সরকারের পক্ষ হতে তাদের পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেয়া উচিত যে, নিরপেক্ষতা বজায় রেখে ইউএনডিপি যদি কাজ করে তাহলেই কেবল বাংলাদেশ সরকার তাদের কর্মকান্ড পরিচালনার অনুমতি দেবে-নইলে নয়। বিদেশী সংস্থা/প্রতিনিধিবর্গের অনিয়ম সমূহ যেমনঃ

১। প্রশাসন/পুলিশের সাথে সমন্বয় সাধন না করা।

২। নিরাপত্তা বাহিনী সমূহকে এড়িয়ে চলা।

৩। সরকারি প্রশাসনের কোন কর্মকর্তার সঙ্গ পছন্দ করেন না।

৪। কেবলমাত্র জেএসএস এর সাথে সমন্বয় করে গমনাগমন করা।

৫। একটি মাত্র উপজাতির স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করা, ইত্যাদি।

৬। বিদেশী সংস্থা সমূহের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের সম্মূখীন করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউএনডিপি'র প্রহসনমূলক কর্মকান্ড নিয়ে উক্ত অঞ্চলের জনগণের মাঝে বিরুপ প্রতিক্রিয়া ও সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। তারা যত ঢাক ঢোল পিটিয়ে কাজ করার কথা বলে, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তা হচ্ছে না। তাদের কর্মকান্ডের বেশির

www.pathagar.com

ভাগ হচ্ছে কেবল প্রচারণা নির্ভর। এমন কি মহালছড়িতে বিগত কয়েকমাস যাবৎ দুঃস্থদের জন্য গৃহনির্মাণের কথা বললেও তাদের লোকজন কেবল আসে আর যায় এবং প্ল্যান প্রোগ্রামই করতে থাকে। স্থানীয় জনগণ মনে করেছিলো ইউএনডিপি তাদের পাকা বাড়ি আর সাহায্য সহযোগিতার বন্যায় ভাসিয়ে দেবে। কিন্তু তারা এ পর্যন্ত তার কিছুই পায়নি এবং সরকার সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রায় ৩০০ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে তৈরি করে দিয়েছে বড় বড় ঘর, দিয়েছে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য। তারা বুঝতে পেরেছে এখন যে, কোন এক স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ ও অযথা দেশ ও সেনাবাহিনীর ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য তাদের মাঝে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছিলো। এ সকল কর্মকান্ড পার্বত্য এলাকার জনগণকে ভাবিয়ে তুলেছে এবং সরকারের নির্লিপ্ততার বিষয়ে উদ্বিগ্ন। সমন্বিত ভাবে সরকার তথা প্রশাসনের সাথে যথাযথ সমন্বয় সাপেক্ষে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ইউএনডিপি/বিদেশী সংস্থা সমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করুক সকলে এটাই কামনা করে।

www.pathagar.com

পাহাড়ী - বাঙালী সম্প্রীতি উন্নয়নের পূর্বশর্ত

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী ও পাহাড়ীদের মাঝে সু-সম্পর্ক ও সম্প্রীতির কথাটি নূতন কিছু নয়। তাদের মাঝে সুন্দর সম্পর্ক ও একসাথে জীবন যাপনের বাস্তবতা অনেকদিনের। কিন্তু বর্তমানে স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানী ও অপপ্রচারণার প্রেক্ষিতে বাঙ্গালী-পাহাড়ী সম্পর্কের দুঃসময় চলছে। দুঃসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একই রাষ্ট্রের দুই বৈধ নাগরিক শ্রেণী পারস্পারিক সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং ঘৃনার কলঙ্কে নিজেদের কলঙ্কিত করে নিজেদেরই ভবিষ্যতকে ঠেলে দিচেছ চরম অনিশ্চয়তা ও অশান্তির দিকে। ক্রমবর্ধমান কাদা ছোড়াছুড়ি, হানাহানি আর রক্তারক্তিতে সবুজ স্নিগ্ধ মৌন পাহাড়ী প্রকৃতির আদিম সৌন্দর্য এখন বিঘ্নিত। সুবিস্তীর্ণ সুনীল হ্রদের পরিস্কার টলটলে জলরাশি 'বাঙালী-পাহাড়ী' সংকীর্ণচিত্তজাত চিন্তার কদর্য আবহাওয়ায় দিন দিন ঘোলাটে হচেছ। অপরিনামদর্শী শ্রেণীর ক্ষুদ্রতর গোত্রচেতনাসঞ্জাত অসার স্বপ্ন-কল্পনা আগাছার মতো আছন্ন করে ফেলেছে সমঝোতা ও শুভেচ্ছার শস্যময় প্রান্তর অবাঞ্চিত বহিঃশক্তির সঙ্গোপন উস্কানীতে। অথচ বর্তমানে সৃষ্ট এ-সংকটের ঐতিহ্যিক কোনো প্রেক্ষাপট নেই। এ-পর্যন্ত অত্র এলাকা এবং এলাকাস্থ বাসিন্দাদের নিয়ে যতো ইতিহাস ও গবেষণা কর্ম সাধিত হয়েছে, তাতে বর্তমানে সৃষ্ট সংকটের কোন পটভূমি আছে বলে মনে হয় না। ঔপনিবেশিক শাসনামলে বহিঃপ্রভূর মেজাজ-মর্জির উজান-ভাটির মোহনায় দাঁড়িয়ে বর্তমানের এ -পাহাড়ী -বাঙালী জনগোষ্ঠী পারস্পারিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ থেকে নিজেদের জীবিকা ও অস্তিত্বের অনুসন্ধান করেছে। সকল প্রকার রাজনৈতিক কদর্যতার বাইরে থেকে আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের মসৃন প্রাঙ্গণে হার্ষোৎফুল্ল শিশুর ন্যায় অসঙ্কোচে বিচরণ করেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম ও পরবর্তীকালে খৃষ্টধর্মের ছত্রছায়ায় এসে যে যার মতো বিশ্বাসের বাস্তবায়ন লাভ করেও পারস্পারিক স্বার্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্ব-স্ব সহজবোধ্যতা জিইয়ে রেখেছে।

স্বার্থিক সম্পর্কের এ-সহজ পথ ধরে পারস্পারিক নৈকট্যবোধের চেতনা 'বাঙালী-পাহাড়ী' জনগোষ্ঠীকে পরিচয়ের প্রথম দিন হতেই আত্মীয়তার সূত্রে গ্রথিত করেছে। এ-আত্মীয়তাবোধের মূলে ছিলো উভয় পক্ষের স্বভাবসুলভ সারল্য ও সহানুভূতি। বাঙালী জাতি ইতিহাসের পথ-পরিক্রমায় অনেক শোষণ, ধোঁকাবাজি, লাঞ্চনা ও বঞ্চনার সম্মুখীন হয়েছে। যুগে যুগে বুকের রক্তে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যকে অভিষিক্ত করেছে সে, আবার বুকের রক্ত ঝরিয়েও তাকে হারিয়েছে বারবার। বিদেশী দস্যু ও হানাদারদের অন্যায় আক্রমণে অতীষ্ট এ-সরলপ্রাণ জাতি নিরবিচ্ছন্ন স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করতে পারেনি কস্মিনকালেও। অথচ এর কারণ হিসেবে কেউ যদি তার

www.pathagar.com

অক্ষমতাকে কটাক্ষ করে, তা হবে ভুল। বরঞ্চ এ-জাতির সহজাত সারল্য এবং বিশ্বাসপ্রবনতাই তার দুর্গতির মূলে ক্রিয়াশীল। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ীদের সঙ্গে বাঙালীদের হৃদ্যতার মূলে ছিলো প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য। কাপ্তাই হ্রদ এবং আধুনিক কাপ্তাই-রাঙামাটি শহর সৃষ্টি হবারও বহু আগে থেকে বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে আনাগোনা ছিলো। পার্বত্য চট্টগ্রাম পানিতে প্লাবিত হবার আগে এখানকার পাহাড়-টিলার ফাঁকে ফাঁকে বিস্তৃর্ণ সমতল অঞ্চল এবং পাহাড়ের সঙ্গে সন্নিহিত প্রচুর 'থলী' জায়গা ছিলো। পার্বত্য নদী কর্ণফুলীর দু' পাড়ের সমতল ভূমিতে প্রধানতঃ ধান, পাট, তিল, তিসি, সরষে,আনাজ এবং পাহাড়ের ঢালু গায়ে জুম চাষের প্রচলন ছিলো। জুমগুলোতে হরেক রকমের ফসল উৎপন্ন হতো। ধান-পাট থেকে শুরু করে রবিশষ্য এবং নানা প্রকার ফল-ফলারি পর্যন্ত। উর্বর এ-সব জমিতে ফলনের প্রাচুর্য ছিলো এবং তাতে পাহাড়ী ও জুমিয়াদের সারা বছরের প্রয়োজন মিটেও বাড়তি ফসল বাইরে চালান দেবার অপেক্ষায় থাকতো। যোগাযোগ ও পরিবহনের সুবিধার জন্যে কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, ফেনী প্রভৃতি নদী পথের গুরুত্ব ছিলো সমাধিক। পার্বত্য জেলা রাঙামাটির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত অন্যতম প্রধান নদী কর্ণফুলীর বিভিন্ন শাখা নদী (মাইনী, কাসালং, চেঙ্গী, রাইংক্ষং ইত্যাদি) পার্বত্যাঞ্চলের প্রত্যান্তে প্রবহমান থাকার দরুণ এ-যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুব উপযোগী। যোগাযোগের মূল মাধ্যম ছিলো নৌকা এবং সাম্পান। চট্টগ্রামের মদুনাঘাট, মরিয়ম নগর, চরন্দ্বীপ, শিলক, শিকলবাহা, রাজানগর, কোদালা, গশ্চি, পটিয়া, সাতকানিয়া, নোয়াপাড়া, আঁধারমানিক প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের একাংশের জীবিকার্জনের প্রধান নির্ভরতা হচেছ নৌকোর কাজের ওপর। অনাদি অতীত হতে এ-সব অঞ্চলের দুঃসাহসী নাবিকেরা সমতলী পণ্য বোঝাই নৌকো-সাম্পান নিয়ে নীল পাহাড়ের বুক চিরে চলে যেতো পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম অঞ্চল সমূহে। তাদের এক এক ট্রিপে সময় লাগতো বিভিন্ন মেয়াদের। পুরোপুরি প্রবাসী জীবনযাপনের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ও মানসিকতা নিয়ে তারা পাহাড়ীদের এলাকায় উপস্থিত হতো। পাহাড়ী, বিশেষ করে চাকমাদের সঙ্গে চলতো তাদের পণ্য বিনিময় অথবা বেচাকেনা। এই বেচাকেনার মাধ্যমে পারস্পারিক নির্ভরশীলতার দরুণ ভিন্ন সামাজিকতার আলগা বাঁধন খসে গিয়ে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে ধীরে- ধীরে। চট্টগ্রামী বাঙালীদের সঙ্গে পাহাড়ীদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার মূলে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছাড়াও রয়েছে প্রায় সমভৌগলিকতা এবং আঞ্চলিক ভাষার নিবিড় নৈকট্য। বাংলাভাষার চট্টগ্রামী আঞ্চলিকের সঙ্গে চাকমা ও তংচইঙ্গা ভাষার মিল খুব কাছাকাছি এবং সামিলতার অবদান তো প্রচুর।

এরপরও নিজস্ব প্রয়োজন ও কৌতুহলের তাগিদে বাঙালীরা পাহাড়ী বিভিন্ন ভাষা (মগ, ত্রিপুরা, পাঙখু ইত্যাদি) শিখে নেয় এবং পাহাড়ীরাও বাংলা ভাষার সঙ্গে ক্রমঘনিষ্ঠতার দরুণ এ-ভাষায় পারঙ্গম হয়ে ওঠে। পাহাড়ীদের বিভিন্ন উৎসব ও পার্বনাদিতে বাঙালী মাঝি এবং ব্যবসায়ীরা নিমন্ত্রিত ও আহুত হয়ে তাদের

www.pathagar.com

জীবনাচারের গভীরে প্রবেশের সুযোগ পায়। এতে পাহাড়ীদের নিরাড়ম্বর জীবন প্রনালী, সারল্য ও সহজতার সঙ্গ স্বভাবসরল বাঙালীদের একাত্মতা ঘটে যায় নিতান্তই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এবং রাজনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রীয় হাজার দুর্যোগের পরেও তাদের সে একাত্মতায় ফাটলের সৃষ্টি হয়নি।

বেশী নয়, মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও বাঙালী-পাহাড়ী সম্পর্কে বর্তমানের মতো এতো তিক্ততার সৃষ্টি হয়নি। এখনো এমন পুরনো ব্যবসায়ী ও নৌকা - সাম্পানের মাঝি বেঁচে আছেন, যারা নতুন প্রজন্মের ব্যবসায়ী ও নেয়ে মাঝিদের কাছে নিজেদের অভিজ্ঞতার গল্প করেন। নষ্টালজিয়া-আক্রান্ত এক বৃদ্ধ মাঝির আলাপচারিতা হতে জানা যায় যে, অতীতের, তাঁর ভাষায়, সোনালী অতীতের কথা। আঞ্চলিক ভাষার হার্দ্য উচ্চারণে তাঁর কণ্ঠ আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল আনন্দ-বেদনার অনুরণনে। সে আনন্দ তাঁর জোয়ান বয়সের আর বেদনা এই ভাটি বয়সের। সে বৃদ্ধ হতচকিত, ব্যথিত বর্তমান ঘটনাবলীর অপ্রত্যাশিততায়। তাঁর মতে, সে ছিল শ্রেষ্ঠ সময়, যখন বাঙালী-পাহাড়ী মশগুল হয়ে যেতো দিনের কাজকর্ম শেষে রাতের মজলিশে। রাত কাবার হয়ে যেত, পাহাড়ী মোরগের ডাক শোনা যেতো ওপাশের জঙ্গল হতে আর শেষ রাতের নিস্তব্ধতায় পাহাড়ী হরিণের নিরীহ, বোকাটে চিৎকার রিন রিন করে ছড়িয়ে পড়তো চারদিকে-তবু গল্পের আসর শেষ হতে চাইতো না। কত রাজ্যের গল্প। কতো সুখ-দুঃখের কাহিনী।

রাইংখয়ং খালের ননাধন তংচইঙ্গার কথা আমার এখনো মনে পড়ে। আরো মনে পড়ে সেন্ত্র তংচইঙ্গা, চিকন্যা চাকমা আর মংশুয়ে অঁ মারমার কথা। চট্টগ্রামের বাঙালী নেয়েমাঝিরা যেমন নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয় তেমনি নষ্টালজিয়া- আক্রান্ত হয় তারাও। পঞ্চাশ বছর আগের পাহাড়ী-বাঙ্গালী সম্পর্কের এক সোনালী সময়ের বর্ণনা দিয়েছিলো জনৈক পাহাড়ী বৃদ্ধ। বর্ণনা তো নয়, সে যতক্ষণ বলেছিলো, ততোক্ষণ যেনো সম্পূর্ণ কাহিনীকে একটা ডক্যুমেন্টারী ফিল্মের রীলের মতো ভেসে যাচ্ছিলো আমার চোখের সামনে দিয়ে।

ভোর না হতেই তংচইঙ্গা পাড়ায় সাড়া পড়ে গেছে। পাড়ার সামনে দিয়ে বহমান কর্ণফুলীর ঘাটে এসে ভিড়েছে বিশখানা নৌকো-সাম্পান। তংচইঙ্গা শিশুরা ঘুমভাঙা ফোলা মুখ আর কুতকুতে চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছে। বৌ-ঝিদের মুখে চাপা হাসির ঝিলিক-বাঙ্গাল এইচ্ছে। হেডম্যান, কারবারী আর পাড়ার বয়স্করা এসেছে 'বাঙ্গাল'দের কুশল জানার জন্যে, বাড়ি-ঘরের খোঁজখবর নেবার জন্যে। ঘাট সংলগ্ন প্রশস্ত গোল কিংবা চৌকো ঘরে বসেছে আড্ডা। বাঁশের নলী হুঁক্কায় পাহাড়ী তামাক পুড়ছে গুরুক গুরুক। গল্প-গুজবে গুলজার হয়ে উঠেছে ভোরের নির্জন ঘাট।

www.pathagar.com

পাহাড়ী-বাঙ্গালীদের মাঝে সম্প্রীতি সব সময় ছিল এবং আছে।

www.pathagar.com

পাহাড়ী-বাঙ্গালীদের মাঝে সম্প্রীতি সব সময় ছিল এবং আছে।

www.pathagar.com

একটু পরেই শুরু হয়েছে কেনাবেচা। দরদস্তুর আর জিনিস পত্রের গুণাগুণ বর্ণনা। সারাদিন পার হলো এভাবে। ন্যায্য মূল্যে ন্যায্য মালপত্র বেচাকেনার পর বিশ্রাম। নৌকো-সাম্পানের নেয়ে-মাঝিদের রাতের খানা পাকাবার তোড়জোড়। সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে আবার রাতের আড্ডায় চলবে গান বাজনা, গল্পগুজব। তামাকপোড়া গন্ধে কট কটে উঠবে চারদিক। এর মধ্যে এসে গেছে 'ডালা'। নৌকো-সাম্পানের মাঝিদের খাবার। খাবার নয়, খাবার বানানোর সরঞ্জাম। সরু চাউল, মুগ ডাল, আনাজ আর ইয়া বড় বড় খাসী মোরগ। 'বাঙাল' তখন ক্রেতা নয়, কেনাবেচার পর সম্মানিত মেহমান।

এ-সবের বন্দোবস্ত করবে হেডম্যান আর কারবারীরা। পাড়া হতে চাঁদা তোলার মতো করে। 'বাঙাল' তো 'মুছল মান্যা' শুকরের মাংস খায়না তারা। সুতরাং পাহাড়ীদের রান্না খেতে কী জানি হয়তো মনে-টনে করে। তার চেয়ে তারাই রান্নবান্না করে খাক তাদের মতো করে। পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধের এমন দৃষ্টান্ত ছিল তখন স্বাভাবিক।

নষ্টালজিয়া-আক্রান্ত এ-সব বৃদ্ধ মাঝি এবং পাহাড়ীদের গল্প হয়তো অতিরঞ্জন রয়েছে, হয়তো এর পিছনে তাদের সরল আবেগ অতি মাত্রায় ক্রিয়াশীল, তবু এ থেকে একটি জিনিস পরিস্কার ভাবেই উপলব্ধ হয় যে, সেকালে বর্তমানের ন্যায় পারস্পারিক হানাহানি ও দ্বন্দ্বে বাঙালী-পাহাড়ী সম্পর্ক পঁচন ধরেনি। নিশ্চিতভাবেই তৎকালীন সম্পর্ক ছিলো আনন্দ ও শুভেচ্ছার প্রাচুর্যে ভরা। তাই হয়তো বর্তমানের অস্বাভাবিকতা ও জটিলতা নির্বিরোধী বাঙ্গালী-পাহাড়ী বৃদ্ধদের মনোকষ্টে ভোগায়। পুরনো বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের স্মৃতি তাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে।

এখন সমস্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে বাঙালী-পাহাড়ী সম্পর্কের ক্রমাবনতি প্রকট হয়ে উঠেছে। নেতৃত্ব পর্যায়ের কিছু ভ্রান্ত পদক্ষেপ এবং অর্থহীন সেন্টিমেন্টের ফলে সৃষ্ট সঙ্কটাবস্থার শিকারে পরিণত হয়েছে শান্তিপ্রিয় মানুষ। জনসংহতি সমিতির ক্রমহঠকারিতা এবং উস্কানীর ফলে আপামর পাহাড়ী জনগোষ্ঠী বিরুপ মনোভাব পোষণ করতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে বাঙালীদের প্রতি। তাদের নতুন প্রজন্ম বুদ্ধি হবার পর হতে পেয়ে আসছে বাঙালী বিমুখতার সবক। পক্ষান্তরে জনসংহতি সমিতির ক্রমাগত নিরীহ বাঙালীদের কোনঠাসা করার যে নোংরা সহিংসতার রাজনীতি কারো অজানা নয়। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে চিন্তা করলে এর ফল অশুভ হতে বাধ্য।

আজকের দিনে আমরা চাইনা প্রতিদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে চলুক নোংরা রাজনীতি ও সহিংসতা। চাইনা নিরীহ পাহাড়ীরা ধুঁকতে থাকুক কেঁচোর মতো। আমাদের কাম্য নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে বাঙালী কোন উপজাতি বা সম্প্রদায়ের ওপর সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভূগুক। সংখ্যাগরিষ্টদের দায়িত্ববোধ আমাদের বেশি থাকা উচিত। কোন কাজে যেনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হীনমন্যতাক্রান্ত হয়ে হতাশা ও নৈরাজ্যে নিপতিত

www.pathagar.com

না হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো বাংলাদেশের মাটিতে বেঁচে থাকুক তাদের স্ব স্ব জীবনাচার, সংস্কৃতি তথা আত্মিক উদ্দীপ্ততা ও আর্থিক সমৃদ্ধি নিয়ে। মানবতার শান্তি বিনষ্টকারী অর্বাচীনদের কাছে তাই আমাদের আহবান তারা যেন তাদের সত্যিকারের শুভবুদ্ধিকে কাজে লাগায়। কারণ, বোঝা উচিত যে, মূলতঃ এই পৃথিবীতে এমন কোন সমস্যা নেই, মানুষ যার সঠিক সমাধান খুঁজে পায়নি। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে, আমাদের নষ্টালজিয়া- আক্রান্ত পূর্বপুরুষদের সোনালী সময়ের সন্ধান আমরাও পাবো।

পাহাড়ী-বাঙ্গালীর অনেক যুগের পুরনো সম্প্রীতিকে নষ্ট হতে দেয়া যায় না। তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী হয়ে পার্বত্য এলাকায় স্ব স্ব ধর্ম, কৃষ্টি ও আবেগকে লালন করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হিসেবেই বাস করতে হবে। সম্প্রীতি না থাকলে শান্তি আসবে না ফলে বিঘ্নিত হবে উন্নয়ন কর্মকান্ড, আসবে না কোন সাহায্যকারী ব্যবসায়িক ও উন্নয়নমূলক সংস্থা। অনগ্রসর থেকেই যাবে অত্র এলাকা, ক্ষতিগ্রস্থ হবে ভবিষ্যত প্রজন্ম। এ বিষয়টাকে সামনে রেখে সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সুষ্ঠু প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

www.pathagar.com

পার্বত্যবাসীদের নেতৃত্ব সংকট

পার্বত্য সমস্যা। বাংলাদেশের অতি পুরনো একটি উপজাতীয় সমস্যা। এই সমস্যার কারণে বলি হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। পাহাড়ীরা হত্যা করেছে নিরীহ বাঙ্গালীদের, বাঙ্গালীরাও বসে থাকেনি, আত্মরক্ষার্থে পাল্টা আঘাত হেনেছে। অপহৃত হয়েছে শত শত বাঙ্গালী ও উপজাতি। সংঘর্ষের কারণে গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়েছে, আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়েছে শত শত বাড়ি। অগণিত পাহাড়ী দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। বরণ করে নিয়েছে উদ্বাস্তু জীবন। শুধু রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক দিকই নয় পার্বত্য সমস্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অর্থনীতিরও। রাস্তা-ঘাট, শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেনি, পর্যটন শিল্প দাঁড়িয়েছে ধ্বংসের মুখোমুখি, বিদেশীরা পুঁজি বিনিয়োগ থেকে পিছু হটেছে। এতে করে দেশ কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে বাধাগ্রস্থ। এমন একটা পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির তারিখ ০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭। তাৎক্ষণিক এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছিল। অধিকাংশ শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছিলো। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্রসমর্পণ এবং পুনবার্সনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছিলো। সকলের প্রত্যাশা ছিলো যে পাহাড়ে শান্তি ফিরে আসবে, সন্ত্রাসী সশস্ত্র গ্রুপ পিসিজেএসএস বা তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র জমা দেয়ার মাধ্যমে দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অশান্ত নৈরাজ্যের নগরী এই পার্বত্যাঞ্চলে শান্তির পদযাত্রা সুচিত হবে। সারাদেশে তথা বিশ্ববাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলো এই ভেবে যে, এবার বোধ হয় এই অশান্ত ভয়াল জনপদে শান্তির সুশীতল বাতাস বইবে। কিন্তু দেশবাসীর এই আশা আর বেশিদিন স্থায়ী হলোনা শান্তি চুক্তির সকল চিন্তা ও চেতনা ভন্ডুল পর্যবসিত হয়েছে চুক্তি পরবর্তী সময়ে ঘটতে থাকা হিংসাত্মক ও অনৈতিক কার্যকলাপের ফলশ্রুতিতে। এখানকার বিভিন্ন সন্ত্রাসী দল জেএসএস, ইউপিডিএফ এবং অন্যান্য ছোট-খাটো গ্রুপগুলোর মধ্যে ক্রমাগত রক্তক্ষয়ী হিংসাত্মক সংঘর্ষ, পাহাড়ী বাঙালীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, জোরপুর্বক নিরীহ জনগণকে ঝুম চাষে বাধ্য করা, বনজ সম্পদের অবৈধ পাচার ও মাদক/অস্ত্র ব্যবসা ইত্যাদির মতো সন্ত্রাসী ও অবৈধ কার্যকলাপ শুধুমাত্র শান্তি চুক্তির জন্য হুমকি স্বরূপই নহে বরং প্রতিবেশী দেশগুলোর মদদপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলোর পুণরায় কোন এক বড় ধরনের সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতির ভয়াবহ ইংগিত বহন করে। তা না হলে শান্তি চুক্তিকালীন সময়ে শান্তিবাহিনী এতো বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেয়ার পরও তাদের নিকট বর্তমানে এসব অস্ত্র

www.pathagar.com

ও গোলাবারুদ আসবে কোথা থেকে। প্রশ্ন হচ্ছে -তারা সত্যিই সকল অস্ত্র জমা দিয়েছিলো?

আমাদের দেশের বহু বড় বড় সাংবাদিক ও কলামিষ্ট আছেন যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত পরিস্থিতি সরেজমিনে অবলোকন না করে ঢাকার মাটিতে বসে পার্বত্য সমস্যা সম্পর্কে মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন, বক্তৃতা বিবৃতি আর সেমিনারের মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন দেশ তথা জাতির গর্ব আমাদের সেনাবাহিনী সম্পর্কে। কিন্তু তারা বুঝতেও পারছেন না যে, প্রকৃত পরিস্থিতি সরেজমিনে বিবেচনা না করে কারো মিথ্যা উস্কানিতে মানবাধিকারের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে অহেতুক হৈচৈ করে তারা বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে মানবাধিকার লংঘনকারী বর্বর দেশ হিসেবে উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশের ভাবমুর্তি কতটুকু ক্ষুন্ন করছেন। এটা একজন সচেতন ও বুদ্ধি দীপ্ত নাগরিকের নিকট হতে কখনোই কাম্য নয়। তাই শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না করে সকল প্রকার বৈরিতা, সংকীর্ণতা, জিঘাংসা ভুলে গিয়ে পার্বত্য এলাকার অনগ্রসর মানুষগুলোর কথা, দেশের অর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের কথা সর্বোপরি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কথা ভেবে সবাই মিলে সংবিধানের আলোকে এই পার্বত্যচুক্তি কার্যকর করা উচিৎ। বাংলাদেশের পার্বত্য ভুখন্ডের অপরূপ প্রকৃতির শান্ত সৌম রূপ ঢাকা পড়ে গেছে সংঘাত-দ্বন্দ্বের উত্তালতায়। যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে অনেক দিনের অনেক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে, তার থেকে মুক্তির পথ খুঁজছেন এখন সবাই। দ্বন্দ্বের চেয়ে মিলন, সংঘাতের চেয়ে সহাবস্থান, যুদ্ধের চেয়ে শান্তি সর্বকালে সকল মানুষের কাম্য। আমাদের আপন ভুখন্ডের সাম্প্রতিক দুঃখজনক করুণ বাস্তবতা থেকে উত্তরণের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সংবেদনশীলতা, মমত্ব ও পারস্পারিক উপলব্ধি। যত নিবিড়ভাবে আমরা জানবো একে অপরকে বুঝবো পরস্পরের মানস, ততো বেশি আমরা সংঘাত এড়িয়ে শান্তির ধারাকে বলবান করতে পারবো।

আজ সারাদেশে গণতন্ত্রের জোয়ার এসেছে। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে উঠেছে বিভিন্ন ছাত্র ঐক্য ও সংগঠন। তাদের প্রদত্ত বিভিন্ন বিবৃতি ও প্রচারপত্র দেশের আপামর জনগোষ্ঠিকে ক্রমশঃ সচেতন করে তুলেছে। দেশে ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এ সচেতনতা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত প্রচারণা যত বেড় চলেছে, মিথ্যার গাঢ় প্রলেপ ভেদ করে সত্য উদঘাটনের সম্ভাবনা তত বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নিরপেক্ষ পর্যালোচনা, বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান পরিস্থিতির সঠিক চিত্রটি জনগণের সামনে তুলে ধরবে বলে আশা করা যায়। সেখানে একেকবার একেকটি নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ঘটে আর আমরা দূরে বসে কিছু হায়

www.pathagar.com

আফসোস, প্রতিবাদ আর নিন্দা প্রকাশ করে চুপ হয়ে যাই। ভুলে যাবার চেষ্টা করি হয়তো। কিন্তু নিরীহ মানুষগুলি পড়ে রয়েছে ঘাতকদের সহজ নাগালের মধ্যে। পাকিস্তানী হানাদার রাজাকারবেষ্টিত একাত্তরের জনপদে আমাদের দিবা-রাতগুলি যেভাবে কাটতো প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর আশংকা নিয়ে তাদের দিনরাত তেমনই বিভীষিকার মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে। দায়িত্ববোধ থাকলে এটা আমাদের ভুলে যাবার কথা নয়। তাদের রক্ষা করার জন্য ভিন্নতর কোন কৌশলের কথা চিন্তা করা দরকার। ভারতের সহিত এ ব্যাপারে ভাল করেই বুঝাপড়া হওয়া দরকার। পার্বত্য সন্ত্রাসীদের নাশকতামুলক কার্যকলাপ, ভারতের মাটিতে বসেই নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে, এটা কোন গোপন কথা নয়। এজন্য পার্বত্য এলাকায় আলোচ্য সমস্যা নির্ধারণ অর্থাৎ সশস্ত্র লোকদের আনাগোনা রোধ করার জন্য আরো নিশ্চিত কার্যকরী ব্যবস্থা দরকার।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল এলাকার অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। একথা সত্য যে এমনকি স্বাধীনতা পূর্ব সময়ের যে কোন পরিসংখ্যানে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে উপজাতীয়দের অংশ ছিল খুবই নগণ্য কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিকতা ও উদ্যোগের ফলে গৃহীত ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এ এলাকায় অর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন উপজাতীয় ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সংরক্ষণ ও শাশ্বত ঐতিহ্যের ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে তা উত্তরোত্তর উন্নয়ন সাধনে বিভিন্ন কল্যাণমুখী প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে বরাবরই ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের একগুয়ে অযৌক্তিক মনোভাবের জন্য বৈঠকগুলো আলোচনার কোন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই জনসংখ্যা সমস্যা জর্জরিত ও দারিদ্র পীড়িত অউপজাতীয় জনগোষ্ঠি অপেক্ষাকৃত লঘু বসতিপুর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করতে আগ্রহী হয়। ১৯৮৬-৮৮ সালে পার্বত্য জেলা সমুহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অউপজাতীয়রা সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র আক্রমণের শিকার হয়। হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে যেতে থাকে একের পর এক। সন্ত্রাসীদের পাশবিকতায় উম্মত্ত অউপজাতীয়রা কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার্থে প্রতিশোধ স্পৃহায় ঝাপিয়ে পড়ে উপজাতীয়দের উপর। এ সাম্প্রদায়িক দাংগায় ভীত সন্ত্রস্ত উপজাতীয়রা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী হয় যদিও এব্যাপারে শান্তিবাহিনীর উস্কানী ছিল। এ পুরো ব্যাপারটিই ছিল সন্ত্রাসবাদীদের পুর্ব পরিকল্পিত ও তাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট ঈংগিতে সৃষ্টি।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের নেয়া অন্যান্য পদক্ষেপগুলোর মত উপজাতীয় ও অউপজাতীয় গুচ্ছ গ্রামের ব্যাপারেও অনেকের ভিন্ন মত রয়েছে। অনেকে এ গুলোকে সুপরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত বন্দিশালাও বলেছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে সে রকম মনে হলেও গুচ্ছগ্রাম গড়ে তোলার পিছনে সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করছে তা বিবেচনা না করে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা ঠিক হবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন ভাবে পাহাড়ের চুড়ায় চুড়ায় বাঁশ ও ছনের ঝুম ঘর বানিয়ে বাস করে। এসব ঝুম ঘরও আবার স্থায়ী নয়। প্রতি বছর ঝুম চাষের স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের ঝুম ঘরও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নতুন করে বাঁধতে হয়। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে বেশী মাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠার সাথে সাথে এই বিপুল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুফল এসব দরিদ্র, যাযাবর, অশিক্ষিত পার্বত্যবাসীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের কেন্দ্র থেকে দুরপ্রান্তে অবস্থিত গহীন অরণ্যের সংঘাত নিরসন করা হলেও চুড়ান্ত শান্তি যে আরো সময়ের ব্যাপার তা অনুধাবন করতে কারো কষ্ট হবার কথা নয়।

একদিকে যখন পার্বত্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছিল ঢাকায়, অন্যদিকে তখন পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে মেতে ছিলেন বসতি স্থাপনকারী বাঙালী জনগোষ্ঠি। শুধু পাহাড়েই নয়, জাতীয় রাজনীতিও হয়ে পড়ে দ্বিধা-বিভক্ত। পার্বত্য ইস্যু পরিণত হয় বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় রাজনীতিক ইস্যুতে। জাতিগত সংঘাত মীমাংসা বা পার্বত্যচুক্তির প্রসঙ্গ বাদ দিলেও উন্নয়ন, বিদেশী বিনিয়োগ, প্রাকৃতিক সম্পদ-গ্যাস-ভু-রাজনৈতিক গুরুত্বের প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু বর্তমানকে পেরিয়ে আসছে একবিংশ শতকে সম্প্রসারিত হয়েছে তবে বর্তমান প্রেক্ষিতে এই ইস্যু যে, জাতীয় রাজনীতিসহ আন্তর্জাতিক-আঞ্চলিক-অর্থনৈতিক-একাডেমিক এবং তাত্ত্বিক পরিমন্ডলকে পর্যন্ত প্রবলভাবে আলোড়িত করেছে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়। 'পার্বত্যচুক্তি' জন্ম দিয়েছে নতুন উত্তেজনার। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুর চির অবসান ঘটানো সম্ভব হলো না। পাহাড় ও অরণ্যের রাখি বন্ধনে চির সবুজ পার্বত্য চট্টগ্রাম কেবল বাংলাদেশেরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর একটি অন্যতম দৃষ্টিনন্দন স্থান। বিগত দুই দশক ভাল ছিল না পার্বত্য অঞ্চল পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসী ও বাঙ্গালীরা। সবুজ পাহাড়ে জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের লাল অগ্নিশিখা। নৈসর্গিক জনপদ হয়ে উঠেছিল রক্ত, মৃত্যু, আর্তনাদের ভয়াল উপত্যকা। পার্বত্যচুক্তি সংঘাত অবসানের মাধ্যমে শান্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে, কিন্তু স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করতে পরেনি। পাহাড়ে বসবাসকারী কতিপয় পাহাড়ী বাঙালী এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তীব্রভাবে বিরুদ্ধাচরণ করছে পার্বত্যচুক্তির। পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরণ্যের সংঘাত এখন জাতীয় রাজনীতিকেও গ্রাস করেছে। ফলে পার্বত্য শান্তির

www.pathagar.com

পার্বত্য অঞ্চলে সমন্বিত নেতৃত্ববিহীন বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের দৃশ্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া ছাড়া নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। সংঘাত নিরসনে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনাও চলেছে পাশাপাশি। এবং সে ধারায় ১৯৯৭ সালে পার্বত্যচুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। পার্বত্যচুক্তির পর পার্বত্য সমস্যা একটি জাতীয় বিষয় রুপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সন্ত্রাস বনাম শান্তির প্রেক্ষাপটে যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আমরা আমাদের চোখের সামনে পাচ্ছি, তাকে শান্তির পক্ষে, ঐক্যের পক্ষে প্রভাবিত করতে হবে। একবিংশ শতকের সীমাহীন চ্যালেঞ্জ জয় করতে হবে সম্মিলিত শ্রমে-মেধায়-মননে। পিছিয়ে পড়া বাঙালী, পিছিয়ে পড়া পাহাড়ী- সবাইকে উন্নয়নের মূলস্রোতে এনে গড়তে হবে সৌহার্দ্যপূর্ণ, গতিশীল, সমৃদ্ধ বাস্তবতা, বিজয়ী ভবিষ্যৎ। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি অন্যতম জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে এর সমাধানে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। একটি দ্রুত ও স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। দেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রমনা দূরদর্শী বুদ্ধিজীবীরা পদ্ধতিগত আলোচনার মাধ্যমে সঠিক দিক নির্দেশ করতে পারবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সকল পদক্ষেপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশ, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন কর্তৃক স্বীকৃত ও বহুল প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষিতে যে কোন জাতীয় বা অন্তর্জাতিক পরিদর্শক দলের পক্ষপাতহীন পর্যবেক্ষণ ও সঠিক পর্যালোচনার মাধ্যমে একথা সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হবে যে, শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোন সরকারেরই ঐকান্তিক সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার অভাব কোন কালে কোন স্তরেই ছিল না। এখন শুধু প্রয়োজন আমাদের সম্মিলিত ও ঐকান্তিক প্রয়াস যাকে কাজে লাগিয়ে আমরা এ অশান্তির লেলিহান শিখাকে পর্যুদস্ত করে পাহাড়ে আবার ফিরিয়ে আনতে পারি শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পার্বত্য চুক্তির ব্যাপারে ঐ অঞ্চলের অধিবাসী উপজাতি ও অউপজাতি জনগনের মাঝে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। উপজাতিদের অনেকেই সন্তু লারমাকে তাদের একমাত্র নেতা ও জেএসএস কে একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে মেনে নিতে রাজী নয়। জেএসএস নেতৃবৃন্দদের তারা তাদের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে মেনে নিতে পারছে না তাদের বৈষম্যমুলক ও স্বার্থান্বেষী আচরনের জন্য। সন্তু লারমা কোন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নয়। হয়তো কোন এক সময়ে তিনি সশস্ত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে তার জনসমর্থন যাচাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে তার গ্রহনযোগ্যতা কমেছে অনেকখানি।

সহিংসতা, নোংরা ও স্বার্থান্বেষী রাজনীতির মাধ্যমে যে, শান্তির উত্তরণ ঘটতে পারে না পার্বত্য এলাকার জনগণ তা বর্তমানে বুঝতে শিখেছে। যদিও জেএসএস ও

www.pathagar.com

ইউপিডিএফ ইত্যাদি সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলগুলোর অস্ত্রের ভয়ে জনগণ মুখ খুলছে না- কিন্তু তাদের সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যত, জীবনের নিরাপত্তা, আর্থিক উন্নয়ন ইত্যাদির জন্যে শান্তিময় পরিবেশের যে আকুতি তা আজ পার্বত্য এলাকায় স্পষ্ট হয়ে অনুভূত হচ্ছে। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিষয়টি সকল মহলের বুঝা উচিত, একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠির ক্ষুদ্র একটি অংশের দাবি-দাওয়ার উপর ভিত্তি করে পুরো এলাকার সকল জনগনের শান্তি নিশ্চিত করা যাবে না। এ বিষয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুত্র ধরে যথাযথভাবে নেতৃত্ব ও দল ইত্যাদির ক্ষেত্রে জনসমর্থন যাচাই সাপেক্ষে সরকারের বা অন্যান্য দাতা গোষ্ঠীর শান্তি ও উন্নয়নের চেষ্টা করা উচিত। নইলে সমস্যার সৃষ্টি হতেই থাকবে।

www.pathagar.com

পার্বত্য অধিবাসীর ঐক্যবদ্ধ সমন্বিত আন্দোলন প্রয়োজন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরবর্তী সময়ে ৩/৪ বৎসর পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিস্থিতি বেশ শান্ত এবং প্রশাসন তথা সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নানা সহিংস রাজনৈতিক কার্যক্রম যেমনঃ মিছিল, সভা, সমাবেশ, অবরোধ ও হরতাল পালনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত করে তোলা হচ্ছে। সম্প্রতি জেএসএসকে চুক্তি বাস্তবায়ন সহ মোট চার দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রাজনৈতিকভাবে বেশ কর্মতৎপর পরিলক্ষিত হচ্ছে। জেএসএস নিজেদেরকে পুনর্গঠিত করার লক্ষ্যে পাড়া/গ্রাম পর্যায়ে সাংগঠনিক কার্যক্রমকে জোরদার করে তুলছে। অপরদিকে ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবিতে অপেক্ষাকৃতভাবে স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে। চুক্তি বাতিল ও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে জেএসএস ও ইউপিডিএফ এর মধ্যে বিরোধ থাকলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইউপিডিএফকে, জেএসএস এর বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে সমর্থন করতে দেখা গেছে। রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি উভয় দলই চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি অনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে পরিস্থিতি অশান্ত করে তুলেছে এবং জনসাধারনের মধ্যে একটি ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে। জেএসএস এবং ইউপিডিএফ এর বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিবাদে এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে দেশের মূল ধারার রাজনীতির ন্যায় বাঙালী অধিবাসীরাও বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জেএসএস, ইউপিডিএফ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে একত্রিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা না করে বিচ্ছিন্নভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের দাবি আদায়ের প্রচেষ্টা তো কোন গতি নিচ্ছেই না বরঞ্চ পরিস্থিতি আরো বেশি অশান্ত হয়ে উঠেছে এবং অবিশ্বাস, বিভ্রান্তি ও অনৈক্যের বিষেদাগার ছড়িয়ে পড়ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত বাঙালী ও পাহাড়ীরা যদি যোগ্য নেতৃত্বের অধীনে একত্রিত হয়ে একটি মাত্র সমন্বিত মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে তাহলে পরিস্থিতি অতি সহজে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে বা থাকবে।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকার পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দলের কর্মকান্ড নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

জেএসএস ঃ সম্প্রতি জেএসএস চুক্তি বাস্তবায়ন সহ প্রধান চারটি দাবি আদায়ের

www.pathagar.com

লক্ষ্যে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে চাপের মুখে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি তারা বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমেও পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তুলছে। সাম্প্রতিক কালে জেএসএস এর বিভিন্ন কর্মকান্ড নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে একজন পূর্ণ মন্ত্রীর নিয়োগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে জনাব ওয়াদুদ ভূঁইয়ার অপসারণ ও তদস্থলে একজন উপজাতি ব্যক্তিকে নিয়োগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর সকল অস্থায়ী পোষ্ট/ক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবিতে জেএসএস আন্দোলনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২। রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি জেএসএস তাদের সশস্ত্র দলকে পূনর্গঠিত করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে বলে বিভিন্ন সুত্র থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে। গত ০১ মার্চ ২০০৪ তারিখে পানছড়ি কলেজ গেইট এলাকায় পানছড়ি থানা জেএসএস এর এক সভায়, সভাপতি ভবদত্ত চাকমা ঘোষনা করেন যে, আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের জন্য বরাদ্দকৃত রেশনের নির্দিষ্ট পরিমাণ চাউল বিক্রি করে দলের জন্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয় করা হবে। এছাড়া আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যরা পুনরায় সংগঠিত হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার জন্য গভীর অরণ্যে পুনরায় ক্যাম্প স্থাপন করছে বলেও জানা যায়।

৩। প্রতিপক্ষ দল হিসেবে ইউপিডিএফকে রাজনৈতিক ভাবে দেউলিয়া এবং তাদের অস্তিত্বকে শেষ করে দেয়ার জন্য জেএসএস ইউপিডিএফ এর সদস্যদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, অপহরণ, এমনকি হত্যা করছে। ইতিমধ্যে খালি হয়েছে কত মায়ের বুক। জেএসএস এর বক্তব্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের দল ছাড়া আর কোন দল রাজনীতি চর্চা করতে পারবে না - এটাতো গণতান্ত্রিক রাজনীতির পরিপন্থি।

৪। ইউপিডিএফ রাজনৈতিকভাবে তেমন সুসংগঠিত না হওয়ায়, জেএসএস নানা কৌশলে ইউপিডিএফ এর সমর্থকদের মধ্যে ফাটল বা ভাংগন ধরানোর চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

৫। জেএসএস পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বস্তরের ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, কর্মচারী, কর্মকর্তা, বাস মালিক এবং অন্যান্য পরিবহন মালিকদের নিকট থেকে নিয়মিত হারে নির্দিষ্ট পরিমাণে চাঁদা আদায় করছে। কেউ অপারগতা প্রকাশ করলে তার উপর নেমে আসে প্রাননাশের হুমকি। চাঁদার মাধ্যমে তারা জনগণকে অতিষ্ট করে তুলেছে।

www.pathagar.com

৬। জেএসএস বিভিন্ন সময়ে নাশকতামূলক এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করে ইউপিডিএফ এর উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে, ইউপিডিএফকে সন্ত্রাসী দল হিসাবে পরিচিত করে তোলার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

৭। পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানরত অনেক বাঙ্গালীদেরকেও নানা কৌশলে জেএসএস তাদের দলের সমর্থক হিসেবে কাজ করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য বাঙ্গালীদের ও ইউপিডিএফ এর বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য তাদের ব্যবহার করছে।

৮। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন এলাকায় জেএসএস তাদের প্রাধান্য বিস্তার বৃদ্ধি করে চলেছে। ইউপিডিএফ এর কার্যক্রম/প্রাধান্যকে সীমিত/হ্রাস করার জন্য জেএসএস তৎপর রয়েছে। আবার অনেক এলাকায় তাদের আধিপত্য বা প্রাধান্যতা ও জনসমর্থন শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

৯। নিরাপত্তা বাহিনী তথা সরকারের সুনামকে ক্ষুন্ন করার জন্য জেএসএস বিভিন্ন ভাবে তৎপর রয়েছে বা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে নিরীহ জনগণকেও প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১০। চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের দীর্ঘ সুত্রিতাকে উল্লেখ করে সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছেএবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পক্ষে সমর্থন জোগানোর জন্য জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি জে এস এস নেতাদের বক্তৃতার মাধ্যমে সরকারকে আবার সশস্ত্র আন্দোলনের হুমকি দিতেও শোনা গেছে।

১১। সামান্য যেকোন ইস্যুতেই জেএসএস পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ উপজাতিদেরকে সেনাবাহিনী তথা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১২। জেএসএস এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ঢাকাস্থ বিভিন্ন বিদেশী এ্যামব্যাসেডর বা হাই কমিশনে যোগাযোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে বহিঃর্বিশ্বের সমর্থন লাভের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইউপিডিএফ ঃ রাজনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত কম তৎপর পরিলক্ষিত হলেও ইউপিডিএফ অপহরণ, চাঁদা আদায়, হত্যা ইত্যাদি অনৈতিক ও নাশকতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় সার্বিক পরিস্থিতি অশান্ত করে তুলেছে। সাম্প্রতিকালে ইউপিডিএফ এর বিভিন্ন কর্মকান্ড নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। পার্বত্য চুক্তির বিরোধীতা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবিতে ইউপিডিএফ রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও দলে কোন অভিজ্ঞ এবং প্রবীণ নেতা না থাকায় তারা রাজনৈতিক কর্মকান্ড খুব বেশি জোরদার করতে পারেনি।

www.pathagar.com

২। জেএসএস এর ন্যায় শক্তিশালী না হওয়ায় এবং সমর্থকদের সংখ্যা কম থাকায় ইউপিডিএফ ক্রমেই বিভিন্ন এলাকায় তাদের স্থাপিত কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলছে।

৩। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে খুব একটা বেশি সুবিধা করতে না পেরে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের পথে বেশি অগ্রসর হচ্ছে। অত্র এলাকায় সন্ত্রাস, চাঁদা আদায়, অপহরণের মাধ্যমে মুক্তিপণ আদায়, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে এবং পরিস্থিতি অশান্ত করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৪। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য এবং জেএসএস এর সশস্ত্র দলকে মোকাবেলার জন্য ইউপিডিএফ অস্ত্র ক্রয় করছে এবং তাদের সশস্ত্র দলকে সুসংগঠিত করছে বলে জানা যায়।

৫। ইউপিডিএফ-এ এমনিতেই অভিজ্ঞ নেতার সংখ্যা কম থাকায় এবং তারা এলাকায় অনুপস্থিত থাকায়, সর্বোপরি জেএসএস এর ইন্ধনে ইউপিডিএফ এর মধ্যে ভাংগন শুরু হয়েছে এবং ক্রমেই ইউপিডিএফ রাজনৈতিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়ছে।

৬। ইউপিডিএফ এর স্থানীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে থানায় বিভিন্ন মামলা থাকায় তারা প্রকাশ্যে তেমন কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারছেনা, আর সেই সুযোগে জেএসএস তাদের (ইউপিডিএফ) সমর্থকদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে দলছুট করাচ্ছে।

৭। স্থানীয় বাঙ্গালীদের সাথে ইউপিডিএফ সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলার চেষ্টা করছে। জেএসএসকে প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন/শক্তি সঞ্চয় করার পাশাপাশি তারা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি জোরদার করবে বলে জানা যায়।

৮। দল গঠনের পর পরই রাঙ্গামাটিতে তিনজন বিদেশী অপহরণের সাথে জড়িত থাকায় আন্তর্জাতিকভাবে ইউপিডিএফ একটি সন্ত্রাসী দল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থন লাভে ব্যর্থ হওয়ার কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের তেমন কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছেনা। সেজন্যে তারা তাদের রাজনৈতিক কৌশল পরিবর্তন করছে।

৯। আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থন লাভে ব্যর্থতা, রাজনৈতিক অঙ্গনে সামান্য অগ্রগতি, ক্রমান্বয়ে সমর্থকদের সংখ্যা কমে যাওয়া, দলে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব এবং সর্বোপরি জেএসএস এর চাপের মুখে যে কোন সময়ে ইউপিডিএফ জেএসএস এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে পরে বলে ধারনা করা হচ্ছে। তদুপরি এদুটি দলই বাম রাজনীতিক আন্দোলন ও আদর্শের অনুসারী।

www.pathagar.com

পার্বত্য বাঙালী অধিবাসী ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ক্রমেই বাঙালী অধিবাসীদের সংখ্যা উপজাতীদের সংখ্যার চাইতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংখ্যায় বাঙালী অধিবাসী বেশী হলেও তারা সুসংগঠিত কোন রাজনীতি বা আন্দোলনের সৃষ্টি করতে পারেনি। বাঙালীরা ব্যস্ত রয়েছে নিজেদের মধ্যে কোন্দল, ব্যক্তিস্বার্থ ও হীন রাজনীতি নিয়ে। সাম্প্রতিক কালে পার্বত্য এলাকায় বাঙালীদের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। দেশের অন্যান্য এলাকার ন্যায় অত্র এলাকায় বাঙালীরা নোংরা রাজনীতি ও ব্যক্তিস্বার্থ চারিতার্থ করণে ব্যস্ত রয়েছে।

২। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বাঙালীরা বিভিন্ন মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি করছে এবং একতা বিনষ্ট করছে। বাঙালীদের এই বিভক্ত ও কোন্দল পার্বত্য এলাকার বিরাজমান উপজাতি-বাঙালী সম্প্রীতির জন্য হুমকি স্বরূপ।

৩। চুক্তির পর চুক্তির বিরোধীতা করে অত্র এলাকার বাঙালী অধিবাসীরা পার্বত্য গণপরিষদ, পার্বত্য বাঙালী পরিষদ, পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ, পার্বত্য বাঙালী ছাত্র পরিষদ ইত্যাদি ব্যানারে তাদের আন্দোলন চালিয়ে আসছে। অতি সম্প্রতি 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সম অধিকার আন্দোলন কমিটি' নামে বাঙালীদের নতুন একটি সংগঠনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। একত্রিত না হয়ে বাঙালী অধিবাসীরা এভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তাদের আন্দোলন পরিচালনা করছে যা বাঙালীদের শক্তি হ্রাস করছে। কোন সমন্বিত আন্দোলন গড়ে উঠছেনা।

৪। বাঙালীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকার পাশাপাশি কিছু সংখ্যক বাঙালী জেএসএস এবং ইউপিডিএফকে পরোক্ষ/প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য সহযোগিতা করছে।

৫। বাঙ্গালীদেরকে একত্রিত করে পার্বত্য অঞ্চলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা সার্বিক পরিস্থিতি বাঙালীদের নিয়ন্ত্রণে রাখার কোন প্রচেষ্টাই পরিলক্ষিত হচ্ছেনা।

৬। বাঙালীদের মধ্যে প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং কৌশলী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি না থাকায় তাদের একত্রিত করে একটি সংগঠনের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছেনা।

৭। সর্বোপরি রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও সামাজিক স্বার্থকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করনে বাঙালী নেতারা ব্যস্ত রয়েছে। তুচ্ছ বিষয় বা ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ছে। রাজনৈতিক/ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পরস্পর

www.pathagar.com

বিরোধী কার্যকলাপ পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান উপজাতি-বাঙালীদের সম্প্রতি এবং আইন-শৃংখলার প্রতি হুমকি স্বরুপ। তুচ্ছ বিষয়/ঘটনা নিয়ে থানা পুলিশ, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি অসহনশীলতার পরিচয়। সহনশীল সুঃস্থ রাজনীতি সকলে পছন্দ করে এবং তা শান্তিকামী জনগণের আস্থা অর্জনে সহায়ক।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক এবং সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী/বাঙালী অধিবাসীদেরকে একত্রিত হয়ে একটি সমন্বিত মঞ্চ থেকে সকল অধিবাসীদের দাবি আদায়ের আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। পাহাড়ী বাঙালী বিভেদ সৃষ্টি করলে সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে। সম্প্রীতি না থাকলে নিজ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সম্ভব হবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে তো কেবল পাহাড়ী জনগণ থাকে না, বাঙালীরাও থাকে। সকলেই এ মাটির সন্তান এবং এটা অনস্বীকার্য। কাজেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পার্বত্যাঞ্চলের সকল অধিবাসীরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগঠিত হয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অগ্রসর হয় তাহলে সুফল পাওয়া আশা করা যায়। আমার এ প্রস্তাব অনেকেই মেনে নিবে। কিন্তু হয়তো বাধ সাধবে পাহাড়ী বাঙালীদের মধ্য হতে গজে উঠা তথাকথিত নেতারা- কারণ তারা এলাকা ও জনগণের উন্নয়নের পরিবর্তে নিজের স্বার্থটাকে গুরুত্ব দেয় বেশি। আবার সেই স্বার্থান্বেষী মহলও চাইবে না যারা আমাদের দেশের একটি অংশে এই কয়েক দশকের পুঞ্জীভূত সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাক। তারা নিজেদের স্বার্থে আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করার জন্য এ দীর্ঘদিনের সমস্যাটাকে সমাধান হতে দিবে না। তাদের উস্কানীতে যদি পার্বত্যাঞ্চলের নেতারা পুতুলের মতো ব্যবহৃত হতে থাকে তাহলে এই অশান্ত জনপদ পার্বত্য চট্টগ্রামের দূর্ভাগা জনগণের ভাগ্যের আর পরিবর্তন হবে না। অনেক সময় পার হয়ে গেছে, অনেক রক্তে রঞ্জিত হয়েছে এ পার্বত্যাঞ্চল, উন্নয়নের ধারা বার বার থেমে যাচেছ, নিরাপত্তাহীনতায় ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছেগোটা পার্বত্য জনপদ। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ও নেতাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সহনশীলতা, যুক্তি ও বাস্তবতার নিরিখে আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে দেশের মাটি, মানুষ ও সংবিধানের সকল সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে নিম্নেবর্ণিত পদ্ধতির আলোকে আপনাদের আন্দোলনকে বেগবান করার চেষ্টা করুন।

১। পাহাড়ী বাঙালী সবার এ অঞ্চলে থাকার অধিকার আছে, সকলে বাংলাদেশী। এ ব্যাপারে কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নাই।

২। পাহাড়ী বাঙালী অধিবাসীদের সকল দাবি সম্মিলিতভাবে সমন্বয় করুন ও ঐক্যবদ্ধভাবে একটি দলে সংগঠিত হউন।

৩। নিয়মতান্ত্রিকভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতি চর্চা করুন, মূলধারার

www.pathagar.com

জাতীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হোন তাহলে রাজনীতি ও আন্দোলন আরো বেশি কার্যকরী হবে।

৪। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করুন, নেতা নির্বাচন করুন, আমি জানি এখানেই লাগবে আপনাদের দ্বন্দ্ব এবং সেজন্যে নেতারা এই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বিশ্বাস করলেও মানতে চাইবে না।

কিন্তু এভাবে তো আর চলবে না। পার্বত্য এলাকার গোটা জনগোষ্ঠিকে জিম্মি রেখে অনির্বাচিত, স্বার্থপর, জনসমর্থহীন নেতাদের পিছনে জনগন আর আগাবে না। তাদের প্রত্যাখান করে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে এবং নুতন নেতৃত্ব উঠে আসবে। অস্ত্র আর মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে আসলেই কি জনসমর্থন দীর্ঘকালের জন্য পাওয়া যাবে? জুম্মজাতি, স্বায়ত্ত শাসন ইত্যাদির স্বপ্ন/ কল্পনার ফানুষ ত্যাগ করে বাস্তবতার আলোকে বাংলাদেশী অধিবাসী হিসেবে ভাবতে শিখুন এবং স্ব স্ব সংস্কৃতি, ধর্ম, কৃষ্টি নিয়ে একটি বৃহত্তর বাংলাদেশী পাবর্ত্য জনগোষ্ঠী হিসেবে শান্তিতে বসবাস করার চিন্তা করুন।

www.pathagar.com

সাম্প্রতিক সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

একটি দেশ স্বাধীন হবার পর রাষ্ট্র হিসাবে সবদিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সময় লাগে। এ সময়ের মাঝে নানা রকম ত্রুটি বিচ্যুতি ও সমস্যা দেখা দেয়। এটা স্বাভাবিক। এ স্বাভাবিকতার ধারাবাহিক ফসল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলাদেশের একটি অংশ। এ অংশে বিভিন্ন ধর্মীয় ও মতামতের লোকের সমাবেশ যেহেতু ঘটেছে সেহেতু এ অঞ্চলের সমস্যা একটু ভিন্ন। এ সমস্যা একটু প্রকটও বটে। তবে সমস্যা সমূহ প্রকট হলেও নিরাশ হবার কারণ নেই। কেননা সকল প্রকার সমস্যার বাস্তব ভিত্তিক সমাধানও এতে নিহিত রয়েছে। সমস্যার দিক যেমন প্রকট তেমনি সমাধানের সম্ভাবনার দিকও প্রবল এবং উপায়ও আছে সুন্দরতম।

প্রথমে মৌলিক সমস্যাগুলো খতিয়ে দেখা যাক। তারপর সম্ভাবনার দিক বিবেচনা করে উপায় কি কি আছে তার একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা যাবে। বাস্তব বিশ্লেষণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্তির কারণ হিসেবে যে কয়টি দিক বিবেচনায় বিশেষ ভাবে আনা যায় তা নিম্নরুপ ঃ

১। **রাজনৈতিক সমস্যা** ঃ রাজনীতি মানুষের জন্য। দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য। গণতান্ত্রিক রাজনীতির মূল কথা হলো মানবতার উৎকর্ষ সাধন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সম অধিকার নিশ্চিত করা। গণমানুষের মতামতের সঠিক মূল্যায়ন করা। এখানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী, গরিব, উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত বলে কোন বিভেদ নেই। প্রাসাদ মালিকের যে অধিকার কুটির কিংবা কুঁড়ে ঘরের নিরন্ন মানুষের অধিকারও এক সমান। কিন্তু অধিকাংশ রাজনীতিবিদ গণমানুষের কল্যাণের নামে বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক শ্লোগান দিলেও তার বাস্তবতা হয়েছে ভিন্ন। কোন কোন রাজনৈতিক দল এ সব কল্যাণমুখী শ্লোগান দিয়ে নিজেদের দল বা কোন কোন নেতার বা তাদের কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক কর্মীর কল্যাণ হলেও গণমানুষের কল্যাণ হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অনেক শ্লোগান দেয়া হয়েছে। অনেক পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। এসব শ্লোগান ও পদক্ষেপের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্টি হয়েছে কোটা শ্রেণী। এ কোটা শ্রেনীর মাধ্যমে এক পক্ষকে আকাশের উপরে উঠানো হয়েছে। আরেক পক্ষকে সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আত্মকেন্দ্রীক ও স্বার্থপর রাজনীতির দর্শন থেকে এসব কোটা শ্রেণীর সৃষ্টি। সাধারণ মানুষ তা করেনি। যারা শুধুমাত্র ক্ষমতার লক্ষ্যে রাজনীতি করে তারা নিরীহ সাধারণ মানুষকে ক্ষমতায় যাবার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে। নির্বাচন এলে রাজনৈতিক

www.pathagar.com

নেতা কর্মীরা মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে। বৈতরণী পার হয়ে গেলে তারা আপন অবস্থান থেকে দূরে সরে যায়। রাজনৈতিক দলগুলো উত্থান পতনের কারণে সমস্যার স্বাভাবিক সমাধান হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে আঞ্চলিক রাজনীতি বিদ্যমান তাও একটা ফ্যাক্টর। কারণ এই আঞ্চলিক রাজনীতির সাথে জাতীয় রাজনীতির সমন্বয় নেই। জাতীয় রাজনীতির পরিধি ব্যাপক, আঞ্চলিক রাজনীতির পরিধি সীমিত হলেও এর ব্যাপকতাও উল্লেখ করার মত। এখানে জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতির মাঝে যে দ্বন্দ্ব আছে তাও অশান্তির একটি বড় কারন।

২। **ঐক্যবদ্ধ চিন্তা সমস্যা** ঃ আমাদের রাজনীতিতে ঐক্যবদ্ধ চিন্তার যথেষ্ট অভাব আছে। এ কারণে চিন্তার ঐক্য হচ্ছে না। ফলে বাস্তব ভিত্তিক সমাধানও হচ্ছে না। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত চিন্তা কোন ভাল ফলাফল বয়ে আনে না। যেমন আজ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে স্থায়ী কোন সমাধান হয়নি। এভাবে হবেও না। এর জন্য প্রয়োজন চিন্তার ঐক্য ও সকল দলে সমন্বয় আর উদার মনোভাব। নচেৎ সমস্যা থেকেই যাবে। অশান্তি বিরাজ করতেই থাকবে।

৩। **আন্তর্জাতিক সমস্যা** ঃ আধুনিক বিশ্বে অন্যতম সমস্যা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। এ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কারণে অনেক উন্নয়নশীল দেশ সামনে অগ্রসর হতে পারছেনা। স্থিতিশীল হতে পারছে না। মোড়লীপনায় অভ্যস্থ দেশগুলো তাদের মোড়লগিরী দেখাতে গিয়ে উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে জিম্মি করে রাখে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর কোন ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী কিংবা অর্থ ও ক্ষমতা লোভী কিছু মানুষকে হাতে নিয়ে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। আজকের বিশ্বে এমন দৃষ্টান্ত অহরহ। একই সমস্যা ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান বাংলাদেশে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে। রাজনৈতিক ভাবে তারা বাংলাদেশের গণমানুষকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কূটকৌশল হিসাবে বাংলাভাষাভাষীদের মাঝে স্থায়ী, অস্থায়ী, আদি ভূমির মালিক, ভূমির মালিক নয় ইত্যাদি শ্রেণী চালু রেখেছে। বাঙালী নামের কিছু নেতৃত্ব ও স্বার্থলোভী লোক বিদেশের আজ্ঞাবাহীদের সাথে মিশে বাংলাভাষাভাষীদের মাঝে স্থায়ী বিভেদ রেখা সৃষ্টি করে দিয়েছে। যা গোটা জাতিকে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করে রেখেছে এবং উন্নয়নের ধারাকে বারবার ব্যাহত করে চলছে।

৪। **বিচ্ছিন্নতাবাদ** ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌলিক সমস্যার মাঝে বিচ্ছিন্নতাবাদ একটি বড় ধরনের সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের একটি অংশ। এ অংশে বাংলাভাষাভাষী মুসলমান, হিন্দু, বড়ুয়া যেমন বসবাস করে তেমনি নিজস্ব ভাষা ও কৃষ্টি নিয়ে আবহমান কাল ধরে বসবাস করে যাচ্ছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, খুকি, পাংখু সহ অপরাপর জাতিগুলো। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বাংলাভাষাভাষী মুসলমান, হিন্দু, বড়ুয়া যেমন মর্যাদার অধিকারী একই মর্যাদার অধিকারী চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ অপরাপর জাতিগুলো। বাংলাদেশের সংবিধান

www.pathagar.com

জাতি গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের বৈধ অধিকার নিশ্চিত করেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু মানুষ পৃথকভাবে ভূমি মালিকানা দাবি করে নিজেদেরকে একমাত্র দাবিদার এবং অপর পক্ষকে অবাঞ্চিত হিসেবে দেখার প্রয়াস পেয়েছে। যা আদৌ কাম্য নয়।

৫। **বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা** ঃ স্বাধীন বাংলাদেশে বুদ্ধিভিত্তিক সমস্যাও একটি প্রকট সমস্যা বলে উল্লেখ করা যায়। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে অশান্তির আগুন লেগে আছে তা বুদ্ধিভিত্তিক সমস্যার কারণেই লেগে আছে। গ্রাম থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত দেশ জাতি ও গোষ্ঠীকে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের মধ্যহতে বাছাই করা কিছু মানুষ ছাড়া বাকীদের মোটা বুদ্ধি, আবেগঘন চিন্তা ও ক্ষমতা পাগল কর্মসূচির ফসল হচ্ছে খুন, রাহাজানী, ছিনতাই ও অপহরণ, নির্মম হত্যাকান্ড, যা কোন সভ্য সমাজ গ্রহণ করতে পারে না। যা কারো কাম্য নয়। অথচ যে বুদ্ধি দিয়ে এসব হীন ও জঘন্য কর্মকান্ড হচ্ছে সে বুদ্ধি দিয়ে সুচিন্তা, উদার বিবেচনা ও গঠনমূলক পরিকল্পিত কর্মসূচি দিয়ে পরস্পরকে কাছে টানা যায়। উন্নত মানের ব্যক্তি ও জনশক্তি গঠন করা যায়। এহেন বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্তন হওয়া দরকার। এর পরিবর্তন যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ অশান্তি লেগেই থাকবে।

৬। **নেতৃত্ব সমস্যা** ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক সমস্যা সমূহের মাঝে নেতৃত্বের সমস্যাকে এক বিরাট সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এর অর্থ এ নয় যে, এখানে নেতৃত্ব দেয়ার মতো নেতা নেই। নেতা আছে ঠিকই তবে নীতির অভাব প্রকট। একজন আদর্শবাদী নেতা কারো জন্য ভয়ংকর হয় না, হয়না মাথা ব্যাথার কারণ। হয় না ভোগবাদী ও বিত্তলোভী। একজন প্রকৃত নেতা বা আদর্শবান নেতা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য খুন, খারাবী, জ্বালাও পোড়াও বা অন্য কোন অসৎ পথ বেছে নেয়না। তিনি যদি আদর্শবান হন তার প্রতিপক্ষকে হারানোর জন্য রাজনৈতিক কলাকৌশল হবে তার একমাত্র অস্ত্র। এর বাহিরে সে অন্য কোন অবাঞ্চিত বা গর্হিত পথ বেছে নেয় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদর্শবান নেতৃত্বের সমস্যা আছে বিধায় নানা রকম সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। পথে ঘাটে হত্যা, গুম, অপহরণ সহ নানা রকম অবাঞ্চিত সমস্যা আজো বিদ্যমান রয়েছে। জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্তি রয়ে গেছে।

৭। **একক নেতৃত্বের অভিলাষ** ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন কোন নেতার আচরণ এমন যে, তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে তার সমকক্ষ কিংবা সমপোযোগী নেতা ভাবতেও নারাজ। ভাবখানা এমন যে আমি ছাড়া নেতৃত্ব দেবার মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে আর কেউ নেই। কাউকে যদি তার সমকক্ষ মনে হয় সাথে সাথে তার চরিত্র ধ্বংস করার জন্য যত ধরণের কুটকৌশল রয়েছে তার সব কিছুই প্রয়োগ করে ছাড়বে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো বেশি উপযোগী নেতৃত্ব গড়ে উঠছেনা।

www.pathagar.com

উচ্চ অভিলাষী নেতৃত্ব মূলতঃ দেশকে ধ্বংস করে দেয়। একটি জাতি বা গোষ্ঠীকে জিম্মি করে রাখে এহেন নেতা দিয়ে যত অকাজ আছে তা হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। ভোগবাদী নেতৃত্বের সূচনা মূলতঃ অভিলাষী নেতৃত্ব থেকে সৃষ্টি হয়। এটা থেকে পরিত্রাণ যত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল। অন্যথায় গোটা জাতির মাঝে যে হতাশা বিরাজ করে তা বলা বাহুল্য।

সমাধানের উপায় ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার বিষয়ে বেশ কিছু মৌলিক দিক চিহ্নিত করা হলো। উপরে আলোচিত সমস্যা সমূহকে আমরা প্রকট সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করলেও তা সমাধানযোগ্য মানব জীবনে সূচনার সাথে সমাপ্তি যেমন আছে তেমনি প্রত্যেক কাজেরই একটি সমাপ্তি আছে। এ সমাপ্তির আগে সম্ভাবনার দিকটা প্রবল হয়ে ওঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটা যখন যে ভাবেই শুরু হোক না কেন বর্তমানে তা এমন পর্যায়ে এসে দাড়িয়েছে যে, বিদ্যমান সকল পক্ষ এ সমস্যার একটি সম্মান জনক সমাপ্তি কামনা করে। এতে শান্তির একটি সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন রক্তপাত ও হানাহানি ইত্যাদির শেষে সকল পক্ষ এখন কর্মক্লান্ত। কারণ, এহেন রক্তপাত, হানাহানি আর খুন খারাবির মধ্যে বড় ধরনের লাভ কারো হয়নি। আগামীতে হবার সম্ভাবনাও নেই। অতএব শান্তিপূর্ণ সমাধানই শান্তির একমাত্র পথ। তাই চিহ্নিত সমস্যাগুলোকে সামনে রেখে রাজনৈতিকভাবে একটি স্থায়ী সমাধানের প্রচেষ্টা চালালে স্থায়ী সমাধান হয়ে যাবে। এ জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন বর্তমানে সে পরিবেশ প্রয়োজন বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করে। সম্ভাবনার যে দিক তথা যে পরিবেশ বর্তমানে সৃষ্টি হয়েছে তাকে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজে লাগালে সমাধান সম্ভব। মনে রাখা বাঞ্চনীয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সমস্ত সম্প্রদায় গুলোর বসবাস রয়েছে তারা আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ। মানুষ মানুষের জন্য। মানুষ হিসেবে কেউ ত্রুটি বিচ্যুতির উর্ধে নয়। অতএব, অতীতে কোথায় কি হয়েছে বা কে কি করেছে সে সব কথাকে পেছনে রেখে আজকের প্রয়োজন সকলকে একটি স্থায়ী সমাধানের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান পরিবেশ সাক্ষ্য দেয় যে, সকল মহল একটি স্থায়ী সমাধানের পক্ষপাতি। এ অবস্থায় কিছু প্রস্তাবনা পেশ করা যেতে পারে ঃ

১। **সংসদীয় আসন ও পরিষদ সমূহে ঢেলে সাজানো ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষে বহু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এরই আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি জেলা করে তিনটি পৃথক সংসদীয় আসন করা হয়েছে। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি আঞ্চলিক পরিষদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে যে, একপক্ষ বেশি লাভবান হয়েছে। আরেকপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত কয়েছে। একপক্ষ খুশি হয়েছে, আরেকপক্ষ অখুশি হয়েছে। সকল পক্ষ যাতে সমঅধিকারের ভিত্তিতে জীবন যাপন করতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রেখে

www.pathagar.com

সংসদীয় আসন, স্থানীয় জেলা আঞ্চলিক পরিষদ সমূহ বৈষম্যবিহীনভাবে ঢেলে সাজালে সকল পক্ষ সম অধিকারের ভিত্তিতে সহজভাবে বসবাস করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

২। **সন্ত্রাসী গ্রেফতার ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার** ঃ দাবি আদায় ও আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস করা অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার করা আধুনিক বিশ্বের এক কূট কালচারে পরিণত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামও এর বাইরে নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাসী অবৈধ অস্ত্রধারী, চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী, অপহরণকারী যেই হোক না কেন বা যে দল বা সম্প্রদায়ের হউক না কেন তাদের কে অবশ্যই গ্রেফতার করতে হবে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। সন্ত্রাসী গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা না গেলে এবং সন্ত্রাসের মদদ দাতা যারা তাদেরকে গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করতে না পারলে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী শান্তি আসবে না। এ বিষয়ে কঠোরতা সময়ের অপরিহার্য দাবি।

৩। **এন জি ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ** ঃ সেবা ও জনকল্যান করা এন জি ও'দের মৌলিক কাজ। তাদের রাজনীতি করা কোনমতেই সমিচীন নয়। অথচ দেখা যায় যে, বিদেশী এন জি ও গুলো সেবার আদলে ধর্মান্তর, বিশেষ দলের পক্ষাবলম্বন, বিশেষ সম্প্রদায়কে টার্গেট করে কাজ করা তাদের কালচারে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশী এন জি ও গুলোর ব্যাপারে বিতর্ক আছে। এদের কর্মকান্ড সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। সেবার আদলে তাদেরকে অন্য কোন কর্মকান্ড পরিচালনা করতে দেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে সরকার নির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করে এদের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। যাতে সেবার থলের ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কালসাপ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভেতর না প্রবেশ করতে পারে।

৪। **চাকুরির ক্ষেত্রে সমতা ও মেধার মূল্যায়ন** ঃ সরকারি বেসরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে যে অসমতা আছে তার নীতিমালার পরিবর্তন সময়ের একান্ত দাবি। কোন অফিসে কোন লোক নিয়োগের কথা আসলেই বিজ্ঞাপনে দেখা যায় অমুক সম্প্রদায়ের লোককে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এতে করে সম্প্রদায় বিশেষকে অধিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেক মেধাবী ও অভিজ্ঞ লোক চাকুরি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এতে হতাশা ও ক্ষোভ বেড়েই চলছে। এটা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সমতা আনয়ন জরুরি। নতুবা আজকে যারা বৈষম্যমূলক নীতিমালার কারণে বঞ্চিত হয়ে বেকারত্বকে অনিচ্ছা সত্বেও বরণ করে নিয়ে পথে মানবেতর জীবনযাপন করছে তারা একদিন দাবি আদায়ের জন্য ভিন্ন চিন্তাও করতে পাবে। হতাশাগ্রস্থরা অস্বাভাবিক জীবনও বেছে নিতে পারে। এতে অশান্তি আরো বাড়বে বৈ কমবেনা। তাই চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে সমতা আনয়ন জরুরি। তবে সমতার ভিত্তিতে কোন সম্প্রদায়ের লোক অধিক নিয়োগ পেলে তাতে কারো দুঃখ থাকার কথা নয়।

www.pathagar.com

৫। **পার্বত্য কোটা চালু করণ ঃ** শিক্ষা, চাকুরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বর্তমান যে কোটা প্রথা চালু রয়েছে সেটার পরিবর্তন হওয়া জরুরি। এতে এক পক্ষ বিশেষ সুযোগ পাচ্ছে। অপরপক্ষ পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছে। মনে রাখা দরকার যে, উপজাতীয় সম্প্রদায় ভূক্ত জনগণ যেমন বাংলাদেশের বৈধ নাগরিক তেমনি অ-উপজাতীয় জনগণও বাংলাদেশের বৈধ নাগরিক। নাগরিক হিসেবে সকল জনগণের অধিকার সমান। যেহেতু সকল সম্প্রদায়ের লোক দেশের বৈধ নাগরিক সেহেতু সর্বক্ষেত্রে সকলের অধিকার সমান হওয়া উচিত। যেহেতু সমান অধিকার সকলের রয়েছে সেহেতু বিশেষ কোটার পরিবর্তে পার্বত্য কোটা চালু করা সময়ের অপরিহার্য দাবি। এতে করে সকল সম্প্রদায়ের সম-অধিকার নিশ্চিত হবে। শান্তিও ফিরে আসবে। না হলে আজকে যারা পেছনে পড়ে যাচ্ছে তারা একদিন বোঝা হয়ে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে যা কারো কাম্য নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হতে পারে। এক্ষেত্রে সকল পক্ষের উদার মানসিকতা ও দেশপ্রেম বেশ কাজ করবে বলে আমি মনে করি। মনের ভিতর অসৎ চিন্তা থাকলে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। উদার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা থাকবে না। এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভবিষ্যৎ শান্তি সম্ভাবনা

গত ১৯৯৭ সনের ডিসেম্বরে যখন পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সরকার ও পিসিজেএসএস এর একটা বড় সাফল্য এবং প্রাপ্তি বলে পরিগনিত হচ্ছিল। বহু কাংখিত পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়ার জন্য এটি একটি মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এর ফলে এই পার্বত্য জনপদে সশস্ত্র বিদ্রোহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

যা হোক, বিরোধ বা বিদ্রোহের নিষ্পত্তি প্রকৃত শান্তি নির্দেশ করে না। এটা শান্তি প্রক্রিয়ার দ্বার উন্মোচন করে মাত্র। জাতিগত সংঘাত নিরসনে দক্ষিণ এশিয়া তথা বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রক্রিয়া চলছে। তবে বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, এই শান্তি প্রক্রিয়া অস্থায়ী ভিত্তিতে সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করতে হয়ে থাকে এবং সুদুর প্রসারী শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় এ ধরনের বেশ কিছু নজির রয়েছে। ভারত সরকার বিগত সময়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলোর সাথে দফায় দফায় বহুবার শান্তি আলোচনা চালিয়েছিলেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ ১৯৭৫ সালে নাগাদের সাথে স্বাক্ষরিত শিলং চুক্তি, ১৯৯৫ সালে সমগ্র আসামের ছাত্র পরিষদ গুলোর সাথে সামগ্রীকভাবে স্বাক্ষরিত আসামচুক্তি, মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (MNF) এর সাথে ১৯৮৬ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি, ১৯৮৮ সালে ত্রিপুরা ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি, বোডো ছাত্র পরিষদ সমূহ এবং 'বোডো পিপলস অ্যাকশন কমিটি' এর সাথে ১৯৯৩ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি এবং কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমাজতান্ত্রীক পরিষদ নাগাল্যান্ড ইসাক মুইবাহ্ এর সাথে স্বাক্ষরিত 'সীজ ফায়ার' বিষয়ক চুক্তি ইত্যাদি। এসব শান্তি প্রক্রিয়ার পর ও মিজোরামে অভিবাসন বিষয়ক শান্তিচুক্তি ব্যতীত অন্যান্য কোথাও শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি। ১৯৮৭ সালে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি শ্রীলংকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

বিরোধ পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছু কিছু বিষয়ের কারণে শান্তি নামক বিষয়টি এখনোও বহু প্রতিক্ষীত। একমাত্র কারণ শান্তি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা। পিসি জেএসএস ও ইউপিডিএফ এর মধ্যে বিরোধ, উপজাতি এবং বাঙ্গালী অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ এবং অস্ত্র ও মাদকের অবৈধ ব্যবসা ইত্যাদিকে প্রধানত দায়ী করা যায়।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে পার্বত্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তৎকালীন সরকার ও পিসি জেএসএস এর মধ্যে, কিন্তু ইউপিডিএফ এ চুক্তির বিরোধিতা করেছে। কারণ, এই

www.pathagar.com

চুক্তি পাহাড়ে পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসন অনুমোদন করেনি। ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি করে। যার ফলশ্রুতিতে, পাহাড়ে একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। দুটি বিবাদমান দল জেএসএস ও ইউপিডিএফ একে অপরের সাথে বন্দুক যুদ্ধ, হত্যা ও অপহরণে লিপ্ত। পিসিজেএসএস নেতা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম রিজিওনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সন্তু লারমা বলেন, 'আমি নিরুপায়'। অত্র অঞ্চলের সমস্যা নিরসনে আমি সরকারের নিকট হতে তেমন কোন সাড়া পাচ্ছি না।

পাহাড়ী ও বাঙালীদের মধ্যে বিদ্যমান খারাপ সম্পর্ক ও এই অঞ্চলের অশান্ত পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। এটি একটি বড় সমস্যা যা গত ২৩ বছর সময়কালব্যাপী বিদ্যমান। সমাজের এই দুটি শ্রেণীর জনগণের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত চলতে থাকা বিরোধ ও সহিংসতা ধীরে ধীরে চরমে পৌছেছে। পাহাড়ীরা মনে করেছিলো যে, পিসি জেএসএস এর দাবি অনুযায়ী বাঙালী বসতি স্থাপনকারী অধিবাসীরা পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে অপসারিত হবে। এ পার্বত্য চুক্তির এই বিষয়টি শৈথিল্যের কারণে পাহাড়ীদের সাথে বাঙালীদের সম্পর্কের আরো অবনতি হয়েছে। পাহাড়ীরা মনে করছে যে, তাদের দাবি দাওয়াগুলো বা তাদেরকে ঠিক সে রকম ভাবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উপস্থাপন করা হচ্ছে না বিধায় এখনো তারা অনগ্রসর। পার্বত্য চুক্তির পর থেকেই কিছু সংখ্যক সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলের উপস্থিতির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। এরা রাস্তায় যানবাহনের চালকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে। যদিও এসব সন্ত্রাসীদের পরিচয় অজ্ঞাত রয়ে গেছে, তবুও জনমনে প্রচলিত আছে যে, মায়ানমারের কিছু সংখ্যক শরণার্থী তাদের আশ্রয়ের আশায় বান্দরবানে পাহাড়ী সন্ত্রাসীদেরকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করছে এবং তাদের সাথে যোগ দিয়েছে।

মাদকদ্রব্য ও ক্ষুদ্রাস্ত্রের চালান এবং ব্যবহারও এই অঞ্চলে বেড়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় দু দশকেরও অধিক কাল যাবত চলতে থাকা সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং অশান্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট এই অঞ্চলে একটি সন্ত্রাসের জনপদ এবং মাদক ও অবৈধ অস্ত্র ব্যবসার একটি স্বর্গ রাজ্যে পরিণত করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক অবস্থানও এর পেছনে ভূমিকা রাখছে। কারণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম অবস্থানগতভাবে বার্মার (মায়ানমার) তথা 'গোল্ডেন ট্রায়াংগাল' এর নিকটবর্তী।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত পার্বত্যচুক্তি সম্ভবত সরকারি পর্যায়ের শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ৩য় প্রচেষ্টা বা পদক্ষেপ। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো শুধুমাত্র এ পার্বত্য চুক্তির ফলশ্রুতি নয়। বর্তমান সময়ের তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ মূলতঃ ১৯৮৮ সালে তৎকালীন সরকার ও স্থানীয় পাহাড়ী

www.pathagar.com

উপজাতি নেতৃবৃন্দের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী গঠিত স্থানীয় সরকার পার্বত্য জেলা পরিষদ এর নতুন সংস্করণ। এ সমস্ত চুক্তি ১৯৮৯ সনের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের দিকে নীতিগতভাবে বৈধতা পায়। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৭ সন অবধি চুক্তির সকল শর্ত পূরণ হয়নি। মোটের উপর বলা যায়, পিসি জেএসএস চুক্তির বাহিরেই রয়ে গিয়েছিলো। যা হোক ১৯৯৭ সনে ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত পার্বত্যচুক্তি দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছিল। এখন শুধু এ চুক্তি সফলতার জন্য প্রয়োজন এর সঠিক বাস্তবায়ন। পার্বত্যচুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সফলতা রয়েছে ঃ

১। **শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন ঃ** ১৯৯৪ হতে ১৯৯৯ সন পর্যন্ত প্রায় ৭০,০০০ শরণার্থী দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে।

২। **অস্ত্র বিরতি ঃ** শান্তিবাহিনী খ্যাত পিসি জেএসএস এর প্রায় ২০০০ সশস্ত্র গেরিলা সরকারি পর্যায়ে আত্মসমর্পণ পূর্বক তাদের অস্ত্র জমা দিয়েছে। তারপরও ধারণা করা হচ্ছে যে, গেরিলারা তাদের সকল হাতিয়ার জমা করেনি, মূলতঃ তাদের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার সমূহ তাদের কাছে রেখে দিয়েছে। কারণ তৎপরবর্তী সন্ত্রাসী কর্মকান্ড তারই প্রমাণ করে।

শরণার্থী পিসিজেএসএস সদস্যবৃন্দ এবং ক্ষতিগ্রস্থদের পূনর্বাসনের মাধ্যমে ও পার্বত্যচুক্তি কিছুটা সফলতা পেয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও কিছুটা সফলতা এসেছে। ১৯৯৯ সালের মে মাসে গঠিত রিজিওয়াল কাউন্সিল কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এসমস্ত সাফল্যের বিপরীতে কিছু সংখ্যক দাবি এখনও রয়ে গেছে, যেমন ঃ

১। **অ-সামরিকায়ন ঃ** এটা সর্বজন স্বীকৃত হয়েছে যে, পার্বত্য এলাকায় সাধারণ জনজীবনে স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে হলে বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প সমূহের কোন বিকল্প নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে শান্তি বাহিনী অপসারণের দাবির ব্যাপারে সরকার এবং পিসি জেএসএস একমত হতে পারছে না। তবে পার্বত্য চুক্তির পর এখনকার পরিস্থিতি বিচার করে পাহাড়ীদের মধ্যে অনেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রক্রিয়ায় শান্তিরক্ষীবাহিনী তথা সেনাবাহিনীর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন।

২। **ভূমি সংক্রান্ত দাবি ঃ** একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের নেতৃত্বে গঠিত 'ল্যান্ড কমিশন' পার্বত্য এলাকার অধিকৃত ভূমি সমস্যা সমাধানের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কিন্তু এই কমিশন বিভিন্ন ধরণের জটিলতার কারণে সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না। জমির মালিকানা সংক্রান্ত বৈধ কাগজপত্র পাহাড়ে অবস্থানকারী জনগণের অনেকের কাছেই নেই। বাঙালী পুনর্বাসিতদের জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র রয়েছে, কিন্তু তারা জমির সুফল ভোগ করতে পারছে না। পাহাড়ীরা দাবি করছে যে, এই জমি তাদের। একটি সরেজমিনে ভূমি জরিপ ছাড়া এ সমস্ত জমির বৈধতা

www.pathagar.com

এবং চিহ্নিত করার ব্যাপারে জটিলতা থেকেই যাবে। 'রিজার্ভ ফরেষ্ট' এলাকার বিস্তৃতির ফলেও ভূমি জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। এই ভূমি জটিলতার নিরসন করা না হলে, অত্র এলাকার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সুদুর পরাহতই রয়ে যাবে।

৩। **উন্নয়ন ঃ** ২০০১ সনের মার্চ মাসে রাঙ্গামাটিতে ০২ জন বিদেশীকে অপহরণের ঘটনার পর পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন এনজিও এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা সমূহের কর্মকান্ড বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ করা হলেও তা নানাবিধ বাধার কারনে ফলপ্রসু হয়নি। বর্তমানে ইউএনডিপি তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করলেও তাতে ব্যাপকভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে পার্বত্যবাসী জনগণ।

৪। **পরিচিতি ও সংস্কৃতি ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উল্লেখিত 'উপজাতি' শব্দটি সমালোচিত হলেও পরবর্তীতে 'স্বদেশী জাতিসত্ত্বা' কথাটি ঠিকই বিশ্বমহলে সমাদৃত হয়েছে। তাছাড়া পাহাড়ীদের সংস্কৃতি এবং জাতিগত পার্থক্যের ব্যাপারেও সাংবিধানিক অনুমোদনের ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক পাহাড়ী জনগণ নিজেদেরকে জুম্মজাতি হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করে, কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে।

৫। **বাঙালীদের অবস্থান ঃ** ১৯৭৯ সাল হতে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত যত সংখ্যক বাঙালী পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার হিসেবে অধিভূক্ত হয়েছে, কাউকেই পিসিজেএসএস এর সদস্যরা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এটি একটি অত্যন্ত বিতর্কিত ইস্যু। সংবিধানের আলোকে দুঃস্থ বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন বিতর্কিত হবার কোন অবকাশ নেই। কাজেই এ ব্যাপারে যুক্তিসম্মত মনোভাব পোষণ প্রয়োজন।

স্থানীয় বাজিকরদের চিন্তাধারা ও কিছু সুপারিশ

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থানীয় বাজিকর ও চাঁদা আদায়কারীদের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। এরা মূলতঃ পাহাড়ী যেমন ঃ পিসি জেএসএস, ইউপিডিএফ এবং হিল উইমেন ফেডারেশন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ে বসবাসরত কিছু সংখ্যক বাঙালী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকবৃন্দ, বহিশক্তি যেমন ঃ ভারত সরকার, উত্তর পূর্ব ভারতের কিছু সংখ্যক বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং উত্তর পশ্চিম ইউরোপের কিছু সংখ্যক এনজিও যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করছে, তাদের সমন্বয়ে গঠিত। এদের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। প্রথমত তারা বেসামরিক সমাজ, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিবাদমান দলগুলোকে মদদ যোগাচ্ছে এসব বেসামরিক লোকজন, যদিও সরকার এবং পিসিজেএসএস এ সমস্যা নিরসনকল্পে আলোচনায় বসেছিল।

দ্বিতীয়তঃ শান্তি এবং জাতীয়তাবাদ প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের নিয়ামক। গণতন্ত্র ছাড়া কোন প্রশাসনিক কাঠামো গঠন সম্পন্ন হয় না। এসবের সাথে সঠিক মতাদর্শ

www.pathagar.com

প্রয়োজন। রিজিওনাল কাউন্সিলও জেলা কাউন্সিলকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন। সামরিক বাহিনী হচ্ছে দেশের অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি। এ ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর সাথে বেসামরিক জনগণের সু সম্পর্ক একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানরত সামরিক বাহিনীকে ঢাকা থেকে প্রকৃত রাজনৈতিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে পরিচালিত করা উচিত।

শান্তি প্রক্রিয়ার ৩য় বিবেচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে শরণার্থী ও পুনর্বাসন সমস্যা উল্লেখযোগ্য। দেশের প্রত্যাবর্তনকৃত শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও ভেঙ্গেপড়া অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা করা ছাড়া অত্র এলাকায় শান্তি প্রক্রিয়া প্রশ্নের সম্মূখীন। ব্যাপক অর্থে শান্তি প্রক্রিয়া বলতে সেই অনুপ্রেরনাকে বোঝায় যার ফলশ্রুতিতে একটি স্বনির্ভর ও স্থিত কাঠামো গড়ে উঠবে এবং পাহাড়ে বসবাসকারীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত হবে। প্রক্রিয়ার মানবীয় মূল্যবোধের পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর দিকেও জোর দিতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূলতঃ এই এলাকাকে অশান্ত করে তোলার পেছনে দায়ী কারণ সমূহ খুঁজে বের করা প্রয়োজন ঃ

১। সংখ্যালঘু পাহাড়ী উপজাতিদের প্রতি সংখ্যাগুরু বাঙালীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব।

২। পার্বত্য জনগণের কাছে অত্র এলাকায় বসবাসকারী বাঙালীদের গ্রহণযোগ্যতার অভাব।

৩। সংখ্যাগরিষ্ট বাঙালীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের মুখে হুমকির সম্মূখীন উপজাতীয়দের জাতিগত সত্ত্বা।

৪। সংখ্যাগরিষ্ট বাঙ্গালীদের কর্তৃক সংখ্যালঘু উপজাতিদেরকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং নিরাপত্তা প্রদানে অনীহা।

৫। ভূমি সমস্যা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে উপজাতিদেরকে 'মারজিনালাইজ' করা।

৬। উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে আসা ইন্সারজেন্টদের (সশস্ত্র সন্ত্রাসী) দৌরাত্ম।

৭। উপজাতিদের দেশাত্মবোধ ও সহনশীলতার অভাব।

সহজ বাংলায় বলতে হয় যে, যদি পাহাড়ে সংঘাত নিরসনের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তবেই কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাসী দলগুলো সীমা লংঘন করছে

বাংলাদেলের মোট আয়তনের ১১ ভাগের ১ ভাগ জুড়ে বিস্তৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম। উঁচু-নিচু পাহাড়, নালা আর নয়নাভিরাম বনাঞ্চল বেষ্টিত পার্বত্য চট্টগ্রাম যেন প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের এক সাক্ষাৎকার লীলাভূমি। কিন্তু কয়েক দশক ধরে কিছু সংখ্যক সশস্ত্র ও বিদ্রোহী দলের পারস্পারিক হিংসা, হানাহানিতে এই ভূ-খন্ডের মাটি হয়েছে রক্তাক্ত। এ সমস্ত গ্রুপের মধ্যে জেএসএস, ইউপিডিএফ, পিসিপি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এদের পারস্পারিক সশস্ত্র হানাহানি ও সরকার বিরোধী কার্যকলাপের ফলশ্রুতিতে প্রতিনিয়ত এখানে সংগঠিত হচ্ছে অপহরণ, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, খুন ও গোলাগুলির মতো রক্তক্ষয়ী ও হিংসাত্মক ঘটনা। এখানকার শান্তিকামী সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা হয়ে পড়েছে দূর্বিসহ ও হতাশাগ্রস্থ, চরম নিরাপত্তাহীনতায় কাটছে তাদের দিন। জেএসএস ও ইউপিডিএফ এবং তাদের সমর্থকরা দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে যেয়ে এখানকার শান্তিকামী আপামর জনগণকে প্রতিনিয়ত নিপীড়ন করে চলেছে। এদের ভয়ে নিরীহ লোকজন মুখ খুলেনা, শুধুমাত্র বহু ঘটনার নীরব স্বাক্ষী হয়ে বেঁচে আছে।

জেএসএস এবং ইউপিডিএফ দুটি পরস্পর বিরোধী সন্ত্রাসী চক্র হলেও বৃহত্তর স্বার্থে উভয় দলের মধ্যে যথেষ্ট মতৈক্য রয়েছে যা তাদের কার্যকলাপেই প্রতিয়মান হচ্ছে। এ দুটি দলের কেউই পাহাড়ে বাঙালীদের এবং নিরাপত্তাবাহিনীর অবস্থান সমর্থন করে না। যার ফলশ্রুতিতে অত্র অঞ্চলের পাহাড়ী-বাঙালীর সম্প্রীতি ও সদ্ভাবমূলক সহাবস্থান অনেক সময়ই হয়ে পড়েছে হুমকির সম্মুখীন। গত ২৬ আগষ্ট ২০০৩ তারিখে খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে পাহাড়ী বাঙালীদের মধ্যে ঘটে যাওয়া রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর অবস্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব তথা ভৌগলিক অখন্ডতার স্বার্থে অত্র অঞ্চলে সেনাবাহিনী তথা অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। কিন্তু জেএসএস, ইউপিডিএফ এবং তাদের সমর্থন প্রাপ্ত বিভিন্ন অংগ সংগঠন সমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তাবাহিনীর উপস্থিতির ব্যাপারে প্রতিনিয়তই বিরোধিতা করে আসছে। কারন, নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতির কারণে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ও প্রধান আয়ের উৎস যেমন ঃ চাঁদাবাজি, ছিনতাই, অপহরণ, অস্ত্রব্যবসা ইত্যাদি অনেকাংশেই ব্যাহত হয়। তাছাড়া তাদের প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে এবং অস্ত্রসহ স্বাভাবিক চলাচল বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এ সমস্ত কারণে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সেনাবাহিনী তথা নিরাপত্তা বাহিনী অপসারণের জন্য প্রতিনিয়তই সরকারের নিকট

www.pathagar.com

দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু এতদ-অঞ্চলের বসবাসকারী পাহাড়ী বাঙালীদের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রেখে সাম্প্রদায়িক কলহ রোধকল্পে এবং সরকার বিরোধী সশস্ত্র গ্রুপগুলোর চক্রান্ত ও কার্যকলাপ প্রতিহত করে দেশের সর্বোপরি স্বাধীনতা ও ভৌগলিক অখন্ডতা রক্ষার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর অবস্থান ও গৌরবময় কর্মকান্ড নিঃসন্দেহে প্রসংশার দাবিদার।

গত প্রায় দুই দশকের বেশি সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান যুদ্ধাবস্থা ও দ্বৈত শাসনের অবসান হয়েছিল ১৯৯৭ সালে ০২ রা ডিসেম্বর। সরকারের শান্তি প্রক্রিয়ার প্রয়াস এবং জেএসএস (তথাকথিত শান্তিবাহিনী) নেতৃবৃন্দের মতৈক্যের সুফল স্বরুপ ঐ দিন স্বাক্ষরিত হয়। বহুল প্রত্যাশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলশ্রুতিতে জেএসএস সদস্যবৃন্দ তাদের ব্যবহৃত সমূদয় অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়েছিল। পার্বত্যবাসী তথা সারাদেশের শান্তিকামী মানুষ ভেবেছিল যে, এবার বোধ হয় হিংসা, হানাহানি আর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধ হয়ে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তির সুবাতাস বইবে। হয়েছিলোও তাই। কিন্তু এ শান্তি বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই বিভিন্ন দলের মধ্যে পুণরায় শুরু হয়ে যায় সশস্ত্র সংঘর্ষ। এরই মধ্যে অত্মপ্রকাশ করে ইউপিডিএফ নামক সরকার বিরোধী আরেকটি সশস্ত্র দল। জেএসএস এবং ইউপিডিএফ একে অপরের বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনা করা ছাড়াও তাদের সশস্ত্র সমর্থক ও নেতা কর্মীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে অশান্ত ও নৈরাজ্যের বীজ বপন করতে থাকে। এ ধরণের কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকার কারনে প্রায়শঃই উল্লেখিত দলসমূহের নেতা কর্মীরা নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে অস্ত্রশস্ত্রসহ ধৃত হচ্ছেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য যে, গত ০২ আগষ্ট ২০০৪ ইং তারিখে খাগড়াছড়ি সদরের গরগুজ্জাছড়ি এলাকা হতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ বিজয় চাকমা নামক একজন ইউপিডিএফ সদস্যকে অবৈধ অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদিসহ গ্রেপ্তার করে। এছাড়াও গত ১২ আগষ্ট ২০০৪ ইং তারিখে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা হতে পাথরমণি চাকমা, বঙ্গি চাকমা, চেচিং চাকমা, শ্যামল চাকমা এবং প্রদীপ মোহন চাকমা নামক ০৫ জন জেএসএস সদস্য বিপুল সংখ্যক অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। সন্ত্রাসীদের এ ধরনের অবৈধ চলাচল ও কার্যকলাপ এলাকার শান্তি শৃংখলার জন্য হুমকি স্বরূপ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে শান্তিচুক্তি অনুযায়ী শান্তিবাহিনীর (জেএসএস) সদস্যবৃন্দ তাদের সমূদয় অস্ত্র জমা দিয়ে থাকলে বর্তমানে তাদের ব্যবহৃত অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সমূহ তারা পেলো কোথা থেকে? এর জবাব অতি সুস্পষ্ট হয় তারা তাদের সমূদয় অস্ত্র জমা করেনি নতুবা তারা কোন আন্তর্জাতিক চক্রের সহায়তায় অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাচ্ছে। তবে এ ব্যাপারে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর পরোক্ষ ভূমিকাকেও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। জেএসএস ও ইউপিডিএফ তাদের সশস্ত্র কর্মী ও

www.pathagar.com

ক্যাডার বাহিনীকে উত্তম প্রশিক্ষণ এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করছে। বিভিন্ন সময়ে নিরাপত্তা বাহিনীর টহলদল এবং অপারেশন কর্মকান্ডে আবিস্কৃত প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এবং উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্র এরই নজির বহন করছে। এসব অপশক্তিগুলো বাহ্যত একে অপরের বিরোধীতা প্রদর্শণ করলেও ব্যাপক অর্থে এদের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী এক ও অভিন্ন। এরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে আসছে। উদাহরণ স্বরূপ সরকারের উদ্দেশ্যে জেএসএস নেতা সন্তু লারমার একটি উক্তির উদ্ধৃতি দেয়া হলো। 'আমরা অস্ত্র জমা দিয়েছি, কিন্তু প্রশিক্ষণ জমা দেইনি। প্রয়োজন হলে আবারো অস্ত্র তুলে নেবো'। এখন সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের ব্যাপার হচ্ছে যে, এসব বিরোধী দলসমূহ পুনরায় চরম আঘাত হানার জন্য পুনরায় সুসংগঠিত হচ্ছে বলে বিভিন্ন ধরণের আলামত পাওয়া যাচ্ছে। এটা সরকারের জন্য একটি উৎকণ্ঠার বিষয় বলে মনে হচ্ছে।

কোন সন্ত্রাসী নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে এমনকি অস্ত্রসহ আটক হলেও নিলজ্জের মতো সন্ত্রাসী দলগুলো তাদের নিজেদের লোক বলে আখ্যা দিয়ে সস্তা জনসমর্থণের আশায় জনগণের শান্তি ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে মিছিল, মিটিং, গাড়ি অবরোধ ইত্যাদি সহিংসমূলক কর্মসূচি পালনের প্রয়াস পায়। এরপরও কি সরকর তাদের প্রশ্রয় দেয়া উচিত। দেশের আইন তো সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিস্থিতি শান্ত রাখার জন্যে সরকার এখনো নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন রেখেছে। অথচ জেএসএস, ইউপিডিএফ ও তাদের অংগসংগঠন গুলোর নেতারা উস্কানীমূলক ও হুমকি দিয়ে বক্তৃতা বিবৃতি ছাড়ছে। এরা সকলে একই পাখীর পালক। স্বাধীন এ দেশের এই অংশকে সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রমুক্ত রাখতে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া উচিত। জেএসএস এবং ইউপিডিএফ এর মতো দলের নেতাকর্মীরা মুখে যতোই স্বদেশ প্রেমের বুলি আওড়াক না কেন, প্রকৃত অর্থে এরা হচ্ছে দেশের অখন্ডতা, শান্তি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরোধী শক্তি যা তাদের প্রতিনিয়ত পরিচালিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হতে সহজেই প্রতীয়মান হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, জেএসএস এবং ইউপিডিএফ এর নেতৃত্বে পার্বত্যচুক্তির সুফল ও অগ্রগতি গ্রহনযোগ্য নয়। সরকারকে এ ব্যাপারে এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সন্ত্রাসী দলগুলো বর্তমানে যে সন্ত্রাসের রাজনীতি ও মতাদর্শ অবলম্বন করছে তাকে শক্ত হাতে দমন করতে হবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, সুস্থ ও মুক্তধারার রাজনৈতিক মতাদর্শ ছাড়া কোন দল, দেশ বা জাতি কখনোও কোন দাবি আদায় করতে পারেনি, পারবেও না। কাজেই দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অখন্ডতার স্বার্থে আমরা সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সরকার বিরোধী সশস্ত্র দলগুলোর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে একই আলোচনার টেবিলে আশা করছি। তানা হলে দেশের এ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তলিয়ে যাবে হতাশা, হানাহানি আর অশান্তির অতল গহবরে।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং মানবতার কল্যানে নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা

সূচনা

বাংলাদেশের পূর্বে এবং দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত পাহাড়, নদীনালা আর গহীন বনাঞ্চল বেষ্টিত বিস্তীর্ণ পার্বত্য এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম। উঁচু নিচু পাহাড় আর নয়নাভিরাম ঝরনাবেষ্টিত পার্বত্যাঞ্চল যেন এক নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। পার্বত্য চট্টগ্রামের দূর্গম পাহাড়ী এলাকায় বাস করে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, বুমং ইত্যাদি বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপজাতি জনসাধারন। এদের মধ্যে চাকমা গোষ্ঠীর জনগনের সংখ্যাই বেশি। একদল পথভ্রষ্ট উপজাতি তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিগত প্রায় তিন দশক ধরে পার্বত্যাঞ্চলকে অশান্ত এবং অস্থিতিশীল করে রেখেছে। নিরাপত্তা বাহিনী বিশেষতঃ সেনাবাহিনীর সঠিক কার্যক্রমের ফলে পরিস্থিতির উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হচ্ছে। সার্বিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে সেনাবাহিনী অপারেশন কার্যক্রমের পাশাপাশি অত্র এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও মানবতার কল্যানে মহুমূখী প্রকল্পে নিরলসভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সভ্যতার আলো বিবর্জিত দূর্গম এই পাহাড়ী এলাকায় উপজাতিরা ধীরে ধীরে আলোর মুখ দেখতে শুরু করেছে। দরিদ্র ক্লিষ্ট পাহাড়ী জনগণের একসময় জীবনের মৌলিক চাহিদা যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা পুরণ অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর কল্যাণে এখন শুধু মৌলিক চাহিদাই নয়, পাশাপাশি চিত্তবিনোদন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সহ উপজাতীয় সংস্কৃতি দিন দিন উন্নতি লাভ করছে।

সেনাবাহিনী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন রাস্তা ঘাট, পুল, ব্রীজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মানের ফলে দুর্গম পাহাড়ী এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশের অন্যান্য অংশের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নতি লাভ করেছে। এতে করে পার্বত্য এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের যেমন প্রসার ঘটেছে তেমনি মানব সম্পদেরও যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নে নাগরিক সুবিধাদি উপজাতি জনগণের হাতের নাগালে এসে যাচ্ছে। এছাড়াও শিক্ষা, চিকিৎসা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া কুটির শিল্প, বৃক্ষরোপন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা ইত্যাদি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতায় এলাকার জনগনের মাঝে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের প্রতিটি কর্মকান্ডে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততার ফলশ্রুতিতে সার্বিক

www.pathagar.com

উন্নয়ন যথেষ্ট বেগবান হয়েছে। সেনাবাহিনী অপারেশন কার্যক্রমের পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও মানবতার কল্যানে তাদের সম্পূর্ণ সামর্থ্যতা দিয়ে নিবেদিত রয়েছে। সেনাবাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে উন্নয়নের বর্তমান এই ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অন্য যে কোন এলাকার চেয়ে একটি সমৃদ্ধশালী জনপদে রূপান্তরিত হবে।

সেনাবাহিনীর প্রতিনিয়ত নিরলস পরিশ্রমের ফলে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতির যে জোয়ার শুরু হয়েছে তার যথাযথ মূল্যায়ন হলে তা সেনাসদস্যদেরকে তাদের কাজে অধিকতর নিবেদিত হতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যোগাবে। দেশ মাতৃকার দায়িত্বশীল সন্তান হিসেবে সেনাসদস্যরা পার্বত্য এলাকাতে উন্নয়নের যে নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে তা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আপামর জনসাধারনের নিকট তুলে ধরা মূলতঃ প্রচার মাধ্যমের উপরই বর্তায়। দেশের সাধারন জনগণ স্বাভাবিকভাবেই মনে করে থাকেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের সন্তানেরা দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র লড়াই পরিচালনার কাজেই ব্যস্ত রয়েছে। প্রচার মাধ্যম বিশেষ করে পত্রিকার সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, টেলিভিশন ও রেডিও প্রতিনিধি, বিভিন্ন এনজিও'র প্রতিনিধি ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়মিত পরিদর্শন বিষয়টিকে দেশবাসীর নিকট পরিস্কারভাবে তুলে ধরতে যথেষ্ট সহায়ক হবে। এখনো অনেকের মনে বদ্ধমূল ধারণা যে, সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে হত্যা ও নির্যাতন চালাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রম সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করলে এ ধরনের বদ্ধমূল ধারণার নির্ঘাত পরিসমাপ্তি ঘটবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নে সেনাবাহিনীর কষ্টার্জিত দীর্ঘদিনের সফলতার যথার্থ মূল্যয়ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যাতে দেশের সাধারণ মানুষ সেনাসদস্যদের কর্মকান্ড সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পেতে পারে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিরাপত্তা বাহিনীর সফলতা

পার্বত্য চট্টগ্রামের দূর্গম পাহাড়ী জনপদের সার্বিক উন্নতিকল্পে সেনাবাহিনী যে সকল ক্ষেত্র সমূহে সফলতার সাথে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তার কিছুটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।** যেকোন এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে এর যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। খাদ্যশস্যসহ জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আমদানি রপ্তানিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নির্মিত রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, যাত্রী ছাউনী ইত্যাদি অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে দুর্গম পাহাড়ী এলাকাগুলোকে সমতলের সাথে সংযোগ হয়েছে। এতে করে ব্যবসা বাণিজ্যের যেমন প্রসার ঘটছে তেমনি অন্যদিকে

www.pathagar.com

শিল্প, কল-কারখানা ইত্যাদি নির্মানে বিনিয়োগকারীরা দিন দিন অধিক হারে আকৃষ্ট হচ্ছে।

২। **প্রাকৃতিক দুর্যোগ** । বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেমন বন্যা, ঘুর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়াও দুর্ঘটনা কবলিত আর্তদের সাহায্যার্থে বসতবাড়ি নির্মান ও মেরামতের পাশাপাশি খাদ্যশস্য বিতরণ এবং নগদ অর্থ সাহায্য প্রদান করে আসছে। শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরিদ্র পাহাড়ী জনসাধারণকে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে। সেনাবাহিনীর সফল কর্মকান্ডে পাহাড়ী জনগণ তাদের ক্ষতি পুষিয়ে পুণরায় অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

৩। **কৃষিক্ষেত্র, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী পালন ও মৎস চাষ প্রকল্প**। কৃষি কার্যে সেচ সুবিধার জন্য খাল খনন, বাঁধ নির্মানে সেনাবাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী পালন ও মৎস চাষ প্রকল্পের জন্য সেনাবাহিনী প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান দিচ্ছে। এ সকল প্রকল্প সমিতি গঠনের মাধ্যমে পরিচালনা করার জন্য সকলকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যাতে প্রকল্পের সুফল একজন ব্যক্তি একা লাভবান না হয়ে অনেকে তার অংশীদার হতে পারে।

৪। **বৃক্ষরোপন** । বনজ সম্পদ যেকোন দেশের জন্য একটি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। যে কোন দেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন কিন্তু বাংলাদেশে মাত্র ১৪ শতাংশ বনাঞ্চল রয়েছে। তাই বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর সেনাবাহিনী গুরুত্বারোপ করছে। পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত সেনাবাহিনীর ক্যাম্প সহ বিভিন্ন পাহাড়ী এলাকায় জনগণের সম্পৃক্ততায় পরিকল্পিত ভাবে বৃক্ষ রোপন করা হচ্ছে। এই সব বৃক্ষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ ছাড়াও থাকছে পরিবেশ সহায়ক ফলজ, বনজ ও ভেষজ গুনসম্পন্ন উদ্ভিদ। এ সমস্ত পরিবেশ বান্ধব উদ্ভিদ পাহাড়ী জনগণের জন্য যেমন বয়ে আনছে অর্থনৈতিক সুফল তেমনি বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ বিপর্যয় রোধের মাধ্যমে প্রাণীকুলের জীবন করে তুলেছে আরো নিরাপদ এবং আরামপ্রদ।

৫। **কুটির শিল্প**। ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পে অর্থ সাহায্য প্রদান সেনাবাহিনীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। দরিদ্র পাহাড়ী জনগণ এই কুটির শিল্পের মাধ্যমে তাদের ভাগ্যের চাকা পরিবর্তনে প্রয়াস চালাচ্ছে। অর্থ সাহায্য ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তাঁত, সেলাই মেশিন ইত্যাদি প্রদান করা হচ্ছে। এতে করে দিন দিন তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে।

৬। **শিক্ষার প্রসার**। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন সহ পুরোনো প্রতিষ্ঠান সমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে সেনাবাহিনী বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি

www.pathagar.com

মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মকান্ডও পরিচালনা করছে। দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ এবং আর্থিক সাহায্য প্রদান উপজাতি জনগণকে দ্রুত শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

৭। **চিকিৎসা**। রোগশোকে দরিদ্র পাহাড়ী জনগণকে আধুনিক চিকিৎসা প্রদান এবং বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ সেনাবাহিনীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য মানবিক কার্যক্রম। শুধুমাত্র উন্নত যোগাযোগ সমৃদ্ধ এলাকায় নয় দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় সেনা ক্যাম্প/ছাউনির চারপাশের প্রত্যন্ত পাহাড়ী গ্রাম গুলোতে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া যে সমস্ত রোগীর আরো উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন তাদেরকে অর্থ সাহায্যের পাশাপাশি উন্নত চিকিৎসার সুযোগ করে দেয়া হয়। গণস্বাস্থ্য উন্নয়নেও সেনাবাহিনী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বিশুদ্ধ পানিয় জলের জন্য টিউবওয়েল স্থাপন, স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটারী টয়লেট নির্মান করছে যাতে করে পানি বাহিত রোগ যেমন ডায়রিয়া, জন্ডিস ইত্যাদির প্রকোপ থেকে উপজাতি জনগণ নিরাপদ থাকতে পারে।

৮। **ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান**। বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য সেনাবাহিনী অসংখ্য ধর্মীয় উপাসনালয় স্থাপন করছে। উপজাতি জনগনের কাছে ধর্মীয় উপাসনালয় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। উপাসনালয় নির্মাণে সেনাবাহিনীর সহযোগিতা পাহাড়ীদের মাঝে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে পাহাড়ীদের মাঝে অন্য ধর্মের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা এবং পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯। **চিত্তবিনোদন ও খেলাধুলা**। বিভিন্ন স্থানে ক্লাব নির্মাণ, মেরামত এবং চিত্তবিনোদনের জন্য টিভি, রেডিও ও বাদ্যযন্ত্র প্রদান করা হচ্ছে। এই সমস্ত ক্লাব সমূহের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে ক্রীড়া সামগী বিতরণ খেলাধুলার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং তত্ত্বাবধানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই সকল ক্রীড়া অনুষ্ঠানে পাহাড়ী ও বাঙালী জনগণের সরব অংশ গ্রহনের মাধ্যমে পাহাড়ী ও বাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হচ্ছে।

সেনাবাহিনীর সফলতার মূল্যায়ন

প্রচার মাধ্যম এবং সুশীল সমাজের দায়িত্ব। সেনাবাহিনীর কল্যানে পার্বত্যাঞ্চলের অভূতপূর্ব উন্নতি সংক্রান্ত তথ্যাদি দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি অত্যন্ত দরিদ্র দেশে পার্বত্য

www.pathagar.com

চট্টগ্রামের আর্থ সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়নে সেনাবাহিনী যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তা দেশের যে কোন বিবেকবান মানুষকে নিশ্চিতভাবে বিস্মিত করবে। পরিতাপের বিষয় যে, সেনাবাহিনীর এই সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে দেশের আপামর জনসাধারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে দেশের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে যেমন টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদি। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর উন্নয়ন কর্মকান্ড বিষয়ে বিভিন্ন প্রচারণা, আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সামনে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সরেজমিন পরিদর্শন এবং বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমানের এই উন্নয়ন ধারা দেশের আপামর জনসাধারণকে জানানোর দায়িত্ব তাদের উপরই ন্যস্ত রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমেও জনসচেতনতা সৃষ্টি করা উচিত। বর্তমানে সন্ত্রাসীরা একচেটিয়া মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে দেশে বিদেশে দেশ প্রেমিক সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। এর বিপরীতে দল মত নির্বিশেষে দেশের বিবেকবান সকল গোষ্ঠী/দলের জোরালো তৎপরতা একান্ত অনস্বীকার্য।

মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা। যে কোন সংগঠন কিংবা ব্যক্তির কাজের সফলতা যথার্থভাবে মূল্যায়ন করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে সেই সংগঠন বা ব্যক্তি তার সফলতার স্বীকৃতি পেয়ে নুতন উদ্যোমে আরো অধিক পরিশ্রম করার অনুপ্রেরনা পায়। তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর দীর্ঘদিনের নীরব বিপ্লবের ফলে যে অভাবনীয় আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যান সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে তার যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেনা সদস্যদের সফলতার প্রকৃত মূল্যায়ন হলে সেটা তাদেরকে আরো পরিশ্রমী হতে নুতন অনুপ্রেরণা যোগাবে। দেশের আপামর জনসাধারণ তাদের সন্তানদের সফলতার কথা জেনে গর্ববোধ করবে সেটাই সেনা সদস্যদের একমাত্র প্রত্যাশা। দেশের সাধারণ মানুষের এখনো বদ্ধমূল ধারণা যে, সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে হত্যা ও নির্যাতন চালাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা পর্দার আড়ালেই ঢাকা পড়ে আছে। এখন সময় এসেছে দেশের সাধারন জনগনকে জানাবার যে, অপারেশনাল দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশ মাতৃকার গর্বিত সেনাবাহিনী দূর্গম পার্বত্য এলাকাকে তাদের নিরলস অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে দিন দিন উন্নতি ও সমৃদ্ধির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। সেনা সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও মানবতার কল্যানে বর্তমানে যেভাবে আন্তরিকতার সাথে নিবেদিত রয়েছে এই ধারা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের সার্বিক উন্নয়নের মানদন্ডে একটি আদর্শ অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

www.pathagar.com

উপসংহার

সেনাবাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু উপজাতি জনগোষ্ঠীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পথভ্রষ্ট কিছু দুস্কৃতকারীর সশস্ত্র সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধে প্রতিনিয়ত শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও মানবতার কল্যানে যে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে এবং করে চলছে তা সর্বোচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে যা নিশ্চিতভাবে আমাদের জাতীয় উন্নয়নে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে। এতদসত্ত্বেও সেনাবাহিনীর প্রতিটি ইতিবাচক পদক্ষেপের বিরোধিতা করে উপজাতিদের একটি স্বার্থান্বেষী মহল চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছে। তাই উপজাতি জনগোষ্ঠীর একটি মুষ্টিমেয় অংশের স্বার্থান্বেষী ও কুটিল রূপটি জনগণের সামনে তুলে ধরার এখনই যথার্থ সময়। সরেজমিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শন করে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমকে সেনাবাহিনীর প্রকৃত উন্নয়নমূখী কর্মকান্ড দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট তুলে ধরা বর্তমানে একান্ত অপরিহার্য যাতে দেশ প্রেমিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অহেতুক স্বার্থান্বেষী মহল বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে। পাশাপাশি পার্বত্যাঞ্চলের অভূতপূর্ব সার্বিক উন্নয়নের প্রকৃত রূপকার দেশ মাতৃকার গর্বিত সেনাবাহিনীর নিরলস পরিশ্রমের যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া একান্ত বাঞ্চনীয় যাতে সেনাসদস্যরা তাদের সফলতার স্বীকৃতি পেয়ে নব উদ্যমে পার্বত্য এলাকার উত্তরোত্তর উন্নয়নে নিজেদেরকে আরো নিবিড়ভাবে নিবেদিত করতে পারে।

www.pathagar.com

বিপন্ন পার্বত্য বনাঞ্চল

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত পাহাড়-নদী আর বনাঞ্চলবেষ্টিত বিস্তীর্ণ পার্বত্য এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম। এখানকার উঁচু নীচু পাহাড় আর নয়নাভিরাম ঝরনাবেষ্টিত পার্বত্যাঞ্চল যেন এক নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। বাংলাদেশের মোট আয়তনের শতকরা ১১ ভাগ বনাঞ্চল। এই ১১ ভাগের শতকরা ৯ ভাগই অবস্থিত এই পার্বত্য চট্টগ্রামে। এই বনাঞ্চলে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের বিরল প্রজাতির এবং ভেষজ গুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ। কিন্তু বর্তমানে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর জোর অপতৎপরতা ও স্থানীয় প্রশাসনের উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততার কারণে দিনের পর দিন উজাড় হচ্ছে পার্বত্য বনাঞ্চল। হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে পরিবেশগত ভারসাম্য এবং সরকার বঞ্চিত হচ্ছে বিশাল অংকের আর্থিক উপার্জন থেকে। এই সকল কিছুর মুলেই রয়েছে অনিয়ন্ত্রিত এবং অপরিকল্পিতভাবে বনভূমি উজাড় করা- যার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। এখানকার বনাঞ্চলে রয়েছে গর্জন, জারুল, সেগুন, তেসুর, জাম, কড়ই ইত্যাদির মতো কাঠ উৎপাদকারী উদ্ভিদ। তাছাড়া এই সব পার্বত্য বনাঞ্চলে বিপুল পরিমান বাঁশ পাওয়া যায়। এ সব বাঁশ ও কাঠ স্থানীয় জনসাধারনের চাহিদা মেটানোর পর ও বেশ কিছু কাঠ প্রায়শই স্থানীয় অসাধু কাঠ ব্যবসায়ী এবং বনবিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের উদাসীনতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে অবৈধ উপায়ে পাচার হয়ে যাচেছ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় বাস করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপজাতি জনসাধারণ। এদের মধ্যে চাকমা, মারমা, মুরং, বুমং ইত্যাদি গোষ্ঠীর জনগনের সংখ্যাই বেশি। জংগল কেটে কৃষিকার্য করা। এই ধরণের সেকেলে কৃষিকার্য দ্বারা অত্র এলাকার উপজাতিরাই বনায়ন ধ্বংস করছে। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী স্থানীয় পাহাড়ীদের দ্বারা বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল উজাড় করার মাধ্যমে গাঁজা, হাসিস এবং আফিমের মতো অবৈধ দ্রব্যাদির চাষ ও বাজারজাত করছে। এর ফলশ্রুতিতেএ অবৈধ চোরচালানের সাথে জড়িত বাবসায়ীদের পকেট দিন দিন কালো টাকায় ভারী হচ্ছে । আর অন্য দিকে অবৈধ চাষাবাদের জন্য গাছপালা অবাধে কর্তনের ফলে উজাড় হচ্ছে প্রচুর বনজ সম্পদ।

পরিবেশ বিজ্ঞানদের মতে, যে কোন স্থানের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা তথা প্রাণীকুলের অবাধ বিচরণের জন্য উক্ত এলাকার বনাঞ্চলের ভূমিকা অপরিসীম। যখনই কোন অঞ্চলের বনজ সম্পদ ও গাছপালা নির্বিচারে উজাড় করা হয়, তখনই সেখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান পরিবেশগত পারস্পরিক ভারসাম্য

www.pathagar.com

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর তখনই ঘটে যেতে পারে ভূমিধ্বস, দাবানল এমনকি বড় ধরনের কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়। পার্বত্যাঞ্চলে নির্বিচারে গাছপালা ও বনাঞ্চল ধ্বংসের মাধ্যমে মানুষ নিজেই নিজেদের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনছে যার ফলশ্রুতিতে প্রাণীজগৎ হচ্ছে হুমকির সম্মুখীন ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ ধ্বংসের কারণসমূহ ঃ

১। **কাঠ ও বাঁশের অবৈধ পাচার**। বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত সিংহভাগ কাঠ এবং বাঁশই অবৈধ যা স্থানীয় বনবিভাগের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কিছু সংখ্যক অসৎ ও দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিবর্গের যোগসাজসে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচার হয়ে যাচ্ছে। অবৈধ উপায়ে সংগৃহীত এই সব বাঁশ ও কাঠ স্থানীয় সশস্ত্র সন্ত্রাসী ও চাঁদা আদায়কারী গ্রুপ সমুহের জন্য একটি উত্তম আয়ের উৎস। সরকার বনজসম্পদ ধ্বংসরোধকল্পে এই সব দ্রব্যাদির সংগ্রহ ও ব্যাবহারের উপর সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। কিন্তু তারপরও সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ ও স্থানীয় কতিপয় অসৎ কাঠ ব্যবসায়ীর জোর অপতৎপরতার কারণে এই সব কাঠ ও বাঁশের অবৈধ পাচার বন্ধ করা অনেকাংশে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

২। **জুম চাষ**। জুম চাষ হচ্ছে পাহাড় বা ঢালুভুমিতে বনজংগল কেটে উক্ত স্থানে চাষাবাদ করার পদ্ধতি যা পার্বত্য জনগোষ্ঠীর জন্য একটি পুরনো ও সেকেলে কৃষি পদ্ধতি। এছাড়াও জুম চাষ হচ্ছে চাঁদা আদায়ের একটি উৎস। সশস্ত্র দল সমূহ ভুমি মালিকদের নিকট হতে জমি প্রতি নির্দিষ্ট অংকের টাকা চাঁদা হিসেবে আদায় করে থাকে। এই জুম চাষ পদ্ধতির কারণে বিপুল পরিমাণ বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে বন্যপ্রাণী ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি ভূমিক্ষয় এবং ভূমিধ্বসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে।

৩। **নেশাকারক উদ্ভিদের চাষাবাদ**। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ন পাহাড়ী ভূমির বেশ কিছু দুর্গম এলাকায় পপি, হাসিস, আফিম, গাঁজার মতো নেশাকারক উদ্ভিদের চাষ হয়ে থাকে। কতিপয় অসাধু মাদক ব্যবসায়ীর ছত্রছায়ায় ও স্থানীয় বনবিভাগের নির্লিপ্ততায় স্থানীয় পাহাড়ীদের দ্বারা বহু বছর যাবত অবৈধভাবে এর চাষ ও বাজারজাতকরণ করা হচ্ছে। এটি অত্যন্ত লাভজনক একটি ব্যবসা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই পার্বত্য এলাকার গভীর অরণ্যে গোপনভাবে গড়ে উঠা এই সমস্ত লুকায়িত গাঁজা ক্ষেত ধ্বংসের উদ্যোগ নিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে অনেক জমিতে লুকায়িত ভাবে সবজি ক্ষেতে মৌসুমী সবজি চাষের ফাঁকে ফাঁকে গাঁজা, অফিম, পপি ইত্যিাদির চাষ হচ্ছে। স্থানীয় গরিব উপজাতিরা সহজে মোটা অংকের অর্থ আয়ের লোভে ব্যাপক বনজংগল ধ্বংসকরে পাহাড়ী ঢালুজমিতে এই সব নেশাকারক দ্রব্যের চাষাবাদ করছে যা পরিবেশগত ভারসাম্যের প্রতি হুমকি স্বরূপ।

www.pathagar.com

৪। **সরকারি বনবিভাগ ও বেসামরিক প্রশাসনের উদাসীনতা**। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে সরকারি বনবিভাগের চেকপোষ্ট। এই সকল ফরেষ্ট চেকপোষ্টে পার্বত্য এলাকা হতে সংগৃহীত বাঁশ, কাঠ ও অন্যান্য বনজ দ্রব্যাদি সমতল ভূমিতে আনা নেওয়ার সময় নিয়মিতভাবে সরেজমিনে পরীক্ষা করার নিয়ম রয়েছে। কারণ, প্রতিটি বনজ দ্রব্যের জন্য স্থানীয় বনকর্মকর্তা ও সিভিল প্রশাসনের অনুমোদন তথা 'ক্লিয়ারেন্স' এবং 'পারমিট' থাকার কথা কিন্তু স্থানীয় বনবিভাগ ও সিভিল প্রশাসনের কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদাসীনতা ও দুর্নীতির কারণে এবং কিছু সংখ্যক অবৈধ কাঠ ব্যবসায়ীর যোগসাজসে প্রায় প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ অবৈধ কাঠ ও বাঁশ বিভিন্নভাবে চোরাই পথে পাচার হয়ে যাচেছ। তাছাড়া এর পিছনে কিছু সংখ্যক সশস্ত্র গ্রুপের মদদও রয়েছে। কারণ, এ সব অবৈধভাবে পাচার হওয়া কাঠ ও বাঁশের চালান হতে একটি বড় অংকের চাঁদা আদায় করা হয়। এই অবৈধ পাচার রোধকল্পে সরকার পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর চেকপোষ্ট স্থাপন করেছেন। এই সমস্ত চেকপোষ্টগুলোতে বর্তমানে নিয়মিতভাবে প্রতিটি বনজ দ্রব্যাদি বহনকারী যানবাহন পুংখানুপুংখভাবে সরেজমিনে পরীক্ষা করা হয়। এর ফলে প্রায় প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ অবৈধ কাঠ ও বাঁশ ধরা পড়ছে। সেনাবাহিনী এই যে দায়িত্ব পালন করছে তা তাদের গতানুগতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের বাইরে তবু তারা সরকারের নির্দেশে এ দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু এটা কোন স্থায়ী সমাধান নয়। যতদুর জানা যায়, এখানে কর্মরত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও বিভাগের তরফ থেকে বনজ দ্রব্যের এ সব অবৈধ চালান বন্ধের লক্ষ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহযোগিতা প্রদান করা হয় না। উপরন্তু কিছু সংখ্যক উচচপদস্থ কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এ সব ক্ষেত্রে নিরাপত্তাবাহিনীর সম্পৃক্ততাকে সাধারণভাবে মেনে নিতে পারে না। এর ফলশ্রুতিতে সেনা সদস্যদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে কিছু পরিমাণ কাঠ ও বাঁশ বিভিন্ন অদৃশ্য ক্ষমতাসীন চক্রের সহায়তায় অবৈধভাবে পাচার হয়ে যায়।

৫। **ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর আবাসন**। পার্বত্য চট্টগ্রামের সিংহভাগ জন সাধারণ উপজাতি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। এ ছাড়াও অত্র এলাকায় বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীরও বহু সংখ্যক লোক বসবাস করে। দিনে দিনে এখানে জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচেছ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমতল ভূমিতে বসবাসরত ভূমিহীন দারিদ্র পীড়িত বহু জনগণ উন্নত জীবনের লক্ষ্যে ক্রমশঃ পার্বত্য এলাকায় এসে বসতি গড়ে তুলছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসাধারণ তদের বাসভূমি নির্মাণকল্পে ক্রমাগত বনাঞ্চল কেটে উজাড় করে দিচেছ। এ ছাড়া দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কাঠের চাহিদা ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচছ। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকা

www.pathagar.com

পাহাড়ে আগুন লাগিয়ে উপজাতিদের জুমচাষ করার দৃশ্য

রিজার্ভ ফরেষ্ট উজার করে দিয়েছে উপজাতি সন্ত্রাসীরা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

থেকে সংগৃহীত কাঠ ও বাঁশ অত্যন্ত উচচমানের এবং বেশ সস্তা- যা দেশের অন্যান্য জায়গার সমতল ভূমিতে দুর্লভ। এসব কারণে বহু অসাধু কাঠ ব্যবসায়ী গোপনে কাঠ এবং বাঁশ অবৈধভাবে বিভিন্নস্থানে পাচার করে দেয়ার চক্রান্তে জড়িত রয়েছে। এতে করে প্রাণীজগৎ হচ্ছে বিপন্ন, আর বিনষ্ট হচ্ছে পরিবেশগত ভারসাম্য।

বনজ সম্পদ ধ্বংসের ক্ষতিকারক দিক সমূহ।

১। **সরকারি ক্ষয়ক্ষতি**। বনজ সম্পদ যে কোন দেশের জন্য একটি উল্লেখ্যযোগা সম্পদ এবং একটি বড় আয়ের উৎস। তাই বনজ সম্পদের ধ্বংস রোধ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং সর্বোপরি বনজ সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে বনমন্ত্রণালয় কর্তৃক সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। কিন্তু সরকারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে প্রায়শই বহু টাকা মূল্যের কাঠ ও বাঁশ বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে এবং সরকার একটি বড় অংকের আর্থিক উপার্জন হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

২। **পরিবেশগত সমস্যা**। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, যে কোন দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক সুস্থিত সহাবস্থানের জন্য দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা উচিত। কিন্তু বাংলাদেশের শতকরা ১১ ভাগ বনভূমি যার ৯ ভাগই পাবত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত। এই বনাঞ্চলে রয়েছে বেশ কিছু বিরল ও দুর্লভপ্রজাতির এবং ভেষজগুণ সম্পন্ন প্রচুর উদ্ভিদ। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমরা অপরিকল্পিতভাবে এবং নির্বিচারে পার্বত্যাঞ্চলে গাছ এবং বন্যপ্রাণী ধ্বংস করছি। কিন্তু এর পরিবর্তে আমরা নতুন করে বৃক্ষ রোপন বা বনায়নের তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছি না। ফলশ্রুতিতে উদ্ভিদ ও প্রানীর পারস্পরিক সহাবস্থান বিঘ্নিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে প্রাকৃতিক দুযোর্গসহ বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা নিরসন, আসবাবপত্র প্রস্তুত, অসাধু কাষ্ঠ ব্যবসায়ীদের তৎপরতা, স্থানীয় বনবিভাগ ও প্রশাসনের উদাসীনতা, "জুম" চাষ ইত্যাদির কারনে পার্বত্যাঞ্চলের বনাঞ্চল ক্রমাগত ধ্বংস করা হচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে আমাদেরকে নিম্নেবর্ণিত পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে ঃ

ক। ভূমিক্ষয় এবং ভূমি ধ্বংসবৃদ্ধি।

খ। সাইক্লোন, হ্যারিকেন এবং তাইফুনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি।

গ। গাঁজা, আফিম, পপি ইত্যাদি নেশাকারক উদ্ভিদের চাষাবাদের ফলে ভূমি উর্বরা শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস।

ঘ। জুম চাষের শস্য হতে শুস্ক মৌসুমে প্রায়শঃ অগ্নিকান্ড দেখা দেয়। এই অগ্নিকান্ড হতে ঘটে যেতে পারে বড় ধরনের দাবনল। এর ফলশ্রুতিতেএকটি বড় এলাকার বনাঞ্চল হয়ে পড়বে হুমকীর সম্মুখীন।

www.pathagar.com

৬। প্রাণীর অভায়ারন্য ধ্বংসের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রানীর পারস্পরিক সহাবস্থান তথা পরিবেশ ভারসাম্য বিঘ্নিত।

বনজ সম্পদ রক্ষায় সম্ভাব্য পদক্ষেপ সমুহ।

১। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয় বনবিভাগের বননিরাপত্তা কর্মী এবং পুলিশ প্রশাসন বনবিভাগ পাহারা দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বন নিরাপত্তা কর্মী এবং পুলিশ সদস্যের কারণে বনজ দ্রব্যের নিরাপত্তা ব্যাহত হয়। এমনকি বনরক্ষীগণ অনেক সময় তাদের নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়। সরকার কতৃক অত্র অঞ্চলে বননিরাপত্তা কর্মী এবং পুলিশ প্রশাসনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই সমস্যা অনেকাংশে লাঘব করতে সক্ষম হবেন।

২। পার্বত্য অঞ্চলে কাঠ ও বাঁশের অবৈধ পাচার রোধ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করায় তা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। অপ্রিয় হলেও যা বাস্তব তা হলো ইচ্ছায় বা অনচিছায় অথবা অবহেলায় স্থানীয় বন বিভাগ ও পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক স্থাপিত ফরেষ্ট চেক পোষ্ট গুলো দিয়ে অনেক সময় বেশ বড় অংশের কাঠ ও বাঁশ পাচার হয়ে যায়। এর প্রতিরোধকল্পে অত্র অঞ্চলের দুর্গম এবং গুরুত্বপুর্ন ফরেষ্ট পয়েন্ট গুলোতে আরো বেশি সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনীর ফরেষ্ট চেক পোষ্ট স্থাপন করা যেতে পারে।

৩। বনবিভাগের সুনির্দিষ্ট নীতমালা অনুযায়ী বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, কর্তন, ও বনায়নের নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় জেলা প্রশাসক, পুলিশ কমকর্তা, বনকমকর্তা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর একজন সদস্যের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এই কমিটি সর্বাংগীন তাদারকির মাধ্যমে বনজ দ্রব্যর অবৈধ পাচার রোধ তথা অসাধু কাঠ ব্যবসায়ী ও পাচারকারীকে গ্রেফতারপুর্বক পুলিশ প্রশাসনের নিকট হস্তান্তর করার যাবতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করবেন এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পাশাপাশি বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট এলাকাগুলোতে পরিকল্পিতভাবে বনায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৪। পার্বত্যাঞ্চলে বনভূমির একটি বিশাল অংশ ধ্বংসহচ্ছে ঝুম চাষ এবং গাঁজা, হাসিস, পপি, আফিমসহ বিভিন্ন ধরনের নেশাকারক উদ্ভিদের আবাদ হওয়ার ফলে। কিন্তু এ সব বনাঞ্চল ধ্বংসের পাশাপাশি সে পরিমাণ গাছ লাগানো হচ্ছে না। অধিক পরিমানে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে বনজ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তাছাড়া, পাহাড়ের ঢালুতে ক্ষতিকারক ঝুম এবং নেশাকারক দ্রব্যাদির চাষাবাদ নির্মুল করার মাধ্যমে ভূমির ক্ষয়রোধ তথা পরিবেশ বিপর্যয় হতে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

৫। পরিকল্পিত উপায়ে অত্র অঞ্চলে বনায়নের কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। এধারা যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে এ অঞ্চলে কিছু দিন পর আর কোন প্রয়োজনীয় গাছপালা থাকবে না। প্রয়োজনীয় বাঁশ ও কাঠের অভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে কর্ণফুলী পেপার মিলের মতো লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান। আর সরকার বঞ্চিত হবে বিপুল অংকের আর্থিক উপার্জন থেকে। পরিকল্পিত উপায়ে বনবিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে বনায়নের পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ় হস্তক্ষেপ এবং সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা জাগ্রত করা অতীব প্রয়োজন। তবে আশার কথা এই যে, সরকার অত্র অঞ্চলে অবৈধ বৃক্ষ নিধনরোধের পাশাপাশি অধিক হারে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বনায়ন প্রকল্প বাস্ত-বায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে লক্ষ্য করা যায় যে, পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত সেনাবাহিনীর ক্যাম্প/সেনানিবাসগুলোতে উল্লেখযোগ্য হারে পরিকল্পিত ভাবে বৃক্ষ রোপন করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে । এসব বৃক্ষের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ ছাড়াও থাকছে পরিবেশ সহায়ক ফলজ, বনজ ও ভেষজ গুন সম্পন্ন উদ্ভিদ। এ সমস্ত উদ্ভিদ সরকারের জন্য যেমন বয়ে আনছে অর্থনৈতিক সুফল তেমনি বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ বিপর্যয় রোধের মাধ্যমে প্রাণীকূলের জীবনকে করে তুলছে আরোও নিরাপদ এবং আরামপ্রদ।

বনজ সম্পদ যে কোন দেশের জন্য একটি অত্যন্ত মুল্যবান সম্পদ। আবহাওয়া ও পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, যে কোন দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে মাত্র ১৪ শতাংশ ভূমি জুড়ে বনাঞ্চল রয়েছে। তারপরেও যে পরিমাণ বনাঞ্চল রয়েছে, তা অপরিকল্পিত ও অবাধে বৃক্ষ নিধনের ফলে ধ্বংসের মুখে। ক্রমাগত গড়ে উঠা আসবাবপত্রের দোকান, ইটের ভাটা ইত্যাদি স্থানে কর্মরত বহুসংখ্যক অসাধু ব্যবসায়ী ও কর্মচারীর মাধ্যমে বহু কাঠ অবৈধভাবে পাচার হয়ে যাচ্ছে যা স্থানীয় বনবিভাগের কর্মকর্তারা অনেক সময় তাদের নিজেদের স্বার্থে উপেক্ষা করে যান। পুলিশ, বনবিভাগ, বেসামরিক প্রশাসন, নিরাপত্তা বাহিনী এবং অত্র এলাকায় অবস্থিত দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং প্রয়াসের মাধ্যমে আমাদেরকে বনজসম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তথা সর্বস্তরের জনসাধারণের দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ এবং সর্বোপরি পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের গণসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশের এ ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করতে পারি। তা না হলে পরিবেশ ভারসাম্য নষ্ট হয়ে ঘটে যেতে পারে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো ভূ-প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এ ব্যাপারে আমাদের দেশের পরিবেশবাদীরা কোন রাজনৈতিক পক্ষপাত না করে নিরপেক্ষ ও গঠনমুলক সমালোচনা ও আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেশের বিপুল সম্ভাবনার পার্বত্য চট্টগ্রামে বনায়নরক্ষা ও সংরক্ষণের বিষয়ে সোচ্চার হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চার খন্ড (ক,খ,গ,ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হলেনঃ

সাধারণ

১। উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট সংরক্ষণ এবং এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।

২। উভয়পক্ষ এ চুক্তির আওতায় যথাশিগগির ইহার বিভিন্ন ধারায় নিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রনয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হবে বলে স্থিরীকৃত করেছেন।

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে।

ক। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য : আহ্বায়ক।

খ। এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান : সদস্য।

গ। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি : সদস্য।

৪। এই চুক্তির উভয়পক্ষের তরফ হতে সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হতে বলবৎ হবে। বলবৎ হবার তারিখ হতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে।

www.pathagar.com

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হবার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হয়েছেনঃ

১। পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত 'উপজাতি' শব্দটি বলবৎ থাকবে।

২। 'পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ' এর নাম সংশোধন করে তদপরিবর্তে এই পরিষদ 'পার্বত্য জেলা পরিষদ' নামে অভিহিত হবে।

৩। 'অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা' বলতে যিনি উপজাতীয় নয় এবং যারা পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাকে বুঝাবে।

৪। প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিনটি) আসন থাকবে। ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'ডেপুটি কমিশনার' এবং 'ডেপুটি কমিশনারের' শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে 'সার্কেল চীফ' এবং 'সার্কেল চীফের' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হবে। ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপধারা সংযোজন করা হবে। কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসেবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না'।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যক্রম গ্রহনের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করবেন। ইহা সংশোধন করিয়া 'চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার' এর পরিবর্তে 'হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি' কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করবেন। অংশটুকু সন্নিবেশ করা হবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত 'চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট' শব্দগুলির পরিবর্তে 'নির্বাচন বিধি অনুসারে' শব্দগুলি প্রতিস্হাপন করা হবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'তিন বছর' শব্দগুলির পরিবর্তে 'পাঁচ বছর' শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হবে।

www.pathagar.com

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন বলে বিধান থাকবে।

৯। বিদ্যমান ১৭ নম্বর ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভূক্ত হবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হতে পারবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন, (২) তার বয়স ১৮ বছরের কম না হয়, (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ্য ঘোষণা না করে থাকে, (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারায় (২) উপ-ধারায় 'নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ' শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২)-এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করবেন বলিয়া বিধান থাকবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত নয়, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত 'খাগড়াছড়ি মং চীফ' এর পরিবর্তে 'মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ' শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হবে। অনুরুপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীপ ইচ্ছা করলে বা আমন্ত্রিত হলে পরিষদের সভায় যোগদান করতে পারবেন বলে বিধান রাখা হবে।

১৩। ৩১ নম্বর উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২)-এ পরিষদে সরকারের উপসচিব সমতল একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসেবে থাকবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে বলে বিধান থাকবে।

১৪। ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করতে পারবে বলে বিধান থাকবে। ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হবে ঃ 'পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে এবং তাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে। ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে বলে বিধান থাকবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ বিধি অনুযায়ী হবে বলে উল্লেখ থাকবে।

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকার' শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হবে।

১৭। ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকবে। ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ)তে বিধি অনুযায়ী হবে বলে উল্লেখিত হবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হবে ঃ কোন অর্থ বৎসর শেষ হবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ বছরের জন্য, প্রয়োজন হলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হবেঃ পরিষদ সরকার হতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২)এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'সরকার' শব্দটির পরিবর্তে 'পরিষদ' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হবে।

২১। ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চিয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরুপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নয় অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাইতে পারবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার 'বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হলে' শব্দগুলি বাতিল করে তদপরিবর্তে 'এই আইন' শব্দটির পূর্বে 'পরিষদ বাতিল হলে নব্বই দিনের মধ্যে' শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হবে।

www.pathagar.com

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত 'সরকারের' শব্দটির পরিবর্তে 'মন্ত্রণালয়ের' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হবে।

২৪। ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই উপধারাটি প্রণয়ন করা হবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছু থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং পরিষদ তাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে। ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে শব্দগুলি বাতিল করে তদপরিবর্তে 'যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী' শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'সহায়তা দান করা' শব্দগুলি বলবৎ থাকবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হবেঃ

ক। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

খ। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাকিছুই থাক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাবে না।

গ। পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

ঘ। কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাষা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন যা কিছুই থাক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হাতে ন্যাস্ত থাকবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকবে।

www.pathagar.com

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হবে। পরিষদে এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই উপধারা প্রণয়ন করা হবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে এবং কোন বিধি প্রণীত হবার পরও উক্ত বিধি পূনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করবার বিশেষ অধিকার থাকবে।

৩০। ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে' শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'করতে পারবে' এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করতে পারবে।

৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত 'পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ' এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হবে।

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হবে। পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করে আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করতে পারবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

৩৩। প্রথম তফসিল বর্নিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বরে 'শৃংখলা' শব্দটির পরে 'তত্ত্বাবধান' শব্দটি সন্নিবেশ করা হবে। পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হবেঃ

ক। বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

খ। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা।

গ। মাধ্যমিক শিক্ষা।

www.pathagar.com

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত হবে ঃ

ক। ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা।

খ। পুলিশ (স্থানীয়)।

গ। উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার।

ঘ। যুব কল্যাণ।

ঙ। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

চ। স্থানীয় পর্যটন।

ছ। পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

জ। স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান।

ঝ। কাপ্তাই হ্রদের জনসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা।

ঞ। জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ।

ট। মহাজনী কারবার।

ঠ। জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর রেট, টোল এবং ফিসের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভূক্ত হবেঃ

ক। অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিট্রেশন ফি।

খ। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর।

গ। ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর।

ঘ। গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর।

ঙ। সামাজিক বিচারের ফিস।

চ। সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর।

ছ। বনজ সম্পদের উপর রয়্যালিটির অংশ বিশেষ।

জ। সিনো, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর।

ঝ। ব্যবসার উপর কর।

ঞ। লটারীর উপর কর।

টা। মৎস ধরার উপর কর।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, ইং (১৯৮৯ সনের

www.pathagar.com

১৯, ২০ ও ২১ নং আইন)- এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন যার পদমর্যাদা হবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হবেন।

৩। চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য নিয়ে গঠন করা হবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হতে নির্বাচিত হবে। পরিষদ ইহার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরুপ হবে ঃ

চেয়ারম্যান ০১ জন
সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ) ১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা) ০২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ) ০৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা) ০১ জন

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ০৫ জন নির্বাচিত হবেন চাকমা উপজাতি হতে, ০৩ জন মারমা উপজাতি হতে, ০২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হতে, ০১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গা উপজাতি হতে এবং ০১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হতে।

অ-উপজাতি পুরুষ সদস্যদের মধ্য হতে প্রত্যেক জেলা হতে ০২ জন করে নির্বাচিত হবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হতে ০১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হতে ০১ জন নির্বাচিত হবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হবে। একতৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটাধিকার থাকবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরুপ হবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর হবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিল করণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও

www.pathagar.com

কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরুপ হবে।

৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ন সচিব সমতুল্য একজন মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৮। যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। পরিষদের কোন সদস্য পদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণ করা হবে।

৯। পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহার উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বধান ও সমন্বয় করবে। এছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তবর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করে তার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারবেন।

১৩। নিম্নোক্ত উৎস হতে পরিষদের তহবিল গঠন করা হবে ঃ

ক। জেলা পরিষদের তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ।

খ। পরিষদের উপর ন্যাস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা।

গ। সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ বা অনুদান।

ঘ। কোন প্রতিষ্ঠা বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

ঙ। পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে মুনাফা।

চ। পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ।

www.pathagar.com

ছ। সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যাস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌঁছিয়েছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হয়েছেন ঃ

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের অগরতলায় ৯ মার্চ ৯৭ ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮ মার্চ ৯৭ ইং হতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

২। সরকার জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চুড়ান্ত করে তাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেয়া নিশ্চিত করবেন। যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) চঠিত হবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হবে ঃ

ক। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি।

খ। সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট)।

গ। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি।

ঘ। বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার।

ঙ। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

www.pathagar.com

৬। কমিশনের মেয়াদ তিন বছর হবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে। কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আসন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছে অথচ বিবদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেনি সে ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেনি বা জমি সঠিক ব্যবহার করেনি সে সকল জমি বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারি চাকরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকবেন। সরকার উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যদের তালিকা এবং ইহার আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করবেন। যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করে নিবে।

www.pathagar.com

১৫। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হলে সরকার তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন। ১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে। জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হবে। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহনের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে এবং তাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলে গণ্য করা হবে।

১৭। সরকার জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলী কদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল স্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেয়া হবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে। সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্যে হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে ঃ

ক। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী।

খ। চেয়ারম্যান/ প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ।

গ। চেয়ারম্যান/ প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

ঘ। চেয়ারম্যান/ প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

ঙ। চেয়ারম্যান/ প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।

www.pathagar.com

চ। সাংসদ, রাঙ্গামাটি।

ছ। সাংসদ, খাগড়াছড়ি।

জ। সাংসদ, বান্দরবান।

ঝ। চাকমা রাজা।

ঞ। বোমাং রাজা।

ট। মং রাজা।

ঠ। তিন পার্বত্য জেলা হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অ-উপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ অগ্রহায়ন ১৪০৪ সাল মোতাবেক ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
(আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ)
আহ্বায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে
(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

www.pathagar.com

সন্তু লারমার সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকার

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা সম্প্রতি দৈনিক 'প্রথম আলো' কে দীর্ঘ এক একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। গত ১২ নভেম্বর ৯৮ বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়ি শহরে তাঁর অস্থায়ী আবাসে এ সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। পার্বত্য শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন ও তার সমস্যা, পাহাড়ে চুক্তি বিরোধীদের তৎপরতা, সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আস্থার অভাব, বর্তমান আওয়ামী লীগসহ সাবেক তিন সরকারের সঙ্গে সংলাপ, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার হত্যাকান্ড, দলের তৎকালীন অন্তর্দ্বন্দ্ব, জনসংহতি সমিতির বর্তমান ও ভবিষ্যত রাজনীতি, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন ও এসব বিষয় নিয়ে খোলামেলা অনেক কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকারটির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হলো ঃ

প্রশ্ন ঃ দীর্ঘদিন আত্মগোপনে রাজনীতি করার পর এখন প্রকাশ্যে এসেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি কেমন দেখছেন?

সন্তু লারমাঃ পরিস্থিতি বলতে যেটা প্রথম বলা যেতে পারে, পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ দুই যুগের বেশি সময় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ছিল। গত ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ এখন চাইবে এখানে শান্তি থাকবে উন্নয়ন আসবে। গোটা দেশের কথা বলা যেতে পারে- পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে নিয়ে একটা আকাংখা সৃষ্টি হয়েছে এটাও একটা দিক।

অন্যদিকে সশস্ত্র যুদ্ধের কারণে যে অবস্থাটা সাধারণত হয়ে থাকে, দুই পক্ষের মধ্যে যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধের মধ্যে কাউন্টার ইন্সারজেন্সীর কারণে সাধারণ নিরীহ মানুষ নির্যাতনের শিকার হয়। সেটা থেকে রেহাই পাওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তির পরিবেশ আছে। চুক্তি বাস্তবায়নটা কতটুকু হচ্ছে না হচ্ছে সেটা একটা বিষয়। সরকারের চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতি হওয়ার কারণে, বিশেষ করে চুক্তির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো যথাসময়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে নানাভাবে আশংকা, সন্দেহ দেখা যাচ্ছে। যে এলাকায় যাই-সেখানে একই প্রশ্ন, এতোদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো তা সত্ত্বেও ঠিকভাবে, ঠিক সময়ে কেন চুক্তি বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এ প্রশ্নটা সব মহল থেকে করা হচ্ছে। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সরকার পক্ষ এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে একটা অস্বস্থিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ অস্বস্থিকর অবস্থার জন্য এখন একে

www.pathagar.com

অপরকে দায়ী করছে। সরকার পক্ষ বলছে জনসংহতি সহযোগিতা করছে না। আবার জনসংহতি সমিতি বলছে যে, সরকার পক্ষ যথাসময়ে যথাযথভাবে চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসছে না। এখানে আমাদের প্রেক্ষিতে যদি মূল্যায়ন করি তাহলে দেখতে পাই, চুক্তি অনুসারে জনসংহতি সমিতির যেটা করণীয় ছিল, তা জনসংহতি যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে করেছে। এখন চুক্তির অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যা কিছু করণীয় সেগুলো হচ্ছে মূলত এবং প্রধানত সরকারের বিষয়। জনসংহতি সমিতির এখন প্রত্যক্ষভাবে কোন কিছু করণীয় নেই, সহযোগিতা প্রদান ছাড়া। আমি মনে করি জনসংহতি এ সহযোগিতাটা সঠিকভাবে দিয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে সরকার চুক্তি বাস্ত -বায়নের ক্ষেত্রে তার যে প্রক্রিয়াটা রয়ে গেছে সেটা অত্যন্ত ধীরগতিতে এগিয়ে চলছে এবং সবচেয়ে বড় কথা চুক্তির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো এখনো ঝুলন্ত অবস্থায় রয়ে গেছে। এ কারণেই ইতিমধ্যে নানা সমস্যা পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্টি হয়েছে এবং এ সমস্ত সমস্যার কারণে আজকে জনসংহতি সমিতিকে নানাভাবে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

সমস্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমি বলবো যে, যেহেতু চুক্তি অনুসারে অস্থায়ী সেনা শিবির, ভিডিপি, আনসারসহ শিবিরগুলো এখনো স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি সে কারণে এখনো বিভিন্ন এলাকায় সেনা উপস্থিতি নানাভাবে, পরোক্ষভাবে সমস্যা সৃষ্টি করছে। তাছাড়া এটা স্পষ্ট যে, এখন পর্যন্ত এখানকার সিভিল প্রশাসন এবং আইনশৃংখলার ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে সেনা কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব রয়ে গেছে।

প্রশ্ন ঃ চুক্তি বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণ কি সরকারের আন্তরিকতার অভাব? নাকি তাদের বর্তমান অগ্রাধিকারে আপনারা নেই?

সন্তু লারমাঃ যে প্রশ্নটা উত্থাপন করলেন, সেটা অত্যন্ত জটিল বিষয়। এটা একটা বিতর্কিত প্রশ্নও বলবো আমি। কারণ সরকার বলছেন যে, তাদের আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছা রয়েছে, প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে চলছে, এটা তারা বলে আসছেন। পক্ষান্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা স্থায়ী বাসিন্দা সরকারের বক্তব্যের সঙ্গে তাদের বক্তব্যের মিল নাও থাকতে পারে। আর, জনসংহতি সমিতি এ পরিপ্রেক্ষিতে যে বক্তব্য রাখতে পারে তার সঙ্গেও পার্থক্য থাকতে পারে। এ বিষয়ে আমি বা সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তারাতো কম বলেছি বলে মনে হয় না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি এবং দিয়ে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

এখানে আমি একটা কথা উল্লেখ করতে চাই, সরকারের একটা বিশেষ মহল আছে, সেই বিশেষ মহলের কারণে চুক্তি বাস্তবায়নটা এতো ধীরগতি হচ্ছে এবং যেগুলো উল্লেখযোগ্য বিষয় এখনো পর্যন্ত সেগুলো অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। এক্ষেত্রে আরো অন্যান্য বিষয় অবশ্যই থাকতে পারে, আছে বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত না গিয়ে এটাই বলতে চাচ্ছি যে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনসংহতি এবং আমি মনে করি- এখানকার জনগণের আস্থা রয়েছে। তবে সরকারের যে দায়দায়িত্ব তা সামগ্রিক অর্থে প্রধানমন্ত্রীরও আছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে একা সব দায়দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। সুতরাং সরকারের আরো যে অঙ্গসংগঠন অর্থাৎ প্রশাসন, সেনাবাহিনী, আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সকল ক্ষেত্রে যারা আছেন- শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে তাদেরও দায়দায়িত্ব রয়েছে। আমরা বার বার বলে আসছি যে, সরকারের একটি বিশেষ মহল আছে, চুক্তিকে নিয়ে, চুক্তিকে কেন্দ্র করে নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে। সাম্প্রতিককালে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ছাত্রপরিষদ, গণপরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের একটা ছোট গ্রুপ চুক্তির বিরোধিতা করে আসছে এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে, স্লোগান দিয়ে বিশৃংখলা অবস্থার সৃষ্টি করছে। চুক্তির বিরোধিতার নামে তারা মূলত জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে বা অস্তিত্বকে ধ্বংস বা বিলুপ্ত করার জন্য সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। আর সরকারের বিশেষ মহলটি এদের মদদ দিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ শোনা যায় চুক্তি বিরোধীদের পিছনে বিদেশী শক্তিও রয়েছে। সরকারতো বলেছে চুক্তি বিরোধীদের বিরুদ্ধে তারা তৎপর। বেশ কিছু ব্যক্তি গ্রেফতারও হয়েছে।

সন্তু লারমাঃ এক্ষেত্রে আমরা যতোটুকু জানি সেটা বলতে পারি। তারা কোনো বিদেশী শক্তির সহযোগিতা বা সাহায্য পাচ্ছে বলে আমাদের জানা নেই। অবশ্য তাদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে সত্য। কিন্তু করা হচ্ছে কি কারণে? প্রশাসন বা আইনশৃংখলা কর্তৃপক্ষ যখনই তাদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখনই তাদের গ্রেফতার করা হয়। এই যে খাগড়াছড়িতো এখান থেকে বেশি দুরে নয়, বলা যায় তাদের প্রধান আস্তানা। যেখান থেকে তাদের কার্যকলাপ চালানো হয়। সবকিছু জেনেশুনেও তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা হচ্ছে না। আমরা তো দু'একবার শুনেছি পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী সেখান থেকে ঘুরে এসেছে। কিন্তু ঘুরে আসলে তো হবে না। তাদের

www.pathagar.com

কার্যকলাপতো নিষ্ক্রিয় করা হয় না। এ রকম কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপও দেখতে পাই না। আমরা শুনেছি যে, গ্রেফতার করার পর পর সরকারের পক্ষ থেকে তাদের জামিন দেয়ার সুপারিশ করা হয়। জামিনও পেয়ে গেছে। সবাই জানে যে, এরা ফিরে এসে আবারো সে কাজ করবে। সরকারের কোন না কোন বিশেষ মহলের কারণে এটা হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি বলছেন, তারা সশস্ত্র হয়ে ঘোরাফেরা করছে। তাহলে আপনাদের নিরাপত্তা কি হুমকির মুখে?

সন্তু লারমাঃ নিশ্চয়ই। এটাতো আমরা বলেই আসছি। অথচ সরকারের সঙ্গে আমাদের অলিখিত চুক্তি ছিল যে, আমাদের নিরাপত্তা সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হবে। কিন্তু আমাদের নিরাপত্তা তো দেয়া হচ্ছে না। যেমন গতবার আমি রাঙ্গামাটি হয়ে চট্টগ্রাম গেলাম-তখন পুলিশ এসেছে। কিন্তু গাড়ি ছিল না। প্রায় ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর, না পেয়ে খাগড়াছড়ি বাজার থেকে একটা গাড়ী ভাড়া করে রাঙ্গামাটি রাজবনবিহারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। দেরিতে গিয়ে পৌঁছেছি। ঠিক সময় পৌঁছতে পারিনি। কিন্তু বিষয়টা সেটা না। আমি পৌঁছতে পারি বা না পারি, আন্তরিকতাটা এখানে প্রশ্ন। আমাকে যদি এতো গুরুত্ব দেয়া হতো, তাহলে আমার নিরাপত্তার দিকটাও দেখা হতো। আমি যাচ্ছি সরকারি কাজে চট্টগ্রামে। একদিন আগে না হয় আর কি। আমার তো মূলত লক্ষ্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির কাজে চট্টগ্রাম যাওয়া। তাহলে আমাকে, যিনি জনসংহতি সমিতির সভাপতি, যানবাহনের সুযোগটা দিতে হবে না? যিনি এতো বড় একটা শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন, সে শান্তিচুক্তি দেশে বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। সেখানে তার জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা হবে না কেন? স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এটা আগেই করা উচিৎ ছিল না? চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আমি একজন সদস্য। সে হিসেবে আমার প্রয়োজন এখানে চুক্তির ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলা। অথচ নানা অসুবিধার কারণে আমি তা ঠিকভাবে করতে পারছি না। অন্যদিকে দেখেন প্রসিত সঞ্চয় গ্রুপটা। ঘিলাছড়িতে যাদের অপহরণ করলো তাদের তো মেরেই ফেলতো। জনগণের চাপ ছিল বলে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ১০ নভেম্বরের ঘটনা দেখেন যেটা বিজিতলায় হয়ে গেলো। দিনটি তারাও পালন করেছে, আমরাও করেছি। কর্মসূচি শেষে ফিরে যাওয়ার সময় তারা আক্রমণ করলো। ১০ জন আহত হলো, ৮টি গাড়ি ভাংচুর করলো। যে গাড়িগুলো এসেছে সভা চলার

www.pathagar.com

সময়, সেগুলোর সিটসহ বিভিন্ন জিনিস নষ্ট করেছে। এগুলো হয়রানি ছাড়া আর কি? যাতে পরবর্তীতে গাড়ির মালিকরা আমাদের গাড়ি না দেয়। নিরাপত্তা ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট সমস্যা করছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি একাধিকবার অলিখিত চুক্তির কথা বলছেন। এর আগেও বলেছেন, আসলে কি ছিল তাতে?

সন্তু লারমাঃ এখনতো সবকিছু বলা যাবে না। কথা ছিল, ২২ সদস্যের আঞ্চলিক পরিষদ জনসংহতি সমিতি করবে। আমাদের নিরাপত্তা বিধান করবে। আরো কতোগুলো ছিলো। সবকিছু মিলিয়ে চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন নিয়ে যথেষ্ট আশংকা প্রকাশ না করে পারছি না। লিখিত চুক্তির মধ্যে জেলা পরিষদ আইনটা হচ্ছে না। সেটা সর্বাগ্রে হওয়ার কথা। যে জেলা পরিষদ আইনটাকে কেন্দ্র করে চুক্তিটা, বলা যায় সমস্তটা এবং এখানকার সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতির ক্ষেত্রে, আইনশৃংখলা নিয়ন্ত্রণে মূল ভূমিকা জেলা পরিষদ আইনের। সেটা এখনো ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। গত ২ নভেম্বর চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির যে মিটিং হলো সেখানে আমাদের কথা হলো শুধু রাঙ্গামাটি জেলার স্থায়ী অউপজাতীয় বাসিন্দা ধারাটা পরিবর্তন করা হবে। অথচ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান জেলা পরিষদ আইনে আরো বিরোধাত্মক ধারা রয়েছে। সেগুলো না হলে তো আইন অসম্পূর্ণ থেকেই যাবে। এভাবে তিন মাস, ছয় মাস পর পর একটা করে সংশোধন করা হলে আগামী ৫ বছরেও তো শেষ হবে না। চুক্তি অনুসারে নতুন করে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচন এগুলো করতে করতে তো বর্তমান সরকারের সময়টাই পার হয়ে যাবে। কখন চুক্তি বাস্তবায়ন হবে? চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠকে গেলে মনে হয় যেন নতুন করে ডায়ালগ শুরু হয়েছে। একদিকে সরকার পক্ষ অন্যদিকে জনসংহতি সমিতি। কি আশ্চর্যের ব্যাপার ! আমারা সব সময় লিখিত আলোচনা দাবি জানিয়ে আসছিলাম। সর্বশেষ বৈঠকে জানানো হলো, তাদের পক্ষে সম্ভব না। চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির একটা অফিস পর্যন্ত নেই।

প্রশ্ন ঃ তাহলে আকাংখা পূরণ হচ্ছে না?

সন্তু লারমাঃ নিশ্চয়ই না। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

প্রশ্ন ঃ চুক্তি বাস্তবায়নে বিরোধী দলের সহযোগিতা চাইবেন বলেছেন। এতে কি বোঝাতে চেয়েছেন?

সন্তু লারমাঃ এটা আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি। চুক্তি যেহেতু জনসংহতি

www.pathagar.com

সমিতি বা সরকারের একক চুক্তি না, এটা হচ্ছে গোটা বাংলাদেশের স্বার্থের জন্য একটা চুক্তি। এই চুক্তিতে যে অধিকার দেয়া হয়েছে তা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা সকল পাহাড়ী, বাঙালীর। এখানে এ চুক্তি যদি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হতে পারে, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সম্পদ তা যদি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কাজে লাগানো যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি শান্তি আসতো গোটা বাংলাদেশেরই শান্তি।

প্রশ্ন ঃ কিছু বিরোধী দলতো চুক্তি মানে না। বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া নিজেই বলেছেন, উনি ক্ষমতায় আসলে চুক্তি সংশোধন করবেন।

সন্তু লারমাঃ তারা না মানলেও আমরা যাবো। আমরা মনে করি এটা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

প্রশ্ন ঃ বিএনপি আমলে আপনাদের সঙ্গে সংলাপ হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হলো না কেন?

সন্তু লারমাঃ বিএনপি আমলে আমরা সরকারের কাছে লিখিতভাবে আমাদের দাবি দিয়েছিলাম। তারা সেটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট উওর দিয়েছিলেন। তারা যেটা দিতে চেয়েছিলেন, সেটা পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের মতোই। অবশ্য পরে একটা সাব কমিটি করা হয়েছিল, আপনারা জানেন। কিন্তু সাব কমিটির তো সে ধরণের কোন ক্ষমতা ছিল না।

প্রশ্ন ঃ এরশাদ আমলেও তো আলোচনা হয়েছে- সে সম্পর্কে বলবেন? তখন কি সমস্যা হয়েছিল?

সন্তু লারমাঃ এরশাদ সরকারকেও আমরা লিখিত দিয়েছিলাম, তারা নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে বৈঠকে ফেরৎ নিয়ে এসে বলেছিলেন, তারা তা গ্রহণ করবেন না। তারা একটা লিখিত দেবেন, তা আমাদের গ্রহন করতে হবে এবং সেটার ওপর আলোচনা হবে। আমরা বলেছিলাম, সেটা সম্ভব না। এরশাদ সরকারতো পার্বত্য জেলা স্থানীয় পরিষদ আইন-১৯৮৯, ওই পর্যায়েই ছিলেন। সেটা ৯ দফা রূপরেখার ভিত্তিতে হয়েছিল। সে থেকে আর আলোচনার অগ্রগতি হয়নি।

প্রশ্ন ঃ জিয়াউর রহমানের সময় আপনি জেলে ছিলেন। শোনা যায় তখন আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা হয়েছিল এবং তার ভিত্তিতে আপনাকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল।

সন্তু লারমাঃ হ্যাঁ, তখন থেকে সংলাপের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। প্রক্রিয়াটি আমিই শুরু করেছি। অবশ্যই পার্টির সম্মতি নিয়ে। তখন সরকারের মধ্যে

www.pathagar.com

একটা গ্রুপ ছিল। আমার মনে হয় তৎকালীন উপ-প্রধান মন্ত্রী মশিউর রহমান চেয়ে থাকতে পারেন। প্রক্রিয়া সেখানে শুরু হয়েছিল, লক্ষ্য ছিল কিভাবে সমঝোতায় পৌঁছানো যায়। আমাকে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে কোন কারণ থাকতে পারে কিনা জানিনা। তবে আমি মুক্তি পেয়েছিলাম, বিনাশর্তে। মুক্তি পাওয়ার পর আমি চেষ্টা করেছিলাম উভয় পক্ষ যাতে বসতে পারে। কিন্তু সেটা হয়নি।

প্রশ্ন ঃ জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক ভবিষ্যত কি?

সন্তু লারমাঃ আমিতো মনে করি জনসংহতি সমিতির রাজনীতির ভবিষৎত অত্যন্ত উজ্জল। কারণ জনসংহতি সমিতি সুনির্দিষ্ট নীতি, আদর্শ নিয়ে চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা করাই জনসংহতি সমিতির মূল লক্ষ্য। তাছাড়া জনসংহতি সমিতিতো দীর্ঘ দু'যুগেরও বেশি সময় ধরে রাজনীতি করে আসছে। সাধারণ মানুষের সমর্থনও পেয়েছি।

প্রশ্ন ঃ জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা আছে কি?

সন্তু লারমাঃ রাজনৈতিক দল হিসেবে জনসংহতি সমিতি অবশ্যই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তা এককভাবে হতে পারে আবার অন্য কোন জাতীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিলেও করতে পারে। তবে তা নির্বাচনের সময়ের সামগ্রিক অবস্থা এবং বাস্তবতার উপর নির্ভর করবে।

প্রশ্ন ঃ কার সঙ্গে জাতীয় রাজনীতিতে যেতে পারেন?

সন্তু লারমাঃ যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা পাহাড়ী-বাঙালী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহানুভূতি সম্পন্ন। তাছাড়া রাজনৈতিক দল হিসেবে জনসংহতি সমিতি জাতীয় ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ জনসংহতি সমিতির মতো আওয়ামী লীগের জনসমর্থনের একটা বড়ো ভিত্তি রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে, বিশেষ করে পাহাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে। পরিস্থিতি নিজেদের পক্ষে নেয়ার জন্যই কি চুক্তি সম্পর্কে আপনারা ক্ষোভ, অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন?

সন্তু লারমাঃ না, এখানে চুক্তির ওপর ক্ষোভ-অসন্তোষ প্রকাশ করে আমরা রাজনীতি করছি না। চুক্তি বাস্তবায়নটা সবার দাবি এবং আমি মনে করি জনসংহতি সমিতি আওয়ামী লীগের বিপক্ষে নয়। তবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার চলছে। তাই চুক্তি বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগের জাতীয় নেতৃত্বের বেশি ভূমিকা রাখা উচিত।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসের করণে উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হচ্ছে। আইনশৃংখলার অবস্থা খারাপ। তেল গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ চলছে। আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব নিয়ে কি আপনারা এসব কিছু নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন?

সন্তু লারমাঃ উন্নয়নের বিষয় বলতে গেলে প্রথমে আমাদের যে দিকটা দেখা দরকার সেটা হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী জনগণের স্বার্থ। সেজন্য বর্তমান যে পরিস্থিতি, সেটা স্বাভাবিক হয়ে না আসা পর্যন্ত হাজার হাজার পরিবার নিজ বাস্তভিটায় ফিরে যেতে পারছে না। নিজের জায়গাজমি তারা নিজেদের দখলে আনতে পারেনি। সেই ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী, আর এখানে অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু শরণার্থী যারা বিভিন্ন জায়গায় আছেন, তাদের পুনর্বাসনটা না হওয়া পর্যন্ত উন্নয়ন তৎপরতা তেমন কাজে দেবে না। সর্বোপরি এখন এই যে বহিরাগত যারা আছেন, যারা স্থায়ী বাসিন্দা নন, ৪ লাখের বেশি মানুষ, তাদেরও একটা সম্মানজনক পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের কোন সুফল পাওয়া যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত ঃ হচ্ছে এখানে এই উন্নয়নের কার্যক্রম যাতে অর্থবহ হতে পারে তার জন্য পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ঠিকভাবে কার্যকর করা প্রয়োজন। অর্থাৎ এই আইনগুলো প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এবং আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এখানে উন্নয়নের কাজ যদি নেয়া হয়, তাহলে সেগুলোর বাস্তবায়ন একটা সমস্যা দেখা দেবে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, এখানে উন্নয়নটা স্থায়ী বাসিন্দাদের স্বার্থে না আসার সম্ভাবনা বেশি। সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে উন্নয়ন এখানে দরকার, উন্নয়নকে আমরা স্বাগত এবং শুভেচ্ছা জানাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ অত্যন্ত গরিব এবং পশ্চাৎপদ। এখানকার হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষের পুনর্বাসন হওয়া দরকার। উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে বরাদ্দ দেয়া হয় সেটা আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে হওয়া দরকার। দেশী-বিদেশী যে উন্নয়ন বরাদ্দ হবে তা আঞ্চলিক পরিষদের নেতৃত্বে হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ আপনি চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলনের কথা বলছেন।

সন্তু লারমা ঃ আমরাতো আন্দোলনের মধ্যেই আছি। অস্ত্র জমা দিয়ে আন্দোলনের রুপ পাল্টিয়েছি। গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে সশস্ত্র আন্দোলন করছি। এখন অস্ত্র জমা দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আন্দোলন করছি। অস্ত্র জমা দেয়ার পর আমরা মনে করি চুক্তি বাস্তবায়ন দরকার।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ আঞ্চলিক পরিষদে প্রতিনিধিত্ব নিয়ে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলোর মধ্যেওতো ক্ষোভ অসন্তোষ রয়েছে।

সন্তু লারমাঃ এখানে আমাদের যে আঞ্চলিক পরিষদের দাবি ছিল, আর বর্তমানে যে আঞ্চলিক পরিষদ দেয়া হয়েছে, সেটা দাবি অনুসারে হয়নি। এখন যে সংখ্যাটা আছে এটা অনুসারে যদি দেখতে হয়, তাহলে ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু জাতিগুলোর সরাসরি প্রতিনিধিত্ব তাতে নেই। প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে যাতে কমপক্ষে একজনকে দেয়া যায়, সেজন্য আমরা দাবি করেছিলাম ২৮ সদস্য। যেহেতু রূপটা হয়ে গেছে জাতিভিত্তিক, সেহেতু প্রত্যেক জাতি থেকে কমপক্ষে একজন করে নিতে চেয়েছিলাম। সেটা সরকার পক্ষ মেনে নেয়নি। সে জন্য ২২ সদস্য করা হয়েছে এবং সেটা সংখ্যাভিত্তিক হয়েছে। আসলে সেটাও ঠিক হয়নি। এখানে বাঙালিদেরকে যেটা এক-তৃতীয়াংশ ধরা হয়েছে, তা কমে যাবে। বাঙালি সংখ্যা পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে যেভাবে দেখা যায়, যিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা- তিনি ভোটাধিকার প্রাপ্ত। ভোটাধিকার প্রাপ্ত মানে উনি নির্বাচিত হতে পারবেন। তাহলে আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বাঙালি জনসংখ্যা, তা কমে যাবে। যারা এখানে আছেন তারা সবাই স্থায়ী বাসিন্দা নন। সামগ্রিক হিসেবে এক-তৃতীয়াংশ, যাতে ৫০ হাজারে একজন সদস্য ধরা হয়েছে। ৭ জন বাঙালি সদস্য মানে, জনসংখ্যা সাড়ে ৩ লাখ। অথচ পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুসারে এ সংখ্যা আরো কম হবে। মানে এক তৃতীয়াংশ না। তাই এখানে ভাগটা জাতিভিত্তিক করা হয়নি। অবশ্য জাতিভিত্তিক করা হলে ভাল হতো। সেটা করা সম্ভবপর হয়নি। তবে ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাগুলোরতো জেলা পরিষদে প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পাঠকদের প্রতি আপনার কোন কিছু বলার আছে কি?

সন্তু লারমাঃ আপনাদের মাধ্যমে সকলের কাছে আমাদের আবেদন, চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের পক্ষে সবাই থাকবেন এই কামনা করি। এখানকার যে বাস্তবতা তা যেন সংবাদপত্রে তথ্যভিত্তিক এবং সঠিকভাবে প্রকাশিত হয় সেটাও আশা করি। আপনাদের মাধ্যমে আহ্বান জানাই সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, পেশাজীবি, রাজনৈতিক ব্যক্তিসহ সর্বস্তরের জনগণ যেন শান্তিচুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের পক্ষে থাকেন।

www.pathagar.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন

(ক) সাধারণ ঃ ১ হতে ৪ নং ধারা - চুক্তির কমিটি সংক্রান্ত।

(খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/ পার্বত্য জেলা পরিষদ সংক্রান্ত।

শান্তি চুক্তির ধারা	পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর বিধি	অগ্রগতি	মন্তব্য
১ নং ধারা হতে ২৩ নং ধারা পর্যন্ত বিভিন্ন শব্দ, সংজ্ঞা, সদস্য বিষয়ক। যে সমস্ত পরবর্তীতে প্রতিস্থাপিত কিংবা কার্যকর করা হয়েছে।	-	-	১০০%
২৪। (ক) আপততঃ বলবৎ আইনে যাহা থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন পুলিশ স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয় প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।	ধারা - ৬২	বাস্তবায়ন হয়নি।	০%
২৫। শব্দ প্রতিস্থাপন	ধারা - ৬৩	বাস্তবায়িত	১০০%
২৬। (ক) আপাততঃ বলবৎ আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্ত যোগ্য খাস জমিসহ কোন জায়গা জমি পরিষদের পূর্ব অনুমোদন ব্যাতীরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।	ধারা - ৬৪	বাস্তবায়িত	১০০%
(খ) আপাততঃ বলবৎ আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন প্রকারের জমি পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যাতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।		বাস্তবায়িত	১০০%

www.pathagar.com

(গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমীন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)-দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।		অবাস্তবায়িত	০%
(ঘ) কাপ্তাই হ্রদে জলে ভাষা জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল্য মালিকদেরকে ফেরত দেওয়া হইবে।		বাস্তবায়িত	১০০%
২৭। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের উপর ন্যাস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।		অবাস্তবায়িত	০%
২৮। পরিষদ ও সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন।	ধারা - ৬৭	বাস্তবায়িত	১০০%
২৯। বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত পরিষদের ক্ষমতা।	ধারা - ৬৮	বাস্তবায়িত	১০০%
৩০। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা সংক্রান্ত	ধারা - ৬৯	বাস্তবায়িত	১০০%
৩২। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের নিকট পরিষদের প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষমতা সংক্রান্ত।	ধারা - ৭৯	বাস্তবায়িত	১০০%
৩৩। পরিষদের কার্যাবলীর মধ্যে কতিপয় সংযোজন-(১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (২) প্রাথমিক শিক্ষা ও (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।		বাস্তবায়িত	১০০%
৩৪। পরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে।		বাস্তবায়নের বিষয় নেই	
৩৫। কর আদায় সংক্রান্ত।		বাস্তবায়ন হয়নি।	০%

www.pathagar.com

গ। **পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ঃ**

শান্তি চুক্তির ধারা	অগ্রগতি	মন্তব
১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে।	বাস্তবায়িত	১০০%
২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের ভোটে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। যার পদমর্যাদা হবে এক জন প্রতিমন্ত্রীর সমমর্যাদার সমান এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হবেন।	বাস্তবায়িত	১০০%
৩। চেয়ারম্যানসহ ২২ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ গঠন।	বাস্তবায়িত	১০০%
৪। তিনটি মহিলা সদস্যে পদ সংরক্ষণ	বাস্তবায়িত	১০০%
৫। সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন।	বাস্তবায়িত	১০০%
৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর হবে।	বাস্তবায়িত	১০০%
৭। যুগ্ন-সচিব পদমর্যাদার মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ	বাস্তবায়িত	১০০%
৮। (ক) অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান নিয়োগ। (খ) উপ-নির্বাচনের নিয়ম।	বাস্তবায়িত	১০০%
৯। (ক) তিন জেলার উন্নয়নের সমন্বয় সাধন। (খ) পৌরসভা সহ স্থানীয় পরিষদ সমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়। (গ) পরিষদের তিন জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করতে পারবে। (ঘ)পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম সহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করতে পারবে। (ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভূক্ত থাকবে। (চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করতে পারবে।	বাস্তবায়িত হয়নি	০%

www.pathagar.com

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করবেন।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপজাতীয় চেয়ারম্যান নিয়োগ হয়নি।	
১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশ ক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দুর করা হবে।	বাস্তবায়নের কিছু নেই।	
১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করে তার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারবেন।	বাস্তবায়িত	১০০%
১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ক্রমে ও ইহার পরামর্শে আইন প্রণয়ন করবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে এরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করতে পারবেন।	বাস্তবায়িত	১০০%
১৪। আঞ্চলিক পরিষদের তহবিল গঠন সংক্রান্ত।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	১০০%

ঘ। পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী ঃ

১। চুক্তি অনুযায়ী উপজাতীয় শরণার্থীগণ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য হতে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং জনসংহতি সমিতি এ কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করে একটি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সমাপ্ত। তবে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলায় ২৬ টি শরণার্থী পরিবার পুনর্বাসনের নিমিত্তে তাদের বরাদ্দকৃত ভূমিতে ফিরে যাচ্ছে না। অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্ট করণের জন্য গঠিত টাস্কফোর্স কার্যক্রম পুনরায় শুরু করেছে।	৯৯.৮% ১২,১৬৯টি পরিবারের মধ্যে ২৬ পরিবার ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধা গ্রহণ করা সত্ত্বেও নিজস্ব ভূমিতে না গিয়ে ৪টি স্কুল ভবনে অবস্থান করছে।

www.pathagar.com

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় ভূমি জরিপ সংক্রান্ত।	বাস্তবায়ন হয়নি।	
৩। ভূমি বন্দোবস্তকরণ।	প্রক্রিয়াধীন।	
৪। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কল্পে একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ল্যান্ড কমিশন গঠন।	বাস্তবায়িত	১০০%
৫। কমিশনের গঠন (সদস্য নির্দিষ্টকরণ) সংক্রান্ত।	বাস্তবায়িত	১০০%
৬। কমিশনের মেয়াদ তিন বছর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন।	প্রক্রিয়াধীন।	
৭। শরণার্থীদের ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত।	৫০০০/- টাকা পর্যন্ত ৬৪২ জনের ঋণ মওকুফ করা হয়েছে ৭২১ জনের ঋণ মওকুফের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	
৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়ে ছিল তাদের মধ্যে যারা গত ১০বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করে নাই বা জমির সঠিক ব্যবহার করে নাই সে সকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।	বাস্তবায়িত	১০০%
৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প ও অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করবেন এবং সাথে সাথে পর্যটন ব্যবস্থার বিকাশে উৎসাহ যোগাবেন।	বাস্তবায়িত	১০০% একটি পর্যটন মোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। মোটেলের কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে পূর্ণরূপে শুরু হবে।
১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান।	বাস্তবায়িত	১০০%
১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় এবং বিকাশ সংক্রান্ত	বাস্তবায়িত। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট স্থাপিত হয়েছে।	১০০%

www.pathagar.com

১২-১৫। জনসংহতি সমিতির সদস্য তালিকা প্রদান ও অস্ত্র জমাদান সংক্রান্ত।	বাস্তবায়িত	১০০%
১৬। সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন সংক্রান্ত।	বাস্তবায়িত	১০০%
১৭। সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেয়া প্রসংগে। এদের পরিত্যক্ত জমি প্রকৃত মালিক অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা প্রসংগে।	৭০ টি সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। এছাড়াও সম্প্রতি আমর্স ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পগুলি ফেরত নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।	
১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারি, আধাসরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ প্রসংগে।	বাস্তবায়িত	১০০%
১৯। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা ও মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি গঠন।	বাস্তবায়িত	১০০%

www.pathagar.com

পার্বত্য গণ পরিষদের স্মারকলিপি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ রিজার্ভ বাজার, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

তারিখ ঃ ২৭/০৪/২০০৪ ইং

বরাবরে
মাননীয় মন্ত্রী,
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
বাংলাদেশ

বিষয় ঃ **স্মা র ক লি পি।**

মহাত্মন,

গভীর শ্রদ্ধা ও যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন নিম্নমতে পেশ করা গেলঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তম সংগঠন ও মানবাধিকার কাজে নিয়োজিত পার্বত্য গণ পরিষদ নেতৃবৃন্দ ১৯৯১ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে এবং পার্বত্য চটগ্রামের (তিন জিলার) মোট জনসংখ্যার ৫০% শতাংশ অধিবাসী বাঙালী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয় সম্প্রদায়ের এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা তথা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সরকারকে ক্রমান্বয়ে স্মারকলিপি, পত্র-পত্রিকা, সেমিনার, জনসভা ও সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে জনগণের রায়ের ভিত্তিতে দাবি-দাওয়া পেশ করেছেন। কিন্তু অদ্যাবধি ৫০% শতাংশ পার্বত্য বাঙালীদের দাবি সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি।

দাবি সমূহ ছিল ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে সম-অধিকার, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালুকরণ, মানবাধিকার রক্ষা, শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসা, ব্যাংক ঋণ, ঠিকাদারী, ছাত্রবৃত্তি, কোটা, ভূমি বন্দোবস্তি, ইজারা, হস্তান্তর, ক্যাডেস্ট্রেল সার্ভে ও সমান অধিকার, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল কালাকানুন, বৈষম্য চুক্তির স্পর্শকাতর শর্তগুলি বিলুপ্তি সাধন বা সংশোধন, অগণতান্ত্রিকভাবে সৃষ্ট জেলা পরিষদ ও বৈষম্য আঞ্চলিক পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উক্ত সংস্থাগুলিকে পুনর্গঠন ও সকল সম্প্রদায়ের সমান প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখা এবং সমতা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিয়োগ বা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ রাখা। উপজাতীয় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, পণ টাকা

www.pathagar.com

আদায়, হত্যা ও রাহাজানি বন্ধ করা। জেলা পরিষদ ও মন্ত্রণালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্ব বহনকারী সমালোচিত ও বিতর্ক সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপমন্ত্রী পদে বহালরত ব্যক্তিদেরকে অপসারণ করা। দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের নীল নকশা বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সক্রিয়ভাবে সাহায্যকারী বৈষম্য আঞ্চলিক পরিষদের বহু সমালোচিত ও বিতর্কিত ব্যক্তি চেয়ারম্যান পদে বহালরত সন্তু লারমার হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও বাঙ্গালী বিদ্বেষপূর্ণ সকল ষড়যন্ত্র বন্ধ করা।

সংক্ষেপে বিস্তারিত বিবরণ ঃ

দেশনেত্রী ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী দল ও চার দলীয় ঐক্য জোট নেতৃবৃন্দ নির্বাচনত্তোর সময়ে দেশবাসীকে চুক্তি বাতিলের ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং চুক্তি বিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে ভূমিকা নিয়ে মিছিল, সমাবেশ, কালো পতাকা উত্তোলন ও লং মার্চের মত কঠোর ও ব্যাপক কর্মসূচি দিয়েছিলেন। কিন্তু বিএনপি ও চার দলীয় জোট সরকার দুই/আড়াই বছর ক্ষমতায় থেকে সময় অতিবাহিত করলেও চুক্তির স্পর্শকাতর শর্তগুলি বাতিল করেননি এবং যেভাবে ক্ষমতায় গিয়ে এ সরকার কাজ করার প্রত্যাশা জনগণ পোষণ করেছিলেন তা হচ্ছে না কেন দেশবাসী এ জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। বৈষম্য আঞ্চলিক পরিষদ ও অগণতান্ত্রিকভাবে সৃষ্ট জেলা পরিষদ নামে সংস্থা চালু রেখে শুধু উপজাতিদের দাবি অনুযায়ী বাঙালীদের দুঃখ দুর্দশার কথা চিন্তা ভাবনা না করে এক তরফা নীতি অবলম্বন করার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দেরকে ব্যাংক ঋণ ও সুদ মওকুফ, বিনা সুদে নতুন ঋণ প্রদান এবং চাকুরি হারাদেরকে চাকুরিতে পুনর্বহাল ইত্যাদির ব্যাপারে বর্তমান সরকারের পরীবিক্ষণ মন্ত্রী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্বারা এ দেশের মানুষ ও অঞ্চলের মধ্যে বিভক্তিকরণের নতুন মাত্রা যে যোগ হতে যাচ্ছে তা গভীরভাবে ভেবে দেখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথা বর্তমান সরকারের কাছে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি। এর সাথে আরও আবেদন থাকবে যে, উপজাতিদের জন্য ব্যাংক ঋণ ও সুদ মওকুফ যে হারে করা হবে অনুরূপ পার্বত্য বাঙালীদের জন্যও যেন করা হয়। যেহেতু পার্বত্য বাঙালী অধিবাসী ঐ একই অঞ্চলে বসবাসকারী বাসিন্দা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের বাইরে কোন দেশ বা অঞ্চল নয়। পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ী ও বাঙ্গঙালীরা একই পরিবেশ ও একই ভৌগলিক সীমা রেখার মধ্যে বসবাসকারী বাসিন্দা। এই অঞ্চলে পাহাড়ী ও বাঙালীদের মধ্যে নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে বৈষম্য সৃষ্টি করা হলে তার জের হিসেবে আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার কঠোর মনোভাব জাগ্রত করবে জাতিতে জাতিতে এবং অদূর ভবিষ্যতে পার্বত্য অঞ্চলকে পৃথক করে নেওয়ার জন্য পথ আরও সুগম হয়ে যাবে। যতই সুযোগ

www.pathagar.com

দেওয়া হোক না কেন সন্তু লারমা ও তার সংগঠন জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের মনোভাব বাংলাদেশের প্রতি ভাল নয়। আর এ বৈষম্য নীতি নির্ধারণের দ্বারা শান্তি বিঘ্নিত তো হবেই তা শুধু নয় এর ফলে জের ধরে পাহাড়ী ও বাঙালীদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। তাই নির্বাচনত্তোর সময়ে চার দলীয় ঐক্য জোট সরকার জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা দিয়েছিলেন তা পূরণ করার এবং বৈষম্য চুক্তির স্পর্শকাতর শর্তগুলি বাতিল করার জন্য এখন নিতান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তা না হলে দেশের সার্বভৌমত্বের চরম ক্ষতি হয়ে যাবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে (তিন জিলায়) গত ২ যুগ ধরে উপজাতীয় সন্ত্রাসীরা (জেএসএস, পিসিপি,ইউপিডিএফ) যেভাবে কর্মকান্ড চালিয়ে আসছে তৎমধ্যে ১৯৮৪ সালে রাঙামাটি জিলার বরকল থানায় ভূষণছড়ায় ৬শ বাঙালীকে একরাতে নির্মমভাবে হত্যা (শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ হত্যার শিকার), বান্দরবানের আলী কদম থানায় ১০০০ হাজার মুরং হত্যা, বাঘাইহাটে ২৮ জন এফআইডিসি-র কর্মচারীর ও ১১ হিন্দু জেলের গণহত্যা, ১৯৯৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বাঘাইছড়ি থানার পাকুয়াখালীতে অর্ধ শতাধিক বাঙালী কাঠুরিয়া হত্যার ঘটনা মাইলাই হত্যাকান্ডের ঘটনাকেও হার মানিয়েছিল। এ ছাড়াও উপজাতীয় সন্ত্রাসীরা সন্তু লারমার নেতৃত্বে ঘাতক তথাকথিত শান্তি বাহিনীকে দিয়ে নির্বিচারে তিন পার্বত্য জেলায় হত্যা করেছে ৩০ হাজারেরও উর্ধ্বে নিরীহ মানুষকে। হত্যাযজ্ঞের অপরাধে খুনিদের কোন বিচার হয়নি। উল্লেখ্য যে, উপজাতীয় সন্ত্রাসীরা সাড়ে ৭ হাজারেরও মত নিরীহ মানুষকে অপহরণ করেছে, আহত করেছে সাড়ে ৫ হাজারেরও উর্ধ্বে, তিন পার্বত্য জেলায় বাঙালীদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করেছে সাড়ে ৪ হাজারেরও উর্ধ্বে। আমরা খুনি ও অপরাধীদের বিচারের দাবি জানাচ্ছি। পার্বত্য গণ পরিষদ ও তার অঙ্গ সংগঠন পার্বত্য ছাত্র পরিষদ, পার্বত্য যুব পরিষদ, পার্বত্য শ্রমিক পরিষদ, পার্বত্য মহিলা পরিষদ, পার্বত্য ব্যবসায়ী ও পার্বত্য অঞ্চলের সকল স্তরের মানুষের পক্ষে আজ আমরা সকল হত্যাকান্ড এবং বৈষম্য চুক্তির পথ থেকে এ যাবৎ পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতীয় সন্ত্রাসী কর্তৃক যে সব নিরীহ মানুষ হত্যা করা হয়েছে তার উপযুক্ত তদন্ত, খুনিদের বিচার ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপুরণ প্রদানের দাবি জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন শৃংখলার চরম অবনতি ঘটলেও ক্লিন হার্ট অপারেশনের মত পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা বাহিনীকে সেভাবে নামানো হয়নি। ফলে গোলাবারুদ মওজুদ ও সশস্ত্র উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের উপদ্রব পার্বত্য অঞ্চলে পূর্বের তুলনায় অনেক গুন বেড়ে গেছে। তবে বিভিন্ন সূত্র হতে জানা যায় এদের গড ফাদার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে সরকারিভাবে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় সুযোগ ভোগকারী বিতর্কিত ব্যক্তি সন্তু লারমা ও জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দ। এ ছাড়াও রয়েছে ইউপিডিএফ নামে উপজাতীয় আলাদা সশস্ত্র গ্রুপ। যাদের অত্যাচারে

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে এবং নিরাপত্তাহীনতায় মানুষ আতংকগ্রস্থ জীবন কাটাচ্ছে এ পার্বত্যাঞ্চলে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে বাঙ্গালীরা চরমভাবে দুর্দশার শিকার। বাঙালীরা ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত তো বটেই বরং নাগরিক অধিকারটুকু পার্বত্য বাঙালীদের থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এর সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ভূক্ত উপজাতীয় লোকেরাও বঞ্চিত। শুধু তাই নয় এ চুক্তির ফলে সরকারও হারাতে যাচ্ছে তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। তাই আমরা আজকের এই বৈঠকের মাধ্যমে মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় সমীপে নিম্নোক্ত দাবি সমূহ বাস্তবায়নের জন্য পেশ করছি। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৯২ সাল থেকে পার্বত্য গণ পরিষদ কর্তৃক যে সব দাবি-দাওয়া পেশ করা হয়েছে তৎমধ্যে 'স্থানীয় সরকার পরিষদ' যেখানে লেখা রয়েছে সে সব স্থলে পরিবর্তিত শব্দ হিসেবে ব্যবহার হবে 'জেলা পরিষদ'। ইহা পার্বত্য গণ পরিষদের ৭ দফা দাবি নামা ও ১৮ দফা সুপারিশমালার মধ্যে সংশোধন ও সংযোজিত হবে।

দাবি সমূহ।

১। পার্বত্য গণ পরিষদের বিগত দাবি-দাওয়া সম্বলিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে পেশকৃত স্মারকলিপি সমূহের ভিত্তিতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

২। জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (সংশোধন) বলে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে প্রদত্ত ভূমি বন্দোবস্তি, ইজারা ও হস্তান্তর ইত্যাদি সংক্রান্ত ক্ষমতা অতিসত্তর বাতিল করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে উক্ত বিষয়ে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকদের নিকট পূর্বের ন্যায় ক্ষমতা বহাল রাখা।

৩। চাকমাদের জন্য চাকমা সার্কেল চীফ, মগদের জন্য মগ সার্কেল চীফ, মারমাদের জন্য বোমাং সার্কেল চীফ, গোত্র বিশেষে যদি নিয়োগ দেওয়ার Provision এবং Tradition বলবৎ রাখা হয় তাহলে পার্বত্যাঞ্চলে প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধারা অনুযায়ী গোত্র বিশেষে চীফ নিয়োগ দেওয়া। এর সাথে ৫০% শতাংশ পার্বত্য বাঙালীদের জন্য তিন জিলায় সার্কেল চীফ এর ন্যায় মনোনীত ব্যক্তি নিয়োগ দেওয়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করা।

৪। ভূমি কমিশনের কাজ চালু করার আগে ক্যাডেস্ট্রেল সার্ভে চালু করা।

৫। ভূমি বন্দোবস্তী/ইজারা/হস্তান্তর এবং মিউটেশন মামলা নিস্পত্তির ব্যাপারে বাঙ্গালীদের জন্য এবং উভয় ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ক্ষমতার নিয়ামক হিসেবে জেলা প্রশাসকের দেয়া সনদপত্র গ্রাহ্য করা এবং জেলা প্রশাসকের সনদপত্র সকল ক্ষেত্রে বলবৎ অক্ষুন্ন রাখা।

৬। গত দুই যুগে সন্ত্রাসীদের শিকারগ্রস্থ স্বামী হারা, বিধবা, এতিম, অনাথ ও

www.pathagar.com

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদেরকে ক্ষতিপুরণ ও পুনর্বাসনের অতিসত্তর ব্যবস্থা করা।

৭। বৈষম্য আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে উক্ত সংস্থাগুলিতে নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোককে গণতান্ত্রিক নিয়মে সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া এবং এককভাবে উপজাতীয় কতিপয় ২/১টি সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ না দেওয়া।

৮। পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদেরকে (জেএসএস, পিসিপি, ছদক ও ইউপিডিএফ) সমূলে নির্মূল করা তথা পার্বত্য অঞ্চল তিন জিলার সাধারণ জনগণকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করণার্থে সেনা বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতা দিয়ে Combing Operation চালু করা।

৯। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় লোক চাকুরি জীবিদেরকে পাহাড়ী ভাতা দেওয়া বন্ধ করা এবং তিন বৎসরের অধিককাল একই স্থানে চাকুরি করলে সমতলে তাদেরকে বদলী করা।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা ক্যাম্প ও সেনা সদস্য আরও জোরদার করা। আনসার ও ভিডিপিদেরকে সরকারি নিয়মে বেতন ভাতা প্রদান এবং তাদের চাকুরি স্থায়ী করা।

১১। বৈষম্য নীতি প্রত্যাহার করে পার্বত্য বাঙালীদের জন্য উপজাতীয়দের ন্যায় সুযোগ প্রদান করা (যেমনঃ শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসা, শিল্প, ঠিকাদারী, ছাত্র বৃত্তি, কোটা, ব্যাংক ঋণ ও ভূমি বন্দোবস্তী প্রভৃতির ক্ষেত্রে)।

১২। সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী পার্বত্য চট্টগ্রাম বৈষম্য চুক্তি অতিসত্তর বাতিল, সন্তু লারমাকে পদচ্যুতি ও তার উদ্ধ্যতপূর্ণ আচরণ, উক্তি ও তার অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা।

১৩। পার্বত্য গণ পরিষদ নেতৃবৃন্দের সাথে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলাপ-আলোচনার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে জরুরি ভিত্তিতে পার্বত্য গণ পরিষদ নেতৃবৃন্দের একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করা। এর সাথে সাথে সরকারের পরীবিক্ষণ মন্ত্রী সভার মাননীয় সদস্যবৃন্দের সাথে পার্বত্য গণপরিষদ প্রতিনিধি দলের একটি বৈঠকের ও আলাপের ব্যবস্থা করা।

১৪। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের জন্য অগ্রাধিকার শব্দটি পার্বত্য বাঙালীদের জন্যও প্রযোজ্য করা। স্থানীয় নাগরিকত্ব সনদপত্র প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসকের ক্ষমতা কোন অবস্থাতে রহিত না করা।

১৫। ভূমি প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জেলা প্রশাসকের হাতে ন্যস্ত রাখা। পার্বত্য চট্টগ্রামে জায়গার খাজনা আদায়ের জন্য উপজাতীয় হেডম্যানদের বিভিন্ন তাল বাহানা রহিত করার জন্য প্রত্যেক থানাওয়ারী তহশীল অফিস স্থাপন করা অথবা জেলা সদরে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা।

১৬। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, দাতা দেশসমূহ বা সংস্থা, দেশী-বিদেশী এনজি

www.pathagar.com

ওগুলির আর্থিক সাহায্য বিশেষ করে পল্লী উন্নয়ন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করার সময় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় প্রশ্নকে উর্ধ্বে রেখে পাহাড়ী ও বাঙালী উভয়ের জন্য সমাণভাবে বরাদ্দ ও বন্টন করা।

১৭। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় হতে সকল প্রকার বরাদ্দ, ত্রাণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুঃস্থদের জন্য দেয় আনুপাতিক হারে সমতাভিত্তিক এবং সমানভাবে পাহাড়ী ও বাঙালীদেরকে বন্টন করা।

১৮। পার্বত্য বাঙালী গুচ্ছগ্রামগুলিতে রেশনের পরিমান আরও বৃদ্ধি করা এবং দুঃস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদেরকে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য ছোট ছোট প্রকল্পের মাধ্যমে সকল দলীয় কোন্দলের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত রেখে জেলা প্রশাসক কর্তৃক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

১৯। জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে নির্বাচন দেওয়া এবং নির্বাচনে বাঙালীদেরকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন না তোলা। অর্থাৎ বাংলাদেশ সংবিধানের পরিপন্থী পৃথক ভোটার তালিকা তৈয়ার না করা।

২০। পাহাড়ী কোটা বাতিল করে পার্বত্য কোটা চালু করা।

২১। ব্যাংক ঋণ, ব্যাংক ঋণের সুদ, ভ্যাট ও অন্যান্য বিনোদন কর যদি উপজাতিদের জন্য মওকুফ করা হয় তাহলে পার্বত্য বাঙালীদের জন্য ঐ একই ব্যবস্থা সমানভাবে চালু করা।

২২। পার্বত্য চট্টগ্রামে গত দুই যুগ ধরে যে সব হত্যাকান্ড ঘটে গেছে এবং অদ্যাবধিসহ সকল হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু তদন্তের জন্য উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিশন গঠন এবং অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করা।

২৩। উপজাতিদের পক্ষে বিতর্কিত পাহাড়ী জনসংহতি সমিতিকে যদি সরকার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য আলাপে বা বৈঠকে বসার সুযোগ দেয় তাহলে পাশাপাশি পার্বত্য বাঙালীদের পক্ষে পার্বত্য গণ পরিষদকে ঐ একই সুযোগ প্রদান করা।

অতএব, উপরোক্ত বিবরণের প্রেক্ষিতে সদয় পূর্বক উপস্থাপিত দাবিসমূহ পর্যালোচনান্তে বাস্তবায়ন করার জন্য ৫০% শতাংশ পার্বত্য বাঙালী অধিবাসী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

স্বাক্ষর

(জালাল উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী আলমগীর)

চেয়ারম্যান,

পার্বত্য গণ পরিষদ

কেন্দ্রীয় কমিটি

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামে দেশদ্রোহী সন্ত্রাস, মানবাধিকার ও সমঅধিকার লংঘনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকের প্রবন্ধ

স্থান ঃ জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা

তারিখ ঃ ০৪ মে ২০০৪ ইং, রোজ মঙ্গলবার

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিকামী বাঙালী জনগোষ্ঠী এবং সকল উপজাতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাচ্ছে। আপনারা এদেশের সমাজ সচেতন নাগরিক, বুদ্ধিজীবি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বশেষ নাজুক সংকটময় উদ্বেগজনক পরিস্থিতি অবশ্যই অবগত আছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ও পার্বত্য বাঙালী নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য নিরসন করে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ে এবং গ্রহণযোগ্য সমআইন প্রতিষ্ঠা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান দেশদ্রোহী সশস্ত্র সন্ত্রাস, মানবাধিকার ও সমঅধিকার লংঘনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা প্রশ্নে করণীয় বিষয়ে আজকের এই উদ্যোগ গোল টেবিল বৈঠক।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

সবুজ শ্যামল বন বনানী পাহাড় অরণ্য ঘেরা পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একদশমাংশ এলাকা বিস্তৃত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর একটি বিশাল জনপদ। ৫০৯৩ বর্গমাইল এলাকার এই পার্বত্য চট্টগ্রাম মোগল আমলে বঙ্গদেশ। বৃটিশ ভারতের সময় পূর্ববঙ্গ। পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চট্টগ্রামের এক অনাবাদি পার্বত্য অঞ্চল হিসেবে বৃটিশ সরকার ১৮১২ সালের দিকে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় এই পার্বত্য ভূমিকে চট্টগ্রামের অন্ত র্ভূক্ত করে। এ সময় গোটা পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে রিয়াং, কুকী, লাই-জনগোষ্ঠী দূর্গম পাহাড়ে বসবাস করতো, শিকার প্রিয় এসব উপজাতি সম্প্রদায় জীবিকার প্রয়োজনে যাযাবর জীবন যাপন করত। বৃটিশ সরকারের কর্তৃত্ব যখন বিস্তৃত হচ্ছিল, ঠিক তেমনি সময় পার্বত্য অঞ্চলে বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে লাই, কুকী, রিয়াংদের যুদ্ধ বাঁধে। দুধর্ষ এসব উপজাতিদের দমন করতেই বৃটিশ সরকার নেপালী গুর্খা রেজিমেন্ট এবং আসাম রাইফেল্‌স এর যোদ্ধাদের পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে আসে। বৃটিশ বিরোধী তৎপরতা দমন করার কাজে ব্যবহার করে গুর্খা ও অহমিয়াদের। পরে গুর্খা ও অহমিয়ারা পার্বত্য অঞ্চলে থেকে যায়, বসতি স্থাপন করে। বৃটিশ সরকার যখন

www.pathagar.com

করদভূক্ত অঞ্চল বিস্তৃত করার অভিপ্রায়ে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করতে থাকে, তখনি ব্রহ্মদেশ, আরাকান, ত্রিপুরা, তিব্বতসহ বিভিন্ন এলাকায় সংকট দেখা দেয়। চট্টগ্রামের রাউজান, হাটহাজারী, রাঙ্গুনিয়া, সাতকানিয়া, লোহাগড়া, চকরিয়া, ফটিকছড়ি এবং কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চলের বেলুনিয়া, ফেনী, মীরসরাই, চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম প্রভৃতি এলাকার বাঙালী জনগোষ্ঠী সেসময় পার্বত্য এলাকায় ধীরে ধীরে বসতি স্থাপন করে। একটি অনাবাদি পার্বত্য অঞ্চলকে আবাদ ও বাসযোগ্য করে তুলতে বৃটিশ সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছিল।

মোগল আমলে দল উপদলে সংঘাত, মোগল সম্রাটের কর্তৃত্বের বিরোধীতা এবং পরবর্তীতে বৃটিশ সরকারের আচরণে সংক্ষুব্ধ ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক জনগোষ্ঠীর কোন কোন জনগোষ্ঠী হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আরাকান হয়ে, কেউ কেউ ত্রিপুরা, লুসাই হিল, চীন হিল হয়ে এবং ব্রহ্মদেশ থেকে বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করে এবং বৃটিশ সরকারকে কার্পাস মহলে তুলা কর দিয়ে বসতির বৈধতা নেয়। বৃটিশ সরকার ব্রহ্মদেশ, আরাকান, ত্রিপুরা, আসাম, লুসাই হিল এবং তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চল থেকে যেসব চাকমা, মারমা ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন সম্প্রদায় বাংলায় বসতি স্থাপন করেছে, তাদেরকে এক পর্যায়ে চট্টগ্রাম থেকে অনাবাদি পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দেয়। বসতি স্থাপনের সুযোগ পেয়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উপজাতীয় গোত্র প্রধানের নেতৃত্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ দলে দলে পার্বত্য অঞ্চলে আসতে থাকে। বাংলা ভাষাভাষি এবং উপজাতীয় জনগোষ্ঠী যেন সহাবস্থানে বসবাস করতে পারে এ জন্যে ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক জেলার মর্যাদা দিয়ে চট্টগ্রামের সুপারেন্টেন্ডেন্টের কর্তৃত্বে ন্যস্ত করা হয়। চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা সদর। পরে রাঙ্গামাটিতে জেলা সদর স্থানান্তর করা হয়। তখন মূলতঃ রাঙ্গামাটি, চন্দ্রঘোনা, বরকল, বান্দরবান, লামা, রামগড়ই ছিল প্রধান শহর ও মহকুমা শহর। পরবর্তীকালে ১৯৮১ সালে বান্দরবানকে এবং ১৯৮৩ সালে খাগড়াছড়িকে প্রশাসনিক বিন্যাসে জেলায় উন্নীত করা হয়।

বিভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সম্প্রদায় এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সহাবস্থানে পার্বত্য চট্টগ্রাম। এই অঞ্চলে বাঙালিরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। যা পার্বত্য জেলা সমূহের মোট জনসংখ্যার ৫০ ভাগেরও বেশি। বাঙালীসহ এ অঞ্চলে ১১টি উপজাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায় বসবাস করে। এরা হলোঃ বাঙালী, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো তঞ্চঙ্গা, বম, পাংখো, লুসাই, খেয়াং, খুমী, চাক, নেপালী, অহমিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাদের বৈচিত্রপূর্ণ জীবনাচরন, বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি, সহাবস্থান আমাদের জাতীয় সামগ্রিক পরিমন্ডলে অনন্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সহাবস্থান, সম্প্রীতি এবং মানবিক সখ্যতাকে আঘাত করার ষড়যন্ত্র চলছে বহু যুগ ধরে। কতিপয় উগ্রপন্থী সাম্প্রদায়িক উপজাতীয় নেতার বিচ্ছিন্নতাবাদী আচরণও লক্ষনীয়।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিস্থাপনকারী উপজাতীয় নেতৃত্বের রাষ্ট্র বিরোধী আচরণ

১৮৭০ সালে বৃটিশ সরকারের প্রদত্ত সুযোগে আশ্রয়গ্রহণকারী উপজাতীয়দের মধ্য থেকে কতিপয় কুচক্রী নানাভাবে বিরোধীতা শুরু করে। পরে বৃটিশ সরকার তাদের কর্তৃত্ব এবং করদভূক্ততা বজায় রাখার স্বার্থে ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি 'বহির্ভূত এলাকা' চিহ্নিত করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১৯০০ সাল আইন' হিল ট্রাক্স ম্যানুয়েল প্রবর্তন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিস্থাপনকারী বিভিন্ন উপজাতি এবং নেটিভ অর্থাৎ স্থানীয় বাংলাভাষি বাসিন্দাদের জন্যে এই আইন প্রবর্তন করা হয়। ১৯৩৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির সংশোধন হয়। এই আইনের প্রেক্ষিতে পার্বত্য এলাকাকে তিনটি সার্কেল ভূক্ত করে তিনজন রাজা, খাজনা আদায়ের জন্য হেডম্যান, কার্বারী পদের সৃষ্টি করা হয়। ১৯০০ সাল ম্যানুয়েল অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনারই শক্তিশালী পদ। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন এই আইন সমর্থন করে না। মনোনীত প্রতিনিধিই মূলতঃ দায়িত্ব প্রাপ্ত। বর্তমানে একশত বছরের পুরনো হিলট্রাক্স ম্যানুয়েল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। তাছাড়া পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন প্রণয়ন হওয়ায় একাধিক সমপর্যায়ের আইন সমান্তরাল ভাবে চলছে। ফলে প্রায়শই আইনি সংঘর্ষ হচ্ছে। এটা চলতে পারে না।

১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভক্তির সময় রেড ক্লিফ এর রোয়েদাদ অনুযায়ী চট্টগ্রামের অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। সে সময় চাকমা নেতা স্নেহ কুমার দেওয়ান ও যামিনী চাকমার নেতৃত্বে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিদ্রোহ হয়। উপজাতীয় নেতৃত্ব ভারতের সঙ্গে থাকতে লবিং করে। কংগ্রেস নেতা বলভ ভাই প্যাটেল সহ আরো অনেকে বিষয়টি আমলে নিলেও কাজ হয়নি। ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগষ্ট পর্যন্ত এই উগ্রপন্থী উপজাতীয় নেতারা রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় পতাকা উড্ডীন রাখে। সেই থেকে মুখ্যতঃ বিদ্রোহ শুরু। পাকিস্তান সরকার বিদ্রোহ দমনে পদক্ষেপ নিলে স্নেহ কুমার দেওয়ানের নেতৃত্বে একদল উপজাতীয় ভারতের ত্রিপুরা ও লুসাই হিলে আশ্রয় নেয়। ভারতে থেকে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে চক্রান্ত চালিয়ে যেতে থাকে। ষাটের দশকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান করা হলে বিস্তীর্ণ এলাকা পানিমগ্ন হয়ে যায়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। পাহাড়ী বাঙালী অসংখ্য পরিবার ক্ষতির শিকার হয়েছিল। ক্ষতিপূরণও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেসময়ের উপজাতীয় নেতারা অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে ক্ষতিপূরণের টাকা, জমি-প্রকৃত পক্ষে বুঝিয়ে দেয়নি। মানুষের সেই দুঃখবোধ যন্ত্রনাকে পুঁজি করে কতিপয় উপজাতীয় নেতা ১৯৬২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি নামে একটি

www.pathagar.com

সংগঠন গঠন করে। রাজতন্ত্র, সামন্তবাদ বিরোধী এই সংগঠনের তৎপরতা ছিল রাজা প্রথার, হেডম্যান, কার্বারী বিরুদ্ধে। রাঙ্গামাটি ছাড়া অপর দুই জেলায় বিরোধীতার লক্ষণ দেখা যায়নি। যখনি কাপ্তাই হ্রদে ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতি সম্প্রদায় খাগড়াছড়ি জেলায় পুনর্বাসিত হয়, তখন থেকেই স্থানীয় দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধে পার্বত্য উপজাতীয়দের অংশগ্রহণ ছিল নামে মাত্র। তারা মুক্তি যুদ্ধের বিরোধীতা করেছিল। তৎকালীন চাকমা রাজা জনাব ত্রিদিব রায় সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী শেখ মুজিব সরকার রক্ষীবাহিনী পাঠিয়েছিল পার্বত্য অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের দমনে। ১৯৭০ সালে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি জেএসএস নামে আবির্ভাব ঘটায়। সরকার ও রাষ্ট্র বিরোধী তৎপরতা শুরু করলে জেএসএসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। জনসংহতি সমিতি ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান রচনার বিরোধিতা করে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭৩ সালে পাহাড়ী যুব সমাজকে নিয়ে শান্তিবাহিনী নামে সশস্ত্র সংগঠন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ও যুব সমিতি নামে গণলাইন সংগঠন করে অবৈধ সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাঁদাবাজী, সন্ত্রাস, খুন, অপহরণ সে সময় থেকে শুরু হয়। জেএসএস এবং শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য এলাকায় ক্যান্টনমেন্ট স্থাপনসহ গেরিলাযুদ্ধ মোকাবেলার ব্যবস্থা নেয়। সাধারণ জনগণকে সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রতিটি সরকার পর্যায়ক্রমে কাউন্টার ইন্সারজেন্সী কৌশল এবং সাধারণ উপজাতীয় জনগণের মন জয় প্রক্রিয়া চালিয়ে আসছে। উপজাতীয় বিদ্রোহী সশস্ত্র সন্ত্রাসী গেরিলারা ১৯৭৪ সালে তৎকালীন সরকার প্রধান মরহুম শেখ মুজিবর রহমানের রাঙ্গামাটিতে দেয়া ভাষণের একটি অংশ 'আজ থেকে আর কেউ উপজাতি নয়, সবাইকে বাঙালীতে প্রমোশন দিয়ে দিলাম। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের বিচার করা হবে, লারমা তোমার বার্মা যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হবে' কথা গুলোকে ইস্যু ধরে তীব্র সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে।

১৯৭৪ সাল থেকে শুরু করে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সময়ে জনসংহতি সমিতি'র সশস্ত্র গেরিলাদের হাতে প্রায় ৩০ হাজার নিরীহ বাঙালী ও নিরাপত্তা বাহিনী, ১০ হাজারেরও অধিক উপজাতীয় গ্রামবাসী নির্মমভাবে প্রাণ হারিয়েছে। সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতির উপজাতীয় সন্ত্রাসীরা খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, অপহরণ, জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায় এবং ব্যাপক চাঁদাবাজি করে অস্ত্র ক্রয় সহ নানা অপকর্মে লিপ্ত। সন্তু লারমার ইন্ধনে উপজাতীয় সন্ত্রাসীরা বাঙালী অধ্যুষিত এলাকায় হত্যা, লুটপাট, অপহরণ এমনি সরকারি স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘদিন ধরে উগ্র জুম্ম সাম্প্রদায়িক আচরণের কারণে পার্বত্য

www.pathagar.com

অঞ্চলে চরম অস্থিরতা, অনিশ্চয়তাসহ আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসের শিকার হয় তাদের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণকারী হাজার হাজার নিরীহ উপজাতীয় পরিবার। সন্তু লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে। কিন্তু বিচার হয়নি। দেশের স্বাধীনতা পূর্বকালে জনসংহতি সমিতি বাম রাজনৈতিক মতাদর্শে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি গঠন করে। পরে ট্রাইবাল ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন এবং পরে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ গঠন করে। গোপনে এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহ চালিয়ে যেতে জনসংহতি সমিতি বিভিন্ন সংগঠনের জন্ম দেয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে গণহত্যা, স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করা ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে সন্তু লারমা ১৯৭৯ সালে গ্রেফতার হন। জেলে যান। সন্ত্রাসী তৎপরতা পরিহার করে সকল সহযোগীদের সহ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউর রহমান তাঁকে কারামুক্ত করেন। কারামুক্ত হয়ে বেঈমানী করে সন্তু লারমা পুনরায় সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে যায়।

১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত তৎকালীন বিভিন্ন সরকার উপজাতীয় বিদ্রোহীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে নানা ভাবে প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৮০ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই প্রথম সংলাপের মাধামে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সরকারের সময়ে উপজাতীয় বিদ্রোহীদের সঙ্গে বৈঠক ও সংলাপ হয়।

১৯৮৯ সালে পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় নেতৃবৃন্দরা সন্ত্রাসীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে এবং সন্ত্রাস মুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৎকালীন এরশাদ সরকারের আমলে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে পার্বত্য স্থানীয় সরকার সরিষদ ১৯৮৯ আইন (১৯, ২০, ২১) প্রবর্তন করে তিনটি জেলা পরিষদ গঠন করে। জেলা পর্যায়ে সীমিত স্বায়ত্বশাসনের আদলে স্থানীয় সরকার পরিষদ (জেলা পরিষদ) এর কাছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ২২টি বিভাগ ও বিষয় হস্তান্তর করে উপজাতীয়দের হাতে পার্বত্য জেলা সমূহের ব্যাপক প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে। এরপরও বিদ্রোহী সন্ত্রাসীরা প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি অনুযায়ী সন্ত্রাসের পথ পরিহার করেনি। স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থায় (বর্তমানে জেলা পরিষদ) মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালী জনগণকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় সংখ্যানুপাতিক বাঙালী প্রতিনিধিত্ব যেমনি রাখা হয়নি, তেমনি জেলা চেয়ারম্যান পদটি উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত রেখে সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছে। চেয়ারম্যান উপজাতীয় হলে কো চেয়ারম্যান হবে বাঙালী জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সেই দাবিও উপেক্ষা করা হয়েছে। সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে উপজাতীয় এবং পার্বত্য বাঙালীদের মধ্যে বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়েছে।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সাংবিধানিক ভাবে গ্রহণযোগ্য নয় কেন?

পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালী জনগোষ্ঠীসহ অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব একনকি মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে সন্তু লারমা তথা জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি (শান্তিচুক্তি) করে। এই বৈষম্যমূলক চুক্তির বিরুদ্ধে চরম বিরোধিতা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি সম্প্রদায় সহ গোটা পার্বত্য বাঙালী জনগোষ্ঠী চুক্তি বাতিলের দাবি জানায়। তৎকালীন বিরোধী দলের মতামত এবং সংসদে জমা দেয়া প্রায় সাড়ে ৪ হাজার সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে জাতীয় সংসদে মাত্র ১১ মিনিটে আওয়ামী লীগ চুক্তি পাশ করিয়ে নেয়। চুক্তির বিরোধিতা করে ১৯৯৭ সালে জন্ম নেয় সন্তু লারমার হাতে গড়া পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ থেকে সৃষ্টি হয় ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ইউপিডিএফ নামে অপর একটি উপজাতীয় সংগঠন।

যদিও সন্তু লারমা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে গেরিলা সন্ত্রাসের পথ পরিত্যাগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি, সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার এবং অস্ত্রবাজী বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সে লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে কয়েক দফায় আনুষ্ঠানিক অস্ত্র সমর্পন করে তথাকথিত শান্তিবাহিনীর ১৯৬৭ জন সদস্যকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনে। সন্তু লারমার নেতৃত্বে অস্ত্র জমাদানকারী শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার থেকে নগদ ৫০ হাজার টাকা, রেশন ও বিগত দিনের হত্যাসহ বিভিন্ন মামলা থেকে অব্যাহতি পায়। চাকুরি সুবিধাসহ নানাবিধ সুবিধায় পুনর্বাসিত হয়। আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করে জনাব সন্তু লারমাকে সরকার প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে। তার অপর ১৪ জন উপজাতীয় নেতাকে সদস্য মনোনয়ন দিয়ে সরকারি সুযোগ সুবিধা দিয়ে আসছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, জনাব সন্তু লারমা এবং তার দোসররা সরকারের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রের সকল সুযোগ সুবিধাঃ প্রোটকল ও পুলিশ সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করে রাষ্ট্র বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য দিচ্ছেন। সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে মিথ্যে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিয়ে দেশে বিদেশে ষড়হন্ত্র করছেন। তার রেখে আসা সন্ত্রাসীদের দিয়ে আবার গড়ে তুলেছে সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী। গোপন আস্তানা সৃষ্টি করছে।

সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এই অসম পার্বত্য চুক্তির ফলে পার্বত্য অঞ্চলে স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাসরত সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জনগোষ্ঠীসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক উপজাতীয় জনগোষ্ঠী নাগরিক অধিকার, ভোটাধিকার, মানবাধিকার, ভূমি অধিকার, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে।

www.pathagar.com

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রায় ৪ বছর ক্ষমতায় ছিল এবং তাদের সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী পার্বত্য চুক্তির ৯৮% বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে দাবি করেছে। যা বাস্তবেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষতিকর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পার্বত্য বাঙালী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয়রা। বর্তমান জোট সরকার বিরোধী দলে থাকাকালীন ঘোষণা অনুযায়ী পার্বত্য চুক্তি বাতিল কিংবা সংশোধনের উদ্যোগে গ্রহণ না করে বরং আন্তরিকতার সঙ্গে চুক্তি পর্যবেক্ষণ করছে। বৈষম্যমূলক পার্বত্য চুক্তি সরকার বাস্তবায়ন করলেও চুক্তির ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সন্তু লারমা নন ইস্যুতে আন্দোলনের নামে বিশৃংখলার সৃষ্টি করছে। চুক্তির বিরোধীতাকারীদের হত্যা, অপহরণ ও নির্যাতন করছে। হরতাল অবরোধ জঙ্গি মিছিল ও অস্ত্রের মহড়া তথা নাশকতামূলক তৎপরতা চালাচ্ছে। সন্তু লারমা ও তার দোসররা কোন কোন বিরোধীদল ও প্রতিবেশী একটি দেশের ইন্ধনে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য আন্দোলন সংগ্রামের নামে পাহাড়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশী বিদেশী বিভিন্ন দেশ, সংস্থা ও দাতাগোষ্ঠীকে বিভ্রান্তিমূলক মিথ্যে তথ্য দিয়ে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি বিনষ্ট করছে। তারা বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন আবাস ভূমি বা জুম্ম ল্যান্ড গঠনের লক্ষ্যে চক্রান্তে পার্বত্য এলাকা অরক্ষিত করার জন্য সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি তুলছে এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে। শুধু এখানেই শেষ নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের বিতাড়িত করার প্রকাশ্য গোপন মিশন নিয়ে কাজ করছে।

পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন অনুযায়ী পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহে অন্তবর্তীকালীন পরিষদ গঠনের বিধান নেই। ১৯৮৯ সালের ২৫ জুন জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর ১২ বছর ধরে দফায় দফায় পরিষদের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। যে কারণে জেলা পরিষদগুলো জন প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে আজ জবাবদিহীতা হারাচ্ছে। পার্বত্য জনগণের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠার স্বার্থে জেলা•পরিষদ গুলোর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দ্রুত নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন।

পাশাপাশি পার্বত্য চুক্তির আলোকে ১৯৯৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ৫ বছর মেয়াদ ২০০৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে যায়। জনসংহতি সমিতি সরিষদ সদস্য মনোনয়ন নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করে বিরোধিতা করে। পরে ১৯৯৯ সালের ১২ ই মে দায়িত্বভার গ্রহণ করে। আগামী ২০০৪ সালের ১২ই মে অন্তবর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদের মেয়াদ শেষ হবে। পার্বত্য জনগণের মতামতের প্রতিফলন সুস্পষ্ট করার স্বার্থে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটের মাধ্যমে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের জন্যে

www.pathagar.com

দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠান আইন সংগত। নির্বাচনের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হলে জবাবদিহীতা, জনসমর্থন ও গণ ভিত্তি শক্তিশালী হবে। জনকল্যানে প্রতিনিধিদের দায়দায়িত্ব থাকবে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বিগত ৫ বছর ধরে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত বাৎসরিক বরাদ্দ জন কল্যাণে তিন পার্বত্য জেলায় কি ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদন করেছে এর খতিয়ান খতিয়ে দেখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলে দেশদ্রোহী সন্ত্রাস দমনে যৌথ অপারেশন পরিচালনা প্রয়োজন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭ এবং জনসংহতি সমিতি সভাপতি সন্তু লারমাকে প্রত্যাখান ও তার কর্তৃত্ব, নেতৃত্বের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ জনগণ অনাস্থা প্রকাশ করে বিগত ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোটের প্রার্থীদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা নির্বাচন বর্জনের ডাক দিলেও পার্বত্যবাসী সন্তু লারমার নির্বাচন বর্জনের ডাক প্রত্যাখান করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। বিগত সংসদ নির্বাচনে বিএনপিসহ চারদলীয় জোট, আওয়ামী লীগ, এবং আঞ্চলিক উপজাতীয় সংগঠন ইউপিডিএফ সহ স্বতন্ত্র অনেক প্রার্থী অংশ নেয়। সচেতন পার্বত্য জনগণ যারা ভোটার, তারা সন্তু লারমা ও জেএসএস এর প্রতি যে তাদের সমর্থন নেই, সন্তু লারমা'র কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে।

২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চুক্তি ও সন্তু লারমাকে প্রত্যাখান করে পার্বত্য জনগণ জাতীয় সংসদের তিনটি আসনের দু'টি আসনে চারদলীয় জোটের দুইজন প্রার্থী যথাক্রমে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সংসদ সদস্য হিসেবে জনাব ওয়াদুদ ভূঁইয়া এবং রাঙ্গামাটি জেলায় জনাব মনি স্বপন দেওয়ানকে নির্বাচিত করে। অপর আসন বান্দরবানে আওয়ামী লীগের বীর বাহাদুর নির্বাচিত হন। খাগড়াছড়িতে আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী কল্প রঞ্জন চাকমা বিপুল ভোটে পরাজিত হন। রাঙ্গামাটিতে পরাজিত হন সাবেক সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার, ইউপিডিএফ নেতা প্রসিত বিকাশ খীসাও ভোট পেয়েছেন। ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কাছে পার্বত্য চুক্তি ও সন্তু লারমার গ্রহনযোগ্যতা নেই। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীভূক্ত জেএসএস সদস্যদের মাঝেই সন্তু লারমার কর্তৃত্ব রয়েছে।

পার্বত্য শান্তিকামী জনগণ পার্বত্য চুক্তি ও সন্তু লারমার বিরোধীতা করে সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোটকে সমর্থন দেয়ার মূখ্যতঃ কারণ হল নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী সরকার পার্বত্য চুক্তি বাতিল কিংবা সংশোধন পূর্বক একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নেবে। ২০০২ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত সময়ে প্রকৃত অর্থে পার্বত্য চট্টগ্রামে

www.pathagar.com

স্থিতিশীল স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী এবং প্রতিপক্ষ ইউপিডিএফ'র সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনীর মধ্যে হত্যা, খুন নৃশংসতা চলছে। সাধারন মানুষকে অপহরণ জিম্মি করে সশস্ত্র উপজাতীয়রা স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করছে। বর্তমান করকারের সময়ে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ বিরাজমান রয়েছে। এই অবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র করছে সশস্ত্র উপজাতীয় সন্ত্রাসীরা। এ কারণে পার্বত্য উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারসহ অস্ত্র উদ্ধারের মাধ্যমে শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে পার্বত্য এলাকায় যৌথ-অপারেশন পরিচালনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পার্বত্য চুক্তি এবং বৈষম্যমূলক প্রসঙ্গ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মূলতঃ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ এর বিভিন্ন ধারা সমূহ পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন, অবলোপন করার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা (বাঙালী) বলতে "যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে" বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। চুক্তির ব্যাখ্যাদাতারা উদ্ধৃত করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালী যিনি দীর্ঘকাল বংশানুক্রমিক বসবাস করছেন এই শর্ত পূরণ না হলে তিনি পার্বত্য এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হবেন না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে একইশর্তও ধারা পার্বত্য চুক্তিতে রাখা হয়নি। একজন ভূমিহীন নাগরিক তিনি যদি সংবিধানের বিধিমত বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হতে পারেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালী স্থায়ী বাসিন্দা হবেন না কেন? প্রশ্ন জাগে তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম কি দেশের সংবিধান বহির্ভূত এলাকা নাকি ভিন্ন কোন দেশ?

পার্বত্য চুক্তিতে বাঙালীদের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হলে বৈধ জমি থাকতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় বসবাস করতে হবে। কিন্তু কোন উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে বৈধ জমির মালিকানা কিংবা সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় বসবাসের প্রয়োজন নেই, এতে করে পার্শ্ববর্তী দেশের উপজাতীয় সগোত্রীয়রা সহজে যেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা হতে পারে এখানে গোপন ষড়যন্ত্র কিনা খতিয়ে দেখা দরকার। অরুনাচল, ত্রিপুরা, মিজোরামে যেসব উপজাতীয় নাগরিকত্ব পায়নি, তাদেরকে আমাদের দেশে গোপনে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু কিংবা কাপ্তাই ডেমে ক্ষতিগ্রস্ত পুনর্বাসনের নামে অনুপ্রবেশের চক্রান্ত কিনা?

অউপজাতীয় (বাঙালী) দের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞা উপরোক্ত আলোচ্য বিষয় যদি হয় অবশ্যই পার্বত্য উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

প্রাসঙ্গিক কারণে উল্লেখ্য সার্কেল চীফ কিংবা হেডম্যানরা যেহেতু প্রত্যেকেই

www.pathagar.com

উপজাতীয় সে কারণে তারা বাঙালীদের সার্টিফিকেট দিতে অনুৎসাহী এবং অনীহা প্রকাশ করেন। প্রকারান্তরে ভিনদেশী কোন উপজাতীয়কে সার্টিফিকেট দিয়ে আমাদের দেশের নাগরিক করা হচ্ছে কিনা যাচাই করার সুযোগ নেই। তাছাড়া এই প্রক্রিয়ায় গোপনে কাজ চলছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দা সনদ দেয়ার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের কাছে ক্ষমতা দেয়া রাষ্ট্রের জন্য যুক্তিযুক্ত হবে।

দেশের সাংবিধানিক বিধি অনুযায়ী ভোটার হবার যোগ্যতার ক্ষেত্রে শর্ত হলোঃ যদি তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন, তার বয়স ১৮ বছরের কম না হয়, কোন আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত না হয়ে থাকে তবে তিনি দেশের ভোটার হবার অধিকার রাখেন। অথচ পার্বত্য চুক্তির ১৭ নং ধারা অনুযায়ী পার্বত্য এলাকায় ভোটার হবার যোগ্যতার ক্ষেত্রে সংবিধানে বর্ণিত উল্লেখিত শর্তগুলোর বাইরে অতিরিক্ত শর্ত হিসেবে পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পার্বত্য বাঙালীদের জন্য বৈধ ভূমির মালিক এবং সাধারণতঃ পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় বসবাস করে তারাই স্থায়ী বাসিন্দার যোগ্যতা পাবে। দেশের অপরাপর অন্য জেলার ক্ষেত্রে এমন ধারা প্রযোজ্য নয়। যা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ৬৪ ধারা সংশোধন করে পার্বত্য চুক্তি ১৯৯৭ এর ২৬ ধারায় (ক) তে সংযোজন হয়েছে "পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ কোন জায়গা জমি জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যাতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবেনা"। (খ) "পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যাতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবেনা"।

এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে-পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা কি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেই? যে কোন দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির গতিধারায় মানুষ ভূমি বন্দোবস্ত, ক্রয়-বিক্রয় কিংবা ইজারা নিয়ে থাকে। কেননা রাষ্ট্রই মুখ্যতঃ ভূমির মালিক। পার্বত্য চুক্তির ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন নয় কি? সংবিধান এই ধারা সমর্থন করে না। চুক্তির এই ধারার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ নাম খারিজ, বন্দোবস্ত পাবার অধিকার থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

পার্বত্য চুক্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ প্রসঙ্গে ১৪ নং ধারার (ঘ) উপধারার বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে পার্বত্য পরিস্থিতির কারণে যারা ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসন করা, ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করা,

www.pathagar.com

যেসব উপজাতীয় শরণার্থী সরকারের সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে অথচ বিবদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ ব্যবহার করতে পারেনি তাদের ঋণ মওকুফ করা।

উপজাতীয়দের জন্য সরকারি চাকুরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখা, জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা থেকে ঋণ নিয়েছে তা মওকুফ করা, জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ প্রদান করা, সরকারি আধা সরকারি পরিষদ, স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, জনসংহতি সমিতির গেরিলারা বিগত ত্রিশ বছর পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসের মাধ্যমে পাহাড়ী বাঙালী শিশু, নারী, পুরুষ নির্বিচারে হত্যা করেছে। যারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে সাধারণ পার্বত্যবাসীর জীবন বিষময় করে তুলছে। সেই উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র হামলায় অপনজন হারিয়ে জায়গা জমি ছেড়ে শান্তিপ্রিয় নিরস্ত্র বাঙালীরা গুচ্ছগ্রামে, চাকমারা শান্তি গ্রাম আর ত্রিপুরা ও মারমারা বড় গ্রাম নামে ক্লাষ্টার ভিলেজে মানবেতর জীবন যাপন করছে। অসহায় পাহাড়ী বাঙালী মানুষ আজো যাদের হিংস্র হামলার আশংকায় বাইরে যেতে পারে না। হাজার হাজার পাহাড়ী বাঙালী যারা স্বজন হারিয়ে, ঋণগ্রস্থ, অর্ধাহারে অনাহারে জীবনযাপন করছে। শুধু কি জনসংহতি সমিতির খুনী সদস্যদের জন্যই এই পুরস্কার? যারা শান্তিবাহিনী কিংবা জনসংহতি সমিতি করেনি, সন্ত্রাসের পথ ধরেনি, তারা কি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থেকে অন্যায় করেছে? বাঙালী বাসিন্দা যারা নিজ জমি, ফসল, বসতভিটা ছেড়ে গুচ্ছ গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে তারাও তো ঋণ নিয়ে কাজে লাগাতে পারেনি। উপজাতীয়, বাঙালী যারাই ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেককে তালিকা প্রণয়ন করে সম দৃষ্টিতে দেখা সমীচীন হবে। না হয় সন্ত্রাসীরা পুরস্কৃত হলে সাধারণ মানুষের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

পার্বত্য চুক্তির মুখবন্ধে বলা হয়েছে- "বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সমঅধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারিখন্ড সংম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন"।

www.pathagar.com

চুক্তির মুখবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল নাগরিকদের সংবিধানের আওতায় প্রাপ্ত সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান ও সকল প্রকার অধিকার সংরক্ষনের কথা বলা হলেও পার্বত্য চুক্তির ধারা উপধারায় সম্পূর্ণ উল্টো। সংবিধান বিরোধী অনেক মারাত্মক প্রসঙ্গের অবতারনা হয়েছে। যা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

যে কোন কারো মনে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে আদতে জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল মানুষের অধিকার সংরক্ষণের ম্যান্ডেট পেয়েছে কি? পাহাড়ে মানুষ জাতীয় রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের সমর্থনের বাইরেও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের সমর্থক। অনেকে কোন দলভূক্ত নয়। সেক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতি নেতা সন্তু লারমা কি পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসহ বৃহত্তর উপজাতি সম্প্রদায় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙালী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব সন্তু লারমা করেন না। কোন সম্প্রদায়ই তাকে চুক্তি সম্পাদনের ম্যান্ডেট দেয়নি। তিনি উপজাতীয়দের একটি সশস্ত্র গ্রুপের নেতা মাত্র। তাছাড়া চুক্তি সম্পাদনের সময় পার্বত্য অঞ্চলের কোন বাঙালী প্রতিনিধি রাখা হয়নি। সন্তু লারমা ও বিগত সরকার পার্বত্য বাঙালীদের স্বার্থের পরিপন্থি বৈষম্যমূলক চুক্তি করেছে। সংবিধানে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করার কথা থাকলেও পার্বত্য চুক্তিতে চাকুরি, শিক্ষা, ব্যবসা, আয়কর, ঋণসুবিধা, ভূমি অধিকার, নাগরিকত্ব, ভোটাধিকার প্রভৃতি প্রশ্নে একটি গোষ্ঠীভূক্ত উপজাতীয়দের একতরফা সুযোগ সুবিধার কথা উল্লেখ রয়েছে। পার্বত্য চুক্তির কোথাও পার্বত্য বাঙালীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার কথা উল্লেখ নেই। পার্বত্য চুক্তি বাংলাদেশের সংবিধানের এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র চেতনার পরিপন্থি। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ সমূহকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তাতে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ সমূহকে পৃথক আর একটি সরকার বলা যায়।

বাংলাদেশের সংবিধানে অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাষ্ট্র কর্তৃক যে সুযোগ সুবিধা দেয়ার কথা উল্লেখ আছে, তা বাঙালীদের বঞ্চিত করে শুধুমাত্র উপজাতীয়দের প্রাপ্য নয়। পার্বত্য অঞ্চলে অনগ্রসর জাতি হিসেবে বাঙালীরাই লক্ষ্যণীয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দাবি ও বক্তব্য ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে ঃ

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নিরাপত্তা বাহিনীকে সরিয়ে আনা। এ দাবির উদ্দেশ্য নিরাপত্তা বাহিনী বিহীন পার্বত্য চট্টগ্রামকে অরক্ষিত করে সন্তু লারমার সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দ্বারা দখল করে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।

www.pathagar.com

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ৭ লক্ষ পার্বত্যবাসী বাঙালীকে উৎখাত করা। এ দাবির উদ্দেশ্য হলো- জনবহুল বাংলাদেশের এক দশমাংশকে বাঙালীবিহীন উপজাতীয় এলাকায় পরিনত করে সেখানে তথাকথিত জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করা বা আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোটার তালিকা থেকে পার্বত্য বাঙালীদেরকে বাদ দেয়া। এ দাবির উদ্দেশ্য- পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিতব্য সকল নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে পার্বত্য বাঙালীদেরকে এবং তাদের জনপ্রতিনিধিত্ব কৌশলে বাদ রাখা এবং পার্বত্যবাসী বাঙালীদের অস্তিত্ব ও নাগরিক অধিকারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্বীকার করা।

৪। পার্বত্য চুক্তির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের জন্য মন্ত্রী, উপমন্ত্রী পদমর্যাদাসহ শীর্ষ স্থানীয় ৯টি পদ সংরক্ষিত করা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান ১জন, তিন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ৩জন, তিনজন সার্কেল চীফ, শরণার্থী পূণর্বাসন বিষয়ক টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান ১জন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী ১জন সর্বমোট ৯টি পদই উপজাতীয় সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত। অথচ পার্বত্য জনসংখ্যার অর্ধেক বাঙালী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের কিছু নেই। শুধুমাত্র পাহাড়ী বাঙালী উভয়ের জন্য একমাত্র সংসদ সদস্যকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রশাসনিক ভারসাম্যের স্বার্থে বাঙালীদের জন্য প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর আইনী সুযোগ দরকার।

৫। পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর নির্যাতনের শিকার লক্ষ লক্ষ পার্বত্য বাঙালীদেরকে বন্দোবস্তি প্রাপ্ত নিজ ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে গুচ্ছগ্রামে বন্দী করা হয়েছে, সে সকল বস্তিবাসী সর্বহারা পার্বত্য বাঙালীদেরকে পূণর্বাসনের ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতি বাঁধ সাধছে।

৬। পার্বত্য বাঙালীদেরকে বন্দোবস্তি দেয়া সকল ভূমি বন্দোবস্তি বাতিল করার জন্য আদেশ জারি করা হয়েছে। সন্তু লারমা বাঙালীদের কাছ থেকে খাজনা কর না নেয়ার জন্য হেডম্যানদের নির্দেশ দিয়েছেন। চাকুরির ক্ষেত্রে বাঙালীদের অন্তর্ভূক্তিকে বাধা দেয়া হচ্ছে, এমনকি ইউএনডিপি কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কোন সুফল যেন শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠী ছাড়া অন্য কেউ তথা পার্বত্য বাঙালী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি না পায় সে ব্যাপারে জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ইউএনডিপিকে চাপ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া সকল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক একং সামাজিক অবস্থান থেকে পার্বত্যবাসী বাঙালীদেরকে বঞ্চিত করে তাদেরকে নিজ দেশে শরণার্থী,

www.pathagar.com

অনুপ্রবেশকারী, সেটেলার ইত্যাদি অন্যায় ও ষড়যন্ত্রমূলক অভিধায় অভিষিক্ত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সমূলে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করছে -জনসংহতি সমিতি এবং চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ।

৭। গত ২৭শে এপ্রিল ২০০৪ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ পাঠে জানা যায়, খাগড়াছড়ির মাটিরাঙা থানার গুইমারা এলাকায় জনসংহতি সমিতি এবং ইউপিডিএফ উভয় পক্ষ কর্তৃক এক অপরের ৫ সদস্যকে অপহরণের পর বন্দিবিনিময় করেছে এবং অপহৃত ১০ জন লোককে মুক্তি দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তি পরবর্তীতে সংঘটিত ৫ শতাধিক হত্যা, ৭ শতাধিক অপহরণের ঘটনা এবং সর্বশেষ সংঘটিত জেএসএস ও ইউপিডিএফ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র সন্ত্রাস, দেশদ্রোহীতা মানুষের জীবন ও সম্পদকে জিম্মি করে রেখেছে। আমরা সন্তু লারমাসহ সন্ত্রাসী গ্রুপকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, পার্বত্য চুক্তির ফলে তিনি শুধুমাত্র চুক্তি পূর্ব সকল হত্যা অপহরণের দায় থেকে সাধারণ ক্ষমা পেয়েছেন, কিন্তু চুক্তিতে এমন গ্যারান্টি দেয়া হয়নি যে চুক্তির পরও তিনি যত হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজি এবং দেশদ্রোহী সন্ত্রাস করবেন-তার সব দায় থেকে মাফ পেয়ে যাবেন। সুতরাং পার্বত্য চুক্তিকে লাগামহীন হত্যা, অপহরণ ও সন্ত্রাস পরিচালনার লাইসেন্স মনে করলে সন্তু লারমা ভুল করবেন।

৮। জনসংহতি সমিতি এবং ইউপিডিএফ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন পাহাড়ে গড়ে তোলা হয়েছে একাধিক সশস্ত্র ক্যাম্প। পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের শক্তি প্রদর্শনের মহড়া। এমন কোন ব্যবসায়ী, ট্রাক, বাসের চালক, মালিক, ঠিকাদার, সাধারণ গ্রামবাসী নেই যার কাছ থেকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে উক্ত সন্ত্রাসীরা চাঁদা আদায় করছেনা। হত্যা, অপহরণ, গুম, ছিনতাই, চাঁদাবাজি এবং অগ্নিসংযোগ এখন অতীতের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাত্যহিক ঘটনা। আপনারা দৈনিক খবরের কাগজগুলোতেই তার কিছু কিছু সংবাদ দেখে থাকবেন।

৯। নিরাপত্তা বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। ত্যাগ তিতিক্ষা শিকার করেও সন্ত্রাস মোকাবেলায় কাজ করছে। এর বাইরেও পার্বত্য অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। অথচ জনসংহতি সমিতি ও ইউপিডিএফ দেশ প্রেমিক নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়াচ্ছে, দেশে বিদেশে মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে। বাংলাদেশের সুনাম ধ্বংসের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। জনসংহতি সমিতি ও ইউপিডিএফ সহ সকল

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রকারীদের মোকাবেলা করার জন্য জাতিকে এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি।

১০। পার্বত্য চুক্তির ফলে পার্বত্যবাসী বাঙালীরা জমিজমা ক্রয় ও বন্দোবস্তি নেয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত, পার্বত্যবাসী হিসেবে সনদপত্র প্রাপ্তির জন্য তারা উপজাতীয় হেডম্যান ও সার্কেল চীফের করুণার উপর নির্ভরশীল। জেলা পরিষদ ও রিজিয়নাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের পদে বাঙালীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেনা, অর্থাৎ পার্বত্য বাঙালীরা স্বাধীন বাংলাদেশের এক-দশমাংশ এলাকায় পরাধীন ও বহিরাগত উপজাতিদের শাসনাধীনে নিপতিত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম আজও ভিনদেশ থেকে আগত উপজাতীয়দের শাসনাধীনে ন্যস্ত। নিরাপত্তা এবং নাগরিক ও মানবাধিকারহীন পার্বত্য বাঙালীরা আজ নিজ দেশে পুর্ণ নাগরিক অধিকার আদায়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এবং ঐক্যবদ্ধ। সংবিধান ও দেশের অখন্ডতা বিরোধী পার্বত্য চুক্তিকে বাতিল করে পার্বত্য চট্টগ্রামে দেশের সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা না হলে পার্বত্য বাঙালীরা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে যে কোন কর্মপন্থা নিতে বাধ্য হবে। প্রকৃত পক্ষে জনসংহতি সমিতি এবং ইউপিডিএফ এর সাম্প্রদায়িকতা ও সশস্ত্র সন্ত্রাসের ফলেই শান্তিপ্রিয় বাঙালী ও সাধারণ উপজাতীয়রা বাধ্য হয়েছে ঐক্যবদ্ধ হতে। দেশবিরোধী সকল কর্মপন্থাই আমাদেরকে বাধ্য করবে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে। বাংলাদেশের মাটিতে বিদেশী অনুচরদের সকল ষড়যন্ত্র এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড উৎখাত করাই দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

১১। আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসমর্থন বিহীন একজন অনির্বাচিত ব্যক্তির হাতে পার্বত্য ১৪ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে যা অন্যায্য, অযৌক্তিক এবং অসাংবিধানিক। পার্বত্য জনসংখ্যার ৮০ ভাগ মানুষই সন্তু লারমার সমর্থন নয়। জনসংহতি সমিতি এবং ইউপিডিএফ গোটা পার্বত্য এলাকাকে আধিপত্য বিস্তারের দখলভূক্ত করে রেখেছে। এছাড়া গত সংসদ নির্বাচনে সন্তু লারমার ঘোষিত নির্বাচন বয়কটের ডাক অগ্রাহ্য করে লক্ষ লক্ষ উপজাতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সন্তু লারমার প্রতি তাদের অনাস্থা প্রকাশ করেছে। সুতরাং জনসমর্থনের কোন মানদন্ডেই সন্তু লারমাকে সমগ্র পার্বত্যবাসী বাঙালী উপজাতি বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে কিছুতেই মেনে নেয়া যায়না। আমরা তাই সশস্ত্র সন্ত্রাস, দেশদ্রোহী এবং গণহত্যাকারী, বিদেশী এজেন্ট সন্তু লারমার অবৈধ প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাহার চাই। একই সাথে নির্বাচিত এবং অসম্প্রদায়িক কোন ব্যক্তির হাতে রিজিয়নাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শীপ হস্তান্তরের জোর দাবি জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

১২। উপরোক্ত করুণ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবং পার্বত্য চুক্তির ফলে সর্বক্ষেত্রে অধিকার বঞ্চিত হয়ে আমরা পার্বত্যবাসী সংগঠন করেছি 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন' নামক অধিকার আদায়ের এবং দেশের অখন্ডতা রক্ষার এক আপোষহীন সংগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামে গত তিন দশক ধরে উপজাতীয় সশস্ত্র সন্ত্রাস তথা হত্যা-অপহরণ ও চাঁদাবাজির শিকার এবং সর্বক্ষেত্রে অধিকার বঞ্চিত পার্বত্যবাসীর করুণ আর্তি অপনাদের মতো দেশপ্রেমি ও মানবাধিকার প্রেমী চিন্তাশীলদের দৃষ্টি আকর্ষন করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আর এ অবস্থা থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে সবাই এগিয়ে আসবেন এটা আমাদের আবেদন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিচরন ক্ষেত্রে পরিনত করতে চাচ্ছে জেএসএস, ইউপিডিএফ। নিরাপত্তা বাহিনীর অনেক সদস্যের মূল্যবান জীবনসহ অনেক অসহায় বাঙালী পাহাড়ীর প্রাণ তথাকথিত শান্তিবাহিনী নির্মমভাবে কেড়ে নিয়েছে এবং এখনো নিচ্ছে। শান্তিবাহিনীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার পরিজন মানবেতর জীবনযাপন করছে। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি কেউই নজর দেয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্তির সকল শিকড়ের মূল্যোৎপাটন করে একটি অখন্ড বাংলাদেশের সীমানা নিশ্চিত করাই দেশ প্রেমী সরকার ও দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের কর্তব্য বলে আমরা মনে করছি। পার্বত্য জনগন সকল বৈষম্যমূলক আচরণ হতে মুক্তি চায়, সাংবিধানিক অধিকার চায়। সমঅধিকারের গ্যারান্টি চায়। একই প্রাকৃতিক পরিবেশে, আলো বাতাসে বসবাসকারী সকল পাবর্তবাসীর সমউন্নয়ন, সমস্বীকৃতি ও সমঅধিকারের নিশ্চয়তা চায়।

www.pathagar.com

সন্ত্রাসীদের চাঁদা আদায়ের রশিদ/চিঠি

অধিকার আদায়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন

80401

টোকেন নং .... লাইসেন্স নং ....

নাম :

ঠিকানা :

চাঁদার বিবরণ :

চাঁদার পরিমাণ :

কথায় :

দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক/বাৎসরিক/এককালীন

অনুমোদিত আদায়কারী

অধিকার আদায়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন

টোকেন নং 80406 লাইসেন্স নং ....

নাম :

ঠিকানা :

চাঁদার বিবরণ :

চাঁদার পরিমাণ :

কথায় :

দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক/বাৎসরিক/এককালীন

অনুমোদিত আদায়কারী

অধিকার আদায়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন

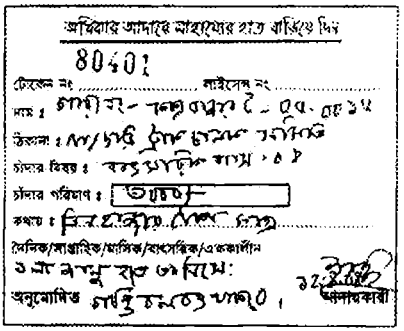

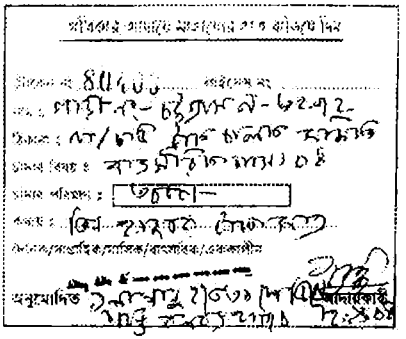

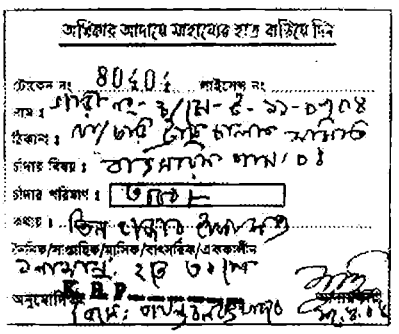

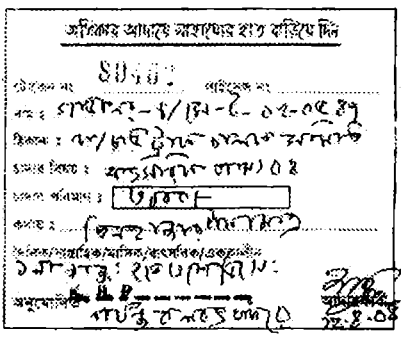

টোকেন নং 80404 লাইসেন্স নং ....

নাম :

ঠিকানা :

চাঁদার বিবরণ :

চাঁদার পরিমাণ :

কথায় :

দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক/বাৎসরিক/এককালীন

অনুমোদিত আদায়কারী

অধিকার আদায়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন

টোকেন নং 80402 লাইসেন্স নং ....

নাম :

ঠিকানা :

চাঁদার বিবরণ :

চাঁদার পরিমাণ :

কথায় :

দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক/বাৎসরিক/এককালীন

অনুমোদিত আদায়কারী

www.pathagar.com

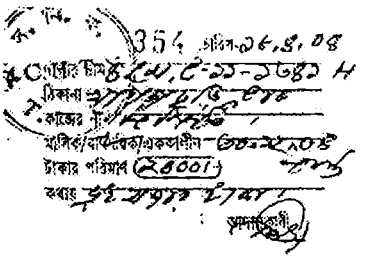

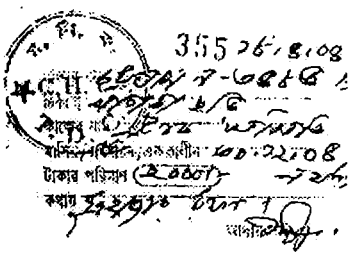

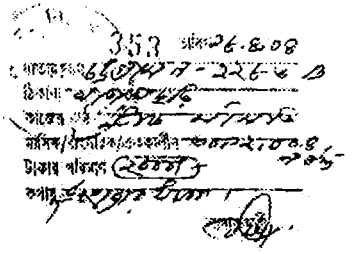

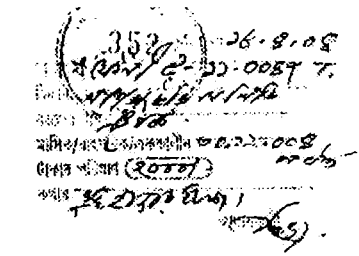

জেএসএস এর চাঁদা আদায়ের রশিদ।

www.pathagar.com

[illegible] তাং- [illegible] ইং

প্রতি/ [illegible]

[illegible]

মহোদয়,

[illegible]

উপজাতি সন্ত্রাসী দলগুলো কর্তৃক চাঁদা আদায়ের/ভয় প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন ব্যবসা/প্রতিষ্ঠানের নিকট দেয়া চিঠির অনুলিপি ঃ

[illegible]

তাং- [illegible] ইং

প্রতি/ [illegible]

[illegible]

মহোদয়,

[illegible]

[illegible]

উপজাতি সন্ত্রাসী দলগুলো কর্তৃক চাঁদা আদায়ের/ভয় প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন ব্যবসা/প্রতিষ্ঠানের নিকট দেয়া চিঠির অনুলিপি ঃ

www.pathagar.com

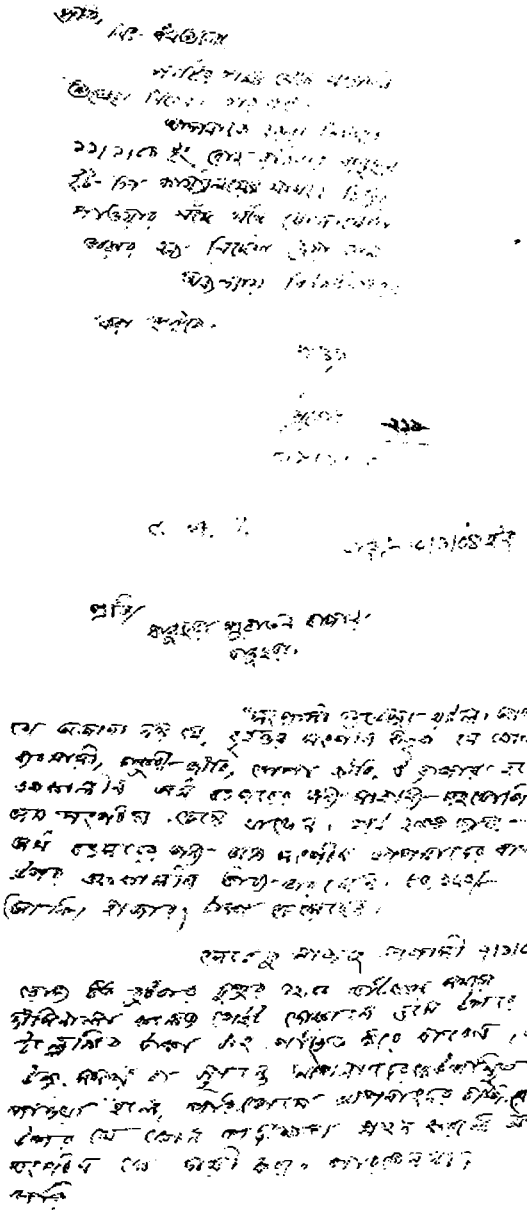

উপজাতি সন্ত্রাসী দলগুলো কর্তৃক চাঁদা আদায়ের/ভয় প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন ব্যবসা/প্রতিষ্ঠানের নিকট দেয়া চিঠির অনুলিপি ।

www.pathagar.com

সন্ত্রাসীদের দ্বারা হত্যা/অপহরণের বিবরণ

বছর	নিহত		আহত		কিডন্যাপড/নিখোঁজ	
	বাঙ্গালী	উপজাতি	বাঙ্গালী	উপজাতি	বাঙ্গালী	উপজাতি
১৯৮০	১৮৭	০৮	১৭৫	০৫	১৫৭	০৭
১৯৮১	১৪২	০২	২২৭	০২	৩৩	১২
১৯৮২	১৬	০৭	২২০	-	১৫১	১৮
১৯৮৩	১০৮	-	১০৮	০৩	১১৫	০১
১৯৮৪	২০৮	০৭	১৪৫	০৮	১১৮	২৭
১৯৮৫	২১	১৪	১১৯	০৮	১২৫	১৯
১৯৮৬	৩৪৮	৩৩	২১৮	১৬	১৩৩	০৪
১৯৮৭	২২৮	১৯	১৬৭	০৯	১১৭	০৮
১৯৮৮	১৭২	১৬	১৬৫	১৪	২৩১	২৭
১৯৮৯	৫৭	৪৭	২৩৮	৫৭	৬৭	২৮
১৯৯০	৮৫	২০	১৩৮	১২	৫০	২২
১৯৯১	৭২	১৫	১৩৭	১৮	৩২	৩৬
১৯৯২	-	৪৩	১২৮	২৪	২২	১৯
১৯৯৩	২০	-	১৮	-	১২	২৮
১৯৯৪	১৬	-	১৫	-	১১	০৩
১৯৯৫	১১	০১	১০	০৫	০৯	০২
মোট	১৬৯১	২৩২	২২২৮	১৮১	১৩৮৩	২৬১

www.pathagar.com

পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর সন্ত্রাসী কর্তৃক হত্যা ও অপহরণ এর বিবরণ

ক্রমিক নং	সাল	হত্যা	আহত	অপহরণ
১।	১৯৯৭	-	০৯	-
২।	১৯৯৮	০১	১২	১১
৩।	১৯৯৯	০২	০৩	১২
৪।	২০০০	০৯	১৫	১০
৫।	২০০১	৬৩	১০৭	৮২
৬।	২০০২	৬৫	৭২	১৯৪
৭।	২০০৩	৩৮	৫১	১০৩
৮।	২০০৪	১০	৪২	৮৫
মোট ঃ		১৮৮	৩১১	৪৯৭

সুত্র ঃ নিরাপত্তা বাহিনী

www.pathagar.com

পার্বত্য চুক্তির পর নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক সন্ত্রাসীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সরঞ্জামাদি এর পরিসংখ্যান

ক্রঃনং	সাল	এলএমজি	এসএমজি	একে-৪৭	আর এল	এসএমসি	চাইনিজ রাইফেল	৩০৩ রাইফেল	এম-১৬ রাইফেল	অন্যান্য অস্ত্র	গোলাবারুদ	ওয়াকি টকি সেট
১।	১৯৯৭	-	-	-	-	-	-	-	-	০২	০১	-
২।	১৯৯৮	-	০২	-	-	০২	০২	০১	-	৪৫	২২৩৪ (১টি গ্রেনেডসহ)	-
৩।	১৯৯৯	-	-	-	-	-	-	-	-	৭৬	৪৭৬৫	-
৪।	২০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২৩০	১০৫৯	০৩
৫।	২০০১	-	০১	০১	-	০১	-	০৩	-	১৬৯	১৩৮৬	-
৬।	২০০২	-	-	-	-	-	-	০২	-	৯১	১০৭২ (৪টি গ্রেনেডসহ)	-
৭।	২০০৩	০২	০১	০৬	-	০১	০৩	০৭	০১	২২৮	৮৭৩৮ (২৮৪ টি গ্রেনেডসহ)	০৬
৮।	২০০৪	০১	০৩	-	০৩	০৪	০২	০৩	০৩	২০৮	১৯৩ (৪টি গ্রেনেডসহ)	১৩
মোটঃ		০৩	০৭	০৭	০৩	০৮	০৭	১৬	০৪	১০৪৯	১৯৪৪৮ (২৯৩টি গ্রেনেড)	২২

সুত্র ঃ নিরাপত্তা বাহিনী।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

(১) Bangladesh District Gazetteers, Chittagong Hill Tracts, GOB, Ministry of Cabinet Affairs, Estb Div- 1971.

(২) প্রদীপ্ত খীসা, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা- ১৯৯৬।

(৩) SP Talukder, Chakmas – An Embattled tribe, Uppal Publishing House, New Delhi- 1984.

(৪) আহমদ ছফা, শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ, ইনফো পাবলিকেশনস্, ঢাকা- ১৯৯৮।

(৫) চিন্ময় মুৎসুদ্দী, অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা- ১৯৯২।

(৬) জয়নাল আবেদীন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ স্বরুপ সন্ধান, ঢাকা- ১৯৯৭।

(৭) গোলাম মোর্তোজা, শান্তিবাহিনী-গেরিলা জীবন, সময় প্রকাশন, ঢাকা- ২০০০।

(৮) আব্দুস সাত্তার, পাকিস্তানের উপজাতি, পাকিস্তান পাবলিকেসন্স, ঢাকা-১৯৯৬

(৯) S. Mahmud Ali, The Fearful State: Power, people and internal War in South Asia, Zed Books, London-1993.

(১০) মাহফুজ পারভেজ, বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি, সন্দেশ প্রকাশন, ঢাকা-১৯৯৯।

(১১) পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, জীবন আমাদের নয়, ঢাকা-২০০১।

(১২) দেবপ্রিয় চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, চাঙমা ফগ'দাঙ, ঢাকা-২০০২।

(১৩) সালাম আজাদ, শান্তিবাহিনী ও শান্তিচুক্তি, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯১।

(১৪) Syed Anwar Hussain, War and Peace in the Chittagong Hill Tracts Agamee Prokashani, Dhaka-1999.

(১৫) মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতির মূল্যায়ন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০১।

(১৬) আলীমুজ্জামান হারুন, সাংবাদিকের চোখে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিবাহিনী, জাহান প্রিন্টিং, ঢাকা-১৯৯২।

(১৭) আতিকুর রহমান, প্রেক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৯৯৭।

(১৮) নুহ-উল-আলম লেনিন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্মুখে শান্তি পারাবার, হাক্কানী পাবলিসার্স, ঢাকা-১৯৯৯।

(১৯) মোহাম্মদ সা'দাত আলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, বনলতা প্রকাশনী, ঢাকা- ১৯৯৮।

www.pathagar.com

পত্র পত্রিকা, প্রতিবেদন ও স্মরণিকা

(১) আবু রুশদ, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী কি করছে?, পাক্ষিক পালাবদল, ১৫ মে ১৯৯৬।

(২) আশেক খান, প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ অতীত ও বর্তমান, দৈনিক দিনকাল, ০৭ আগষ্ট ১৯৯০।

(৩) অধিকার-২০০৩, পার্বত্য-বাঙ্গালী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

(৪) ফজলুর রহমান, পার্বত্য চট্টগ্রাম- এ ল্যান্ড অব প্যারেড এন্ড ফ্যাসন, সাপ্তাহিক প্রিয় প্রজন্ম, ০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, ঢাকা।

(5) Quddus Afrad, How far Does it go, Bangladesh Newsweek, 26 January, 1992, Dhaka.

(৬) সাপ্তাহিক প্রত্যয়ন, ২৩ জানুয়ারি ১৯৯২, ঢাকা।

(৭) ভোরের কাগজ, ২০ এপ্রিল ১৯৯২।

(৮) সাপ্তাহিক সন্দীপ, ০৭ অক্টোবর ১৯৯১।

(৯) হাজার বছরের চট্টগ্রাম ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, দৈনিক আজাদী, বিশেষ সংকলন, নভেম্বর ১৯৯৫।

(১০) দৈনিক সংবাদ, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭।

(১১) দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ নভেম্বর ১৯৯৭।

(১২) সাপ্তাহিক চলতিপত্র, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭।

(১৩) আহমেদ অর্নব, পাহাড়ী জাতিসত্তা সংকটের তিনদশক, দৈনিক খবরের কাগজ, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।

(১৪) দৈনিক আজকালের খবর, ০১ এপ্রিল ২০০৪।

(১৫) দৈনিক আজকালের খবর, ২০ মার্চ ২০০৪।

(১৬) দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ মার্চ ২০০৪।

(১৭) দৈনিক ইনকিলাব, ০৬ মার্চ ২০০৪।

(১৮) দৈনিক পূর্বকোন, ০১ মার্চ ২০০৪।

(১৯) Probe News Magazine, Vol-3, Issue-4, 16 March 2004, Dhaka.

www.pathagar.com

দৃশ্যপট পার্বত্য চট্টগ্রাম : আকাশ থেকে দেখা

হাবিবুর রহমান একজন লেখক, গবেষক ও কলামিস্ট। সরকারি চাকুরিরত লেখক কর্তব্যের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানকালে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি। তার দুর্লভ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে এই গ্রন্থে।

ডর্ন অ্যাডর্ন অ্যাডর্ন অ্যাডর্ন অ্যাডর্ন অ্যাডর্ন অ্যাডর্ন অ্যাডর্ন অ্যাডর্ন অ্যাডর্ন
ডর্ন অ্যাডর্ন অ্যাডর্ন অ্যাডর্ন অ্যাডর্ন অ্যাডর্ন অ্যাডর্ন অ্যাডর্ন অ্যাডর্ন

ছবি : শোয়েব ফারুকী © ফটোব্যাংক

www.pathagar.com

অ্যাডর্ন প্রকাশনা

কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ / আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত
আত্মজীবনী / আবু রুশদ
পথে যা পেয়েছি ১ ও ২ / মোঃ আনিসুর রহমান
মুদ্রা ও শিলালিপির আলোকে বাংলার হাবশী সুলতান ও তৎকালীন সমাজ / মুর্তজা বশীর
দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়ন ও সাম্প্রদায়িকতা / রাশেদ খান মেনন
বরণীয় জনের স্মরণীয় বাণী / লুৎফর রহমান সরকার
আবুল কাসেম ফজলুল হক-এর রাজনীতি ও সংস্কৃতি : সম্ভাবনার নবদিগন্ত / সংস্কৃতির সহজ কথা
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সাম্প্রতিক / মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক
চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান / নূর মোহাম্মদ রফিক সম্পাদিত
মানবপ্রেমিক জোশেফ রেসিঙ্গকি / জীবনানন্দ মহাথেরো
Bangladesh Economy Turns of the decades / Mahbub Ullah
The Struggling Democracy of Bangladesh / Amanullah Kabir
Globalisation and Beyond search for identity / Mahbub Ullah
A Study of Military Management / Brig. General H R M Rokan Uddin psc
Challenges in Bangladesh Politics A Londoner's View / Dr Abdul Malik
War on Terror A pretext for new colonisation / Dr Abdul Malik
একুশে ও স্বাধীনতা, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ-বাস্তবতা / মোঃ আনিসুর রহমান
নারী ও বাস্তবতা / শাহ আবদুল হান্নান
কবি শিল্পীদের মাতৃভূমি প্যারিস / আল মাহমুদ
প্রেম / আবদুল মান্নান সৈয়দ
...যূখ চৌধুরীর আমার আসতে একটু দেরি হতে পারে / প্যারিসের নীলরুটি / অর্ধেক রয়েছি জলে অর্ধেক জালে / উনিশ শতকের [illegible]
...াহসান সাইয়েদ-এর তিতাসের অট্টহাসি / বাংলাদেশে হাদীস চর্চা উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ / তাওফীক আল-হাকীমের নাটক / নাজিব মাহফুজের [illegible]
বাংলার মুসলিম সমাজ ও রাজনীতি / ড. মোহাম্মদ সেকান্দর চৌধুরী
সংবাদপত্রের ডিজাইন / সৈয়দ লুৎফুল হক
প্রসঙ্গ : সংস্কৃতি / মোহাম্মদ সোলায়মান
সাহসী মানুষের গল্প / আতা সরকার
মুহাম্মদ আবুল কাসেম / অচেনা আকাশ
খালেদা হানুম-এর বাংলাদেশের ছোটগল্প / নজরুল : [illegible]
প্রফেসর হুসনে জাহান-এর আমাদের ভাষা / চোখের আলো / [illegible] গল্প / [illegible] গল্প / [illegible]
হেলেন স্যাকটারের ব্যক্তিত্বের বিকাশ / দেওয়ান মোহাম্মদ [illegible]
বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি / শাহাবুদ্দীন আহমদ
বেড়াতে গিয়েছি মৃত মানুষদের বাড়িতে / মুশফিক [illegible]
...রশিদুল আলম চৌধুরীর সেদিন বৃষ্টি ছিল / [illegible]
খালেদ বেলাল এর নৈঃশব্দে আমার পদধ্বনি / [illegible]
[illegible]
[illegible]
নুরুল আমিন এর কবি কথা ও অন্যান্য / কাজী আবদুল [illegible]
বিশ্ব সাহিত্যে বিশ্বনবী / [illegible]
পূর্বের চোখে পশ্চিমের মন / [illegible]
পার্বত্য শান্তিচুক্তি ও পাহাড়ে শান্তির সম্ভাবনা / [illegible]
সুফীবাদ / অধ্যাপক আবদুল [illegible]
উপমহাদেশের [illegible] / জাফর আলম [illegible]
দেওয়ান শামসুল আরেফিন [illegible]
আশরাফ আল দীন-এর ভ্রমণ পশ্চিমে / [illegible]
বাংলার সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম / [illegible]
[illegible]

অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
২৯ সেগুনবাগিচা (পুরাতন ১৪১) ঢাকা [illegible]
ফোন : ৯৩৪৭৫৭৭, ৮৩১৩৩১৯ ফ্যাক্স : [illegible]
চট্টগ্রাম অফিস : আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন [illegible]